নন্দনবাসিনী

শৈবাল মিত্র

সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৬৫

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্‌
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
প্রদীপকুমার সাহা
লোকনাথ বাইণ্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ ভট্টাচার্য
প্রিয়জনেষু

নন্দনবাসিনী

চতুর্থ পরিচয়ের খোঁজে

আমার নাম মালবিকা দত্ত। বাড়িতে ডাকত মালা বলে। কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত মালা নামে পরিচিত ছিলাম। কুড়ি পেরিয়ে একুশে পড়তে নূপুর সেনগুপ্ত হয়ে গেলাম। সেখানে শেষ নয়। ছাব্বিশ বছর বয়সে তৃতীয় নাম পেলাম। নূপুর সেনগুপ্ত হয়ে গেল সুপ্রিয়া লাহিড়ি। সাড়ে পাঁচ বছরের কিছু বেশি সময় সুপ্রিয়া ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, কনাদ লাহিড়ির স্ত্রী, কৃশানুর মা, সুপ্রিয়া লাহিড়ি পরিচয়ে বাকি জীবন কাটাতে চেয়েছিলাম। পরিচয় দুটোকে ভালবেসে ফেলেছিল মিসেস লাহিড়ি। মালবিকা দত্তকে, ভুলতে না পারলেও নূপুর সেনগুপ্তকে ক্রমশ ভুলে যাচ্ছিল। কিন্তু মানুষ যা চায়, তা হয় না। আমার মতো মানুষের প্রত্যাশা মেটে না। সুপ্রিয়া লাহিড়ি নামে আত্মপ্রকাশের পাঁচ বছর পরে টের পেলাম, এ পরিচয় বাঁচানো অসম্ভব হয়ে উঠছে। সুপ্রিয়া লাহিড়ির খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। আপাতত আমি আবার মালবিকা দত্ত, মালা। তবে এ পরিচয় বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসা পরিচয়কে কোণঠাসা হয়ে কাজে লাগাতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। একধরণের অপরাধবোধ কাজ করছে। তাই নতুন নাম, নতুন পরিচয় খুঁজছি। খুঁজছি বললে ভুল হবে, অন্বেষণ করছি। পাগলের মতো খোঁজাকেই তো অন্বেষণ বলা হয়। আমি তাই করছি। আত্মঅন্বেষণের এই পর্বে হঠাৎ একদিন অনুভব করলাম, বত্রিশ বছর ধরে যতো নাম, যতো পরিচয় বয়ে বেড়িয়েছি, তার একটাও আমি নই। আমি, সঞ্জয় দত্ত, মীরা দত্তর ঘরপালানো মেয়ে মালবিকা নই, অমিতাভ হাজরার রক্ষিতা নূপুর সেনগুপ্ত নই, এমনকি কনাদ লাহিড়ির সহধর্মিনী সুপ্রিয়া লাহিড়ি নই, আমি কিছু নই। আমার নাম, পরিচয় অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। সঠিক পরিচয়ে, জীবনের শুরু থেকে হাজির করতে পারিনি নিজেকে। আত্মপরিচয়হীনতার কথা আগে কখনও এ ভাবে মনে আসেনি। সুপ্রিয়া লাহিড়ি পরিচয় ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরে এই চিন্তাটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দেয়। একটা চিন্তা থেকে জেগে ওঠে হাজার চিন্তা।

বত্রিশ বছর ধরে যতো কথা বলেছি, এখন বুঝি, তার বেশিরভাগ আমার কথা নয়। আমি যা বলতে চেয়েছি, বলার সুযোগ পাইনি। সেই সব না বলা কথা গভীর রাতে আপন মনে বিড়বিড় করেছি। অনুচ্চারিত কথাগুলো মালবিকা দত্তর নয়, নূপুর সেনগুপ্ত বা সুপ্রিয়া লাহিড়ির নয়, কার কথা, আমি নিজেও জানি না। চতুর্থ যে পরিচয় খুঁজে বেড়াচ্ছি, হয়তো তার। তার নাম নেই, পরিচয় নেই, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না নেই। নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে চেপে রেখে নামকরণকারীদের প্রত্যাশা তাকে মেটাতে হয়। ঠিকমতো পারলে ভালো মেয়ে, সুগৃহিণী আদর্শ মা হিসেবে তার সুখ্যাতি রটে। ব্যর্থ হলে দুর্নামের শেষ থাকে না। খ্যাতি অখ্যাতির

আড়ালে যে মানুষটা থাকে, সে নতুন পরিচয় খোঁজে, অথবা ফুরিয়ে যায়। আমি যে ফুরিয়ে যাইনি, তার প্রমাণ, চতুর্থ আত্মপরিচয় এখনও খুঁজে চলেছি।

পরে আসবে সে প্রসঙ্গ। আগের কথাগুলো আগে বলে নেওয়া ভালো। মালবিকার পরিচয়, মালবিকা কেন নূপুর হল, নূপুর কীভাবে সুপ্রিয়ায় রূপান্তরিত হল, সাড়ে পাঁচ বছর পরে সুপ্রিয়া পরিচয় ছেড়ে কেন চতুর্থ পরিচয় সে খুঁজতে বেরলো, বলা দরকার। স্তরে স্তরে কাহিনী যতো গড়ে উঠেছে, আমি দিশেহারা হয়ে গেছি। তবু ভেঙে পড়িনি। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেও ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। আমাকে বারবার কে ভূলুণ্ঠিত করছে, ভাবার চেষ্টা করেছি। কখনও মনে হয়েছে আমাকে ধরাশায়ী করেছে আমার বাবা, মা দিদি, সঞ্জয় দত্ত, মীরা দত্ত, লিপিকা। পরের মুহূর্তে মনে হয়েছে, তা নয়, অন্যকেউ। অমিতাভ হাজরা, কনাদ লাহিড়ি কি পরিচয়হীনতার অন্ধকারে আমাকে ঠেলে দিয়েছে? অসম্ভব নয়। আলাদা কেউ-ও হতে পারে। আমার আত্মপরিচয়হীনতার জন্যে যে দায়ী, হয়তো তার নাম জীবন। মৃত্যুও হতে পারে। নাম যাই হোক, ছেলেবেলা থেকে কুয়াশার মতো সে ঘিরে আছে আমাকে। এক পবিচয় থেকে অন্য পরিচয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন চেহারা, নানা পোশাকে তাকে আমি দেখেছি। ষোলো বছর আগে যে মালবিকার বয়স ছিল ষোলো, আপাতত তার কাছে ফিরে যাই।

আত্মকথন-১

চলন্ত দার্জিলিং মেলের স্লিপারে নিজের বার্থে শুয়ে রাত দশটায় কিশোরী মালার মুখ মনে করতে চাইলাম। সময় ধূসর করে দিয়েছে তাকে। তবু ডাকলাম। সে এল। ষোলো বছরের মালাকে বললাম, কিছু বল।

কী বলব?

কিশোরী মালবিকার কাহিনী।

তুমি সব জান। আমি আর তুমি তো এক।

পুরো এক নয়। ষোলো বছরের মালা, আর বত্রিশ বছরের মালার অনেক তফাত। ষোলো বছরের মালার কাহিনী আমি শুনতে চাই।

কোথা থেকে শুরু করব?

যেখান থেকে খুশি।

দার্জিলিং মেলের থ্রি টায়ার স্লিপার কামরায় মধ্যবিত্ত রাত নামছে। দেড় দুঘন্টা ধরে উঁচু গলায় যারা কথা বলছিল, তারা ঝিমিয়ে পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ। নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডানদিকে একতলার পাকা চুল যাত্রী শোয়ার আয়োজন করছে। পায়ের দিকের বাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী এক যাত্রী হাই তুলছে, এবং হাঁ মুখের সামনে তুড়ি বাজাচ্ছে। কামরা জুড়ে ঘুম নেমে এলেও চাপা গলার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। খোলা জানলা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। বাতাসে অ্যালকোহলের গন্ধ। আশপাশে হুইস্কির বোতল খুলেছে কেউ। কপালে হাত রেখে বাঁ পাশে মাঝের বাঙ্কে আমি শুয়ে আছি। যাত্রীদের অনেকে জেনেগেছে, আমি একা। আমার সঙ্গে পুরুষ নেই, স্ত্রীলোক নেই, কেউ নেই। চা নিয়েছিলাম এক ভাঁড়। খাবার এক

প্লেট নিয়েছি। মাঝখানের স্টেশনে ট্রেন থামতে কেউ এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়নি। দু-একজন আড়চোখে দেখে যাচ্ছে আমাকে। সুপ্রিয়া লাহিড়িকে তারা চেনে না। বত্রিশ বছরের এক স্ত্রীলোককে পরখ করতে চাইছে। তা করুক। পুরুষমানুষ, আমিও কম ঘাঁটিনি। মুখ দেখে তাদের পেটের খবর টের পাই। মালবিকা দত্তকে যারা নূপুর সেনগুপ্ত বানিয়েছিল, রাত দশটায় আমার বাঙ্কের কাছে তারাই ঘুরঘুর করছে। আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। সতী বেশ্যা দেখার লোভে চনমন করছে তাদের চোখ। তারা বাড়িতে সতীলক্ষ্মী বউ, আর বাইরে সতীলক্ষ্মী বেশ্যা দেখতে ভালবাসে। বউ-এর কাছ থেকে বেশ্যার নৈপুণ্য এবং বেশ্যার কাছ থেকে বউ-এর অনুরক্তি আশা করে। নূপুর সেনগুপ্ত পরিচয়ে পাঁচ বছর জীবনযাপন করে স্ত্রী, পুরুষ সম্পর্কের আসল চেহারা জেনে গেছি। পাঁচ বছর দেহোপজীবিনী থাকা কম কথা নয়। সম্প্রতি দেহোপজীবিনীদের যৌনকর্মী বলা হচ্ছে। শব্দটায় আমার আপত্তি আছে। শব্দটা একপেশে, অপমানজনক। বরং 'সহবাসকর্মী' শব্দটা অনেক লাগসই। শব্দটার মধ্যে মেয়ে, পুরুষ, দুপক্ষের সমান ভূমিকা ধরা পড়ে। যৌনকর্মী শব্দটা চালু করে মেয়েদের ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে, পুরুষ ধোয়া তুলসীপাতা সেজে থাকে। এটা ঠিক নয়। শব্দব্যবহারে চালাকি আমি ধরে ফেলেছি। তা ছাড়া যৌনকর্মী অথবা সহবাসকর্মী কে নয়? স্বামী স্ত্রী, মা বাবা, ভাই বোন, আত্মীয়, বন্ধু, সবাই যে যার মতো এই কাজ করে। করে আনন্দ পায়। বত্রিশ বছরের মালার সামনে ষোলো বছরের মালবিকা স্থির হয়ে বসে আকাশপাতাল ভাবছে। স্মৃতিমগ্ন হচ্ছে। ঝমঝম করে ছুটে চলেছে দার্জিলিং মেল। রাত বাড়ছে। চোখে না দেখেও বাইরের অন্ধকার মালা অনুভব করছে। ষোলো বছর আগের কাহিনী শুরু করল ষোলো বছরের কিশোরী।

আমার বয়স তখন ষোলো। মাধ্যমিক পরীক্ষায় মহকুমার একঝাঁক কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা সভায় আমি হাজির ছিলাম। তাদের সঙ্গে মঞ্চে বসার সুযোগ পেয়েছিলাম। অভ্যুদয় সঙ্ঘের খেলার মাঠে প্যান্ডেল বেঁধে জাঁকজমক করে অনুষ্ঠান হয়েছিল। অভ্যুদয় সঙ্ঘের তরফ থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ফি বছর সম্বর্ধনা দেওয়া হত। মহকুমাশাসক ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মঞ্চে বসে আমার বুক টিপটিপ করছিল। সামনে চেনা, অচেনা অনেক মুখের মধ্যে মা, বাবা, দিদিও ছিল। মাধ্যমিকে মহকুমায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলাম। সবাই দেখছিল আমাকে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিল অভ্যুদয় সঙ্ঘের অমিতাভ হাজরা। নবপল্লীতে বাড়ি। করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডে এক দুবার তাকে দেখলেও দ্বিতীয়বার ঘুরে দেখার সাহস পাইনি। পনেরো, ষোলোর কিশোরীর সঙ্কোচ বিজড়িত চোখে ঘুরে দেখার সাহস থাকে না। আমারও ছিল না। সেই অমিতাভকে মঞ্চে, কয়েক হাত দূরে দেখে দুড়দুড় করছিল আমার বুক। প্রথম ভালো করে দেখলাম। সত্যিকার রূপবান পুরুষ। ফর্সা থলথলে ময়দার তালের মতো রূপ নয়। পৌরুষ মিশে ছিল রূপে। মুখ, নাক, চোখের চেয়ে তার চওড়া কাঁধ, নিটোল শক্ত কব্জি আমার নজর কেড়েছিল। ভরাট গলা, সাবলীল,সপ্রতিভ ভঙ্গি। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষকের কাজ করছিল। বারবার আড়চোখে দেখছিল আমাকে। বাড়তি খাতির করছিল। মহকুমাশাসকের হাত থেকে পুরস্কার, মানপত্র নেবার জন্যে এমন সব বিশেষণ লাগিয়ে আমার নাম ঘোষণা করেছিল, যা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলাম। যাদের নখের যোগ্য আমি নই, সেই খনা, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তুলনা করেছিল আমাকে। আমি খুশি হয়েছিলাম। খুশির বাতাস বইছিল বুকে। লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম। ডানাকাটা পরীর মতো সুন্দরী না হলেও বুদ্ধিদীপ্ত মুখে আলগা চটক ছিল। লাবণ্য ছিল শরীরে।

জড়তা, অথবা ধিঙ্গিপনা, কোনওটা স্বভাবে ছিল না। স্কুলে, বাংলার শিক্ষিকা লতিকাদি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধকাব্যের প্রমীলার সঙ্গে আমাকে তুলনা করতেন। প্রমীলার সঙ্গে আমার মিল খুঁজে পেতেন। লতিকাদির কথা শুনে মেঘনাদবধকাব্য পড়ার ইচ্ছে হয়। লতিকাদি বাড়ি থেকে বইটা এনে দিয়েছিলেন। আমি পড়েছিলাম। কিছু লাইন এখনও মনে আছে। শত্রু শিবিরের মধ্যে দিয়ে স্বামী মেঘনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে প্রমীলা। সখি বাসন্তীকে বলছে,

"কি কহিলি বাসন্তী? পর্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি
দানবনন্দিনী আমি রক্ষঃকুলবধূ
রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"

মঞ্চে বসে সেই মুহূর্তে আমি প্রমীলা ছিলাম না। অমিতাভর হাবভাবে যেমন মজা পাচ্ছিলাম, তেমনই শিহরণ হচ্ছিল। কিশোরী থেকে যুবতী হবার বছরগুলোতে কতজন পুরুষকে দেখে একটা মেয়ে শিহরিত হতে পারে, বলা মুশকিল। তবে প্রথম শিহরণ পাকাপোক্ত হয়ে গেলে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়। ঘটনাটা বুঝতে দেরি হয়েছিল। মাইকে দাঁড়ানো অমিতাভর সব কথা আমর কানে ঢুকছিল না। অমিতাভর বয়স হিসেব করছিলাম। কত হতে পারে, অমিতাভর বয়স? চব্বিশ, পঁচিশের বেশি নয়। অমিতাভ কি ছাত্র? নিশ্চয় তাই। সন্দেহ নেই, মেধাবী ছাত্র। পছন্দের পুরুষকে একজন কিশোরী যে ভাবে তিলতিল কল্পনা দিয়ে গড়ে তোলে, এবং কল্পনাকে সত্যি ভাবতে শুরু করে, আমি তাই করছিলাম। কল্পনা একদিনে পল্লবিত হয়নি। সম্বর্ধনা সভা থেকে যা শুরু হয়েছিল, বছর শেষ হবার আগে আমার বুকের গভীরে তা শেকড়বাকড় সমেত চারিয়ে গেল। তখনও জানতাম না, কল্পনাকে সত্যি ভাবলে, সত্যকে কল্পনা ভাবা ছাড়া উপায় থাকে না। আমিও তাই ভাবছিলাম। কাল্পনিক অমিতাভকে নিয়ে মশগুল হয়ে ছিলাম। কাল্পনিক অমিতাভ তখন বাস্তবে, ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে। দু এক টুকরো করে খসে পড়ছে কল্পনার পলেস্তারা। তবু আমার ঘোর কাটছে না। বরং ঘন হচ্ছে।

চার বছরের বড়ো দিদি লিপিকাকে নিয়ে বাড়িতে তখন ধুন্দুমার কাণ্ড চলেছে। মাধ্যমিকে তিনবার ফেল, চাঁপাডালির তারাপদ হালদার, ওরফে টর্পেডোকে বিয়ে করার গোঁ ধরেছে লিপিকা। লিপিকা, টর্পেডোর সম্পর্কের কথা মা, বাবা জেনেছিল দেরিতে। সম্পর্ক কতোটা পেকে উঠেছে, তারা জানত না। তারা ভেবেছিল সম্পর্কের জাল কেটে লিপিকা বেরিয়ে আসবে। অর্থনীতির অনার্স, ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী লিপিকা এত বড়ো ভুল করতে পারে না। লিপিকা, টর্পেডো সম্পর্ক যখন গড়ে উঠছে, আমি ক্লাস এইটে পড়তাম। মা, বাবাকে বলিনি। বরং মদত দিয়েছি লিপিকাকে। দুজনের প্রেমপত্র চালাচালি করে রোমাঞ্চ বোধ করেছি। আমি ছিলাম তাদের এক নম্বর পোস্টম্যান। চিঠি লেনেদেনে সাহায্য করলেও টর্পেডোর হাতের লেখা দেখে খারাপ লাগতো। মনে হত, খামের ওপর ইংরেজিতে লিপিকা দত্ত লিখতে টর্পেডো দুটো কলম ভেঙে ফেলেছে। কৌতূহল থাকলেও মুখ আটকানো খামের চিঠি পড়া সম্ভব ছিল না। তবু দিদির আলমারি খুলে দু একটা চিঠি লুকিয়ে পড়েছিলাম। পড়ে গা সিরসির করেছিল। কিছু শব্দের অর্থ সে দিন জানতাম না। জেনেছিলাম পরে। ক্লাস টেনে ওঠার আগে থেকে

টর্পেডোকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিলাম। লিপিকা দুঃখ পাবে ভেবে কখনও বলিনি। তবে অমিতাভর সঙ্গে প্রথম আলাপের পরে লিপিকা নিজের অপছন্দ জানিয়ে দিয়েছিল। অমিতাভকে তার ভালো লাগেনি। সম্বর্ধনা সভার মাস দেড়েক পরে মহকুমা শাসকের উপহার, আমার নাম খোদাই করা তাম্রপত্র, অমিতাভ পৌঁছে দিতে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। তখন বিকেল। বাবা বাড়িতে ছিল না। টর্পেডোকে নিয়ে সংসারে অশান্তি চললেও অমিতাভকে আদর করে বসিয়ে মা চা, মিষ্টি খাইয়েছিল। ঘন্টাখানেক ছিল অমিতাভ। সন্ধের মুখে "আবার দেখা হবে" বলে সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। সে চলে যেতে লিপিকা ফিসফিস করে বলেছিল, ছেলেটা সুবিধের নয়।

কেন?

ভীষণ মিথ্যে কথা বলে। ওর বয়স মোটেই তেইশ নয়।

আলোকদা, কাল্টুদার সঙ্গে স্কুলে এক ক্লাসে পড়লে ওর বয়স, হিসেব মতো হয় উনত্রিশ, ত্রিশ। কী কুক্ষণে আলোকদা, কাল্টুদার নাম অমিতাভ করতে গেল আমি ভেবেছিলাম।

এক সেকেন্ড থেমে লিপিকা বলেছিল, কথা শুনে মনে হলো, স্কুলের গণ্ডি অমিতাভ টপকায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বি টেক পড়ে, না ছাই! কলেজের মুখ দেখেছে কি না সন্দেহ! ইংরেজি রিস্ক্ (Risk) শব্দকে যে রিকস্ বলে, পেনাল্টিকে (Penalty) প্লান্টি, ফিলম্‌কে (Film) ফিলিম উচ্চারণ করে, তার বিদ্যে বেশি নয়।

লিপিকার কথা অপছন্দ হলেও আমি চুপ করে ছিলাম। অমিতাভর গোলমেলে ইংরেজি উচ্চারণ আমি শুনেছি। এই তিনটে ছাড়া অমিতাভর আরও কিছু ভুল উচ্চারণ শুনে আমি দমে গিয়েছিলাম। এক মাস আগে ভরাট গলায় যে অমিতাভ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষকের ভূমিকা পালন করেছে, তার সঙ্গে সদ্য দেখা অমিতাভকে মেলাতে পারছিলাম না। অস্বস্তি কাটতে সময় লাগল না। একটু ভাবতে অমিতাভর পক্ষে যুক্তি পেয়ে গেলাম। ইংরেজি উচ্চারণে গোলমাল, ইংরেজি জানা অনেক পণ্ডিতের থাকে। আমাদের স্কুলের ইংরেজি শিক্ষিকা বীণাপাণিদি 'লজিক' কে উচ্চারণ করতেন 'লোঝিক', 'একজামিনেশন', 'হরলিক্স' বলতে গিয়ে 'একঝামিন', 'হরলিক্‌' বলতেন। উচ্চারণ শুনে তিনি ইংরেজি জানেন না, ভাবলে ভুল হবে। ইংরেজি অনেক শব্দ, বাঙালি নিজের মতো উচ্চারণ করে। অমিতাভর খুঁত, লিপিকা কেন খুঁজছে, হঠাৎ আমি টের পেলাম। তিনবার মাধ্যমিক ফেল টর্পেডোর চেয়ে অমিতাভ যে বেশি কিছু নয়, লিপিকা প্রমাণ করতে চাইছে। রাগ হলো। কড়া কথা মুখে এলেও বলতে পারলাম না। আমাকে ভীষণ ভালবাসতো লিপিকা। দিদির মতো সবসময়ে আগলে রাখত। লিপিকার সামনে আমার সমালোচনা করে কেউ রেহাই পেত না। সমালোচককে দস্তুরমতো সে কড়কে দিত। মা, বাবারও ছাড়ান ছিল না।

উচ্চমাধ্যমিক ক্লাস তখন শুরু হয়ে গেছে। কলেজ যাতয়াতের পথে অমিতাভর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে বুঝতাম, ঘটনাটা কাকতালীয় নয়। অমিতাভ সাজিয়ে রেখেছে। মজা পেতাম। অমিতাভর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসতাম। বুক কাঁপত। তবু না তাকিয়ে পারতাম না। আকর্ষণ বাড়ছিল। লিপিকা জানতে পেরে বলেছিল, ফিরে আয়।

তার মুখে বারবার এক কথা শুনে বিরক্ত হতাম। অন্তর্টিপুনি দিতে প্রশ্ন করতাম, তারাপদদার খবর কি? এ বছর মাধ্যমিক দিচ্ছে?

জোঁকের মুখে নুন পড়ত। এই একটা প্রশ্নে লিপিকা গুটিয়ে যেত। কথা বাড়াত না। কথা

বলার মতো জোর তার ছিল না। সে জানত, এমন এক মন্দ উদাহরণ সে হাজির করেছে, যার পরে কথা বলা চলে না। কথা বলার অধিকার সে হারিয়েছিল। তার যতো গোপন কথা, আমি জানতাম। কলেজ এক্সকারশনে যাবার নাম করে যে মেয়ে প্রেমিকের সঙ্গে দিঘায় রাত কাটাতে পারে, ছোটবোনকে তার উপদেশ দেওয়া সাজে না। বাড়িতে, শুধু আমি ঘটনাটা জানতাম।

আমার চোখে লিপিকা ছোট হয়ে গিয়েছিল। আমাকে তোয়াজ না করে তার উপায় ছিল না। আমাকে চটালে অনেক গোপন খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে এ ভয় তার ছিল। অমিতাভর সঙ্গে আমি ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছি জেনেও সে তাই চুপ করে থাকত। অমিতাভর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ার ছ'মাসের মধ্যে কলেজ পালিয়ে তিনবার কলকাতা গেছি। "এএ" মার্কা সিনেমা দেখেছি দুটো। রেস্টুরেন্টের পর্দাঢাকা কেবিনে বসে চপ কাটলেট, কোল্ডড্রিঙ্কস-এর সঙ্গে অমিতাভর আদর খেয়েছি। আদর এমন জিনিস, যা খেলে পেট ভরে না। খাবার আকাঙ্খা বেড়ে যায়। আমারও তাই ঘটেছিল। কী ঘটছে, অনুমান করতে পেরেও লিপিকা মুখে কুলুপ এঁটে থাকত। কিছু বলার জন্যে মাঝে মাঝে ঠোঁট কাঁপত, ছলছল করত দু চোখ। ব্যস্, ওই পর্যন্ত! কথা গিলে নিয়ে উড়নি অথবা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছত।

লিপিকা, টর্পেডো সম্পর্ক নিয়ে সংসারে ঝড় উঠলেও আমাকে নিয়ে মা বাবার মাথাব্যথা ছিল না। আমার ডুবে ডুবে জল খাওয়ার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার সুযোগ মিললেও তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল। বড়ো মেয়ের ওপর বিশ্বাস যত কমছিল, অন্ধের মতো তারা আঁকড়ে ধরছিল আমাকে। বাড়িতে লিপিকা প্রায় একঘরে হয়ে গিয়েছিল। মা, বাবা পারতপক্ষে তার সঙ্গে কথা বলত না। তারও কথা কমে এসেছিল। প্রাণবন্ত, হাসিখুশি মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। কষ্ট হতো আমার। আতঙ্কে গা ছমছম করত। রাতে, এক ঘরে দুটো সিঙ্গল খাটে দুই বোন. মড়ার মতো শুয়ে থাকতাম। বলার মতো কথা খুঁজে পেতাম না। অথচ জন্ম থেকে গায়ে গায়ে দুই বোন হেসে খেলে বড়ো হয়েছি। খুনসুটি করেছি, ভাব করেছি। সে দিন পর্যন্ত মাঝরাতে আমাদের গজগজানি, হাসি শুনে মা এসে ধমক দিয়ে বলত, কি এতো গল্প তোদের থাকে? সকাল হয়ে যাবার আগে একটু ঘুমো। গল্প থামিয়ে আমরা চোখ বুজতাম। মা চলে গেলে ফিসফিস করে আবার বকরবকর শুরু হতো। গল্পের মধ্যে কে আগে, কে পরে ঘুমোলাম, খেয়াল থাকত না। পরের দিন এ নিয়ে তর্কাতর্কি হতো। নিজেকে কেউ ঘুমকাতুরে স্বীকার করতাম না। সুখের দিনগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছিল। কথা বলার উৎসাহ আমরা হারিয়ে ফেলছিলাম। দু দেওয়ালে লাগানো দুটো সিঙ্গল খাটের একটাতে শুয়ে, লিপিকার কথা ভেবে, বালিশে মুখ গুঁজে আমি কাঁদতাম। লিপিকা জানতে পারত না। লিপিকাও হয়তো আমার ভবিষ্যত ভেবে ভয়ে কাঁদত। তার কান্নার আওয়াজ আমি শুনতে পেতাম না। ভাবতাম, লিপিকা অকারণে কাঁদছে। অমিতাভর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। টর্পেডোর মতো অমিতাভ ফেকলু পার্টি নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি টেক করছে। বি টেকের পরে এম টেক পড়ার ইচ্ছে আছে। আমাকে নিয়ে সংসার পাততে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আপাতত লেখাপড়ার রাশ আলগা হয়েছে। ভালো একটা চাকরি খুঁজছে। চটজলদি বড় লোক হবার মতো ব্যবসার ছক বানাচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই আমাকে বিয়ে করবে। কথাটা কয়েকবার অমিতাভ শুনিয়েছে। খুশি আর লজ্জায় আমি লাল হয়েছি। অমিতাভ উপভোগ করেছে আমার অভিব্যক্তি। প্রগাঢ় আদর করার জন্যে ছটফট করেছে। এ সব কথা লিপিকাকে

জানাইনি। ছ সাত মাস ধরে অনেক খবর আমরা পরস্পরের কাছে চেপে যাচ্ছিলাম। শিয়ালদায় অমিতাভর মেসে দুবার গেছি, লিপিকাকে জানাইনি। জানাবার মতো ঘটনা, সেটা ছিল না। মেস বাড়ি তো নয়, নরক। সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলে ইউরিনালের ঝাঁঝালো গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে। দোতলার একটা ঘরে দুজন আবাসিকের সঙ্গে অমিতাভ থাকত। ছোট ঘর। ঘরের বাতাসে ভ্যাপসা, ঘেমো গন্ধ। ঘরের তিন দেওয়াল ঘেঁষে তিনটে তক্তাপোষের দুটোতে তেলচিটে বিছানা। তৃতীয় তক্তাপোষের কিছুটা ওপরে দেওয়ালে সাঁটা কাঠের র‍্যাকেটে যে জামা প্যান্ট ঝুলছিল, সেগুলো আমার চেনা। অমিতাভর শরীরে যে পোশাক ঝলমল করে, বিবর্ণ দেওয়ালে লটকে থাকা সেগুলোকে ভীষণ মলিন লাগছিল। ফাঁকা ঘর। দরজা, জানলা খোলা। ঘরে ঢুকে অমিতাভ জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। থতমত খেয়ে আমি ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম নিজেকে। সিঁড়িতে একজোড়া পায়ের শব্দ তখনই শোনা গেল। হৃতশ্রী একজন লোক ঘরে ঢুকে অমিতাভর পাশে আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, নতুন নাকি?

অমিতাভ চুপ।

লোকটা এবার জিজ্ঞেস করল, জোটালে কোথা থেকে? কথা ঘোরাতে অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, আপনাদের কারখানার ধর্মঘট মিটল?

লোকটার তাড়া ছিল। অমিতাভর কথার জবাব না দিয়ে একটা তেলচিটে বিছানার তলা থেকে কিছু নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেসামাল পা ফেলা দেখে বুঝেছিলাম, নেশায় সে চুর হয়ে আছে। মেসবাড়ি ছেড়ে বেরোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিস্তব্ধ দুপুর। আবাসিকরা কেউ নেই। এ রকম জায়গায় আগে কখনও যাইনি। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। মেসবাড়ির বাইরে এসে অমিতাভকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থাকো না কেন?

হালকা হেসে অমিতাভ বলেছিল, দাও না একটা সিট ম্যানেজ করে।

উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী জবাব খুঁজে পায়নি। চেনা রেস্টুরেন্টে পর্দাঢাকা কেবিনে বসে আমার কাঁধে হাত রেখে অমিতাভ বলেছিল, স্টুডেন্টলাইফে কষ্ট করার ট্রেনিং থাকলে পরে অসুবিধে হয় না। কথাটা আমার মনে ধরেছিল। তার কাঁধে মাথা রেখেছিলাম। আদরে আদরে সে অবশ করে দিয়েছিল আমাকে। অমিতাভর সঙ্গে আমার কলকাতা যাবার খবর লিপিকা কী ভাবে যেন টের পেত। মুখ দেখে বুঝে যেত সব কিছু। প্রশ্ন করত না। মুখ গম্ভীর হত। টর্পেডোর সঙ্গে লিপিকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে আমিও বুঝে যেতাম। প্রশ্ন করা, আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। লিপিকার জন্যে উদ্বেগে বুকের ভেতরটা হায়হায় করত। আমার মনেও ভয় ঢুকছিল। চাপা অনুতাপ জমছিল। লিপিকাকে বাতিলের খাতায় জমা করে, ছোট মেয়ে নিয়ে বাবা, মা বেঁচে থাকার যে স্বপ্ন দেখছে, তার কী হবে? স্নেহাতুর মা বাবাকে আমি কি প্রতিদান দেব? লিপিকার সঙ্গে দূরত্ব যত বাড়ছিল, মা, বাবা তত বেশি করে আমাকে জড়িয়ে ধরছিল। মা, বাবা যত জড়িয়ে থাকতে চাইছিল, অপরাধবোধে আমি গুটিয়ে যাচ্ছিলাম। মা, বাবাকে অমিতাভ সম্পর্কে একটা কথা লিপিকা বলেনি। বলতে ভয় পেয়েছিল। তার কথা মা, বাবা হয়তো বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করলে, তাকেই দোষী করবে। ছোটবোনকে বিপথগামী করার সব দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। সেটাই স্বাভাবিক। দিদি নষ্ট হয়ে গেলে বোন কী ভাবে ভালো থাকতে পারে! যে মেয়ে লোফার, গুণ্ডাকে গলায় মালা দিয়ে বরণ করতে চায়, তার বোনের পছন্দ কত উঁচু মানের হতে পারে! তার পক্ষে ভদ্র, মেধাবী, শিক্ষিত ছেলে পছন্দ করা সম্ভব নয়। দিদির মতো

সেও ক্রিমিনাল খুঁজবে। মা বাবার প্রজন্মের চেয়ে ছেলেমেয়েরা নিজের প্রজন্মের দাদাদিদিদের বেশি অনুসরণযোগ্য মনে করে। তাদের চালচলন নকল করে। মা, বাবা বলতে শুরু করেছিল এ সব কথা। লিপিকা, আমি দুজনে শুনতাম। অপরাধীর মতো মুখ করে লিপিকা বসে থাকত। তার প্রভাবে অমিতাভর মতো বাজে ছেলেকে আমি পছন্দ করেছি, এ ধারণা তার হয়েছিল। যথেষ্ট গ্লানি অনুভব করত। অমিতাভর কথা, মা বাবাকে না জানাবার আরও একটা কারণ, লিপিকার ছিল। মা, বাবার জন্যে তার কষ্ট হত। আমার, অমিতাভর খবর শুনে মা, বাবার হঠাৎ কিছু ঘটে যেতে পারে, এ আশঙ্কা সবসময় করত। দু মেয়ের এক পরিণতি ঘটলে বাবার হার্টফেল করা অসম্ভব নয়। বাবা মারা গেলে মা উন্মাদিনী হয়ে যাবে। আত্মঘাতী হলে, অবাক হবার কিছু নেই। সংসারে পুরোপুরি অবাঞ্ছিত হয়ে গেলেও মুখ টিপে লিপিকা সব সহ্য করছিল। অন্ধ সন্তান স্নেহে মা, বাবা, ক্ষয়ে যাচ্ছিল।

আমি জানতাম, আমার চেয়ে লিপিকাকে বাবা বেশি ভালবাসত। আমার ওপর মায়ের টান ছিল বেশি। টান, ভালবাসা কম বেশি যাই থাকুক, মনের মতো করে দুই মেয়েকে বাবা গড়তে চেয়েছিল। লিপিকার কাছে বাবার বাড়তি প্রত্যাশা ছিল। স্ত্রীর অজান্তে লিপিকার অনেক আব্দার সঞ্জয় দত্ত মেটাত। মা জানতে না পারলেও আমি ধরে ফেলতাম। তখন আমার আব্দার মিটিয়ে বাবা বশ করত আমাকে। কলেজ থেকে লিপিকার পুরীভ্রমণে মা বাধ সেধেছিল। দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্পর্কে কয়েকঘন্টা ধরে স্ত্রীকে বুঝিয়ে তার অনুমতি আদায় করেছিল সঞ্জয়। বাবার গলা জড়িয়ে লিপিকা নেচেছিল। অনুমতি পাবার আগেই অবশ্য এক্সকারশনের টাকা গোপনে লিপিকার হাতে বাবা তুলে দিয়েছিল। পুরীর বদলে টর্পেডোর সঙ্গে লিপিকা দীঘা গিয়েছিল। বাড়িতে কেউ না জানলেও আমি জানতাম। লিপিকা বলেনি। অন্যভাবে জেনেছিলাম। স্কুল থেকে ফেরার পথে এক বিকেলে লিপিকার কলেজের বন্ধু ঝর্ণাদির সঙ্গে দেখা হয়। এক্সকারশন থেকে লিপিকা তখনও ফেরেনি। ঝর্ণাদি জিজ্ঞেস করেছিল, লিপিকা কলেজে যাচ্ছে না কেন? শরীর খারাপ?

প্রশ্ন শুনে আমি থতমত খেয়েছিলাম। আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঝর্ণাদি বলেছিল, কাল, পরশু লিপিকাকে কলেজে না দেখে আমি ভেবেছিলাম, সে পুরীতে গেছে। ছাত্রসংসদের এক কর্মকর্তা বলল, কথা দিয়েও লিপিকা শেষপর্যন্ত এক্সকারশনে যায়নি। তখনই মনে হল, লিপিকার জ্বরটর হয়েছে। তাকে দেখতে কালই হয়তো তোদের বাড়ি যেতাম।

আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। তবে আমি মাথামোটা ছিলাম না। ঝর্ণাদিকে ঠেকাতে বলেছিলাম, দিদি তিনদিনের জন্যে বরানগরে পিসির বাড়ি গেছে। কাল, পরশু ফিরবে।

ঝর্ণাদি সন্দেহ করেনি। আমার যা বোঝার বুঝে গিয়েছিলাম। লিপিকা বাড়ি ফিরতে তাকে এমন জেরা করেছিলাম যে, আসল ঘটনা বলতে সে বাধ্য হয়েছিল। আমার স্কুল জীবনের শেষ বছরে ঘটনাটা ঘটেছিল। ইকনোমিক্স অনার্স নিয়ে লিপিকা সে বছর পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছি। টর্পেডো, লিপিকার মাখামাখির খবর মা, বাবা তখনও ঘুণাক্ষরে জানে না। তবে লিপিকার বিয়ের জন্যে কোমর বেঁধে তারা পাত্র খুঁজতে শুরু করেছে। বাবার সঙ্গে স্টুডিওতে গিয়ে কপাল কুঁচকে লিপিকা যে ছবি তুলিয়েছিল, পাত্রপক্ষের তা পছন্দ হবার কথা নয়। লিপিকা তাই চেয়েছিল। অপছন্দ করার মতো ছবি তুলিয়ে বিয়ের উদ্যোগে জল ঢেলে দিয়েছিল। সংবাদপত্রে ঠিকানা দেখে সে সব পাত্রের বাড়িতে ছবি পাঠানো হয়েছিল, ছবি দেখে উচ্চবাচ্য না করে পরের ডাকে তারা ফেরত পাঠিয়েছিল।

সামনাসামনি যারা পাত্রী দেখতে এসেছিল, লিপিকার থমথমে মুখ, কপালে ভাঁজ নজর করে, কোথাও গোলমাল আছে ভেবে পিছিয়ে গিয়েছিল। পাত্রীবেশে পাত্রপক্ষের মুখোমুখি বসে সে এমন কাটাকাটা কথা বলেছিল, যা শুনে হবু বরের বাড়ির লোকজন ভড়কে গিয়েছিল। পরে আর যোগাযোগ করেনি। লিপিকার মতিগতি মা বাবা বুঝতে পারেনি। সংবাদপত্রে পাত্রপাত্রী কলাম দেখে তারা চিঠি দিয়ে যাচ্ছিল। চিঠি পেয়ে যারা দেখতে আসছিল, বেজার মুখ করে তাদের সামনে হাজির হয়ে, বিয়ের সম্বন্ধ লিপিকা ভেস্তে দিচ্ছিল। তার হাবভাব দেখে বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তোর কি বিয়ে করার ইচ্ছে নেই?

লিপিকা বলেছিল, অনার্সের পরে এম এ করতে চাই। বিয়ে থার কথা তার পরে ভাবব।

টর্পেডোর নাম লিপিকা করতে পারেনি। বাবার সামনে নামটা উচ্চারণ করতে হয়তো সঙ্কোচ হয়েছিল।

দু মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে মা, বাবার আগ্রহ কম ছিল না। তবু বাবা বলেছিল, বিয়ের পরে এম এ করতে অসুবিধে কি?

অনেক অসুবিধে। তুমি কি বিয়ের পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলে?

বাবা কথা বাড়ায়নি। লিপিকার অকাট্য যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে খুশি হয়েছিল। বলেছিল, পার্ট টু পরীক্ষার পরে তবু একবার ভেবে দেখো। দু-একজন ভালো ছেলের সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দিতে পাবি। তারা ব্রিলিয়ান্ট এবং হৃদয়বান। তাদের কাউকে বেছে নিলে তুমি ঠকবে না।

লিপিকার কথা, তখনকার মতো মা, বাবা মেনে নিলেও সে কিন্তু নিজের জায়গা থেকে নড়ল না। টর্পেডোব সঙ্গে সেঁটে থাকল। তাড়াতাড়ি তার অর্ধাঙ্গিনী হবার জন্যে তলে তলে চেষ্টা চালাবার পাশাপাশি মা, বাবাকে বলল, আমার বিয়ের জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না। লেখাপড়া শেষ করে যা করার আমি করব। মা, বাবা মুখ চাওয়াচায়ি করেছিল। সেই প্রথম টের পেয়েছিল, লিপিকা কোনও খোঁটায় বাঁধা পড়েছে। এ নিয়ে দুজনের কেউ-ই বিশেষ মাথা ঘামায়নি। লিপিকার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে নিজের অবস্থানে যথাসময়ে ফিরে আসবে, এ বিশ্বাস তাদের ছিল। আমার স্বাস্থ্যবই-এর ভেতর থেকে টর্পেডোকে লেখা লিপিকার চিঠিটা পাবার পরে মা বাবার বিশ্বাস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এক দেড় বছরের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি তুঙ্গে পৌঁছলো। বাবা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। মা বোবা বনে গিয়েছিল। মা, বাবার চোখে তখনও আমি নিষ্পাপ, সরল বালিকা, আদরের দুলালি মেয়ে। অমিতাভর সঙ্গে আমার লটঘট তাদের কানে যায়নি। সম্ভবত সেটা ছিল মার্চের ষোলো তারিখ। অমিতাভর সঙ্গে দুপুর একটায়, চাঁপাডালির মোড়ে আমার দেখা করার কথা ছিল। আগে থেকে ঠিক করা ছিল দিনক্ষণ। প্রতিটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের শেষে পরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমরা ঠিক করে নিতাম। সেদিনও তাই ঘটেছিল। ষোলো তারিখ সকালে লিপিকা বলেছিল, আজ দুপুরে তোকে নিয়ে কলকাতা যাব।

কলেজ আছে।

একটা দিন ডুব দে।

কেন?

কলকাতা গেলেই জানবি।

কৌতূহল হলেও লিপিকার সঙ্গে যাবার উপায় ছিল না। বললাম, আজ আমি যেতে পারব না।

কাজ আছে?

হ্যাঁ।

কাজটা নিয়ে লিপিকা প্রশ্ন করল না। চুপচাপ ঘরে ঢুকে গেল। তখন সকাল নটা। শরতের রোদে আকাশ ভেসে যাচ্ছে। লিপিকার হাবভাব, কথায় সন্দেহ জাগলেও আমি কোনও প্রশ্ন করলাম না। দুই বোন, মহাসমুদ্রে বিচ্ছিন্ন দুটো দ্বীপের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের মাঝখানে চোখের জল, আর ছলাৎছল ঢেউ ভাঙার আওয়াজ ছাড়া, অন্য কিছু ছিল না। লিপিকা কেন সেই দুপুরে আমাকে সঙ্গী করতে চেয়েছিল, জানলাম দশদিন পরে। কয়েকদিন ধরে যা আশঙ্কা করছিলাম, আশঙ্কা করে অস্থির হচ্ছিলাম, তাই ঘটে গেছে। ড্রইংরুমে বসে তমালকাকা, মিতাকাকিকে ঘটনাটা বলতে গিয়ে ছেলেমানুষের মতো বাবা হাউহাউ করে কাঁদছিল। মুখে শাড়ির আঁচল চেপে মা কান্না সামলাচ্ছিল। ড্রইংরুমের বন্ধ জানলার পাশে, চাতালে বসে আড়ি পেতে আমি শুনছিলাম। ষোলোই মার্চ কলকাতায় লিপিকাকে রেজিস্ট্রি করে টর্পেডো বিয়ে করেছে। ম্যারেজ রেজিস্টার অফিস থেকে খবরটা বাবা জেনেছে।

বন্ধ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছিল আমার বুক। বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তমাল কাকা। মায়ের পিঠে হাত রেখে মিতাকাকি গুম হয়ে বসেছিল। গরমকালে কাঠের জানলার দু পাল্লার মাঝখানে সরু রেখার মতো যে ফাঁক তৈরি হয়, সেখানে চোখ রেখে ঘরের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘরে দম বন্ধ করা অস্বস্তি। বাইরে নিঃশ্বাস চেপে আমি দাঁড়িয়ে আছি। একটু আগে সন্ধে হয়েছে। দুটো আলো জ্বলছে ড্রইংরুমে। দু পাল্লার রেখার মতো ফাঁক দিয়ে ড্রইংরুমের একফালি আলো অন্ধকার চাতালে এসে পড়েছে। আমি ছাড়া চাতালে কেউ নেই। দোতলার ঘরে লিপিকা শুয়ে আছে। দশদিনে আধখানা হয়ে গেছে শরীর। অসুস্থ দেখাচ্ছে। গত এক হপ্তায় দুবার তাকে নিয়ে বাবা বাড়ির বাইরে গিয়েছিল। কোথায় গিয়েছিল, জানতাম না। বাবার কথা শুনে জানলাম। নরম গলায় বাবাকে তমালকাকা বলল, এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? লিপির মতো বুদ্ধিমতী কলেজে পড়া মেয়ে যদি নিজের পছন্দে বিয়ে করে, ক্ষতি কি?

ঘরের মধ্যে সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা। তমালকাকা বলেছিল, লিপি নিশ্চয় আজেবাজে ছেলেকে বিয়ে করবে না।

বাবা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে তমালকাকা নড়েচড়ে বসল। দু পাল্লার ফাঁকে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু নড়তে পারছিলাম না। বাবার মুখে ষোলোই মার্চ তারিখটা শুনে চমকে গিয়েছিলাম। সেই সকালের ছবি হুবহু মনে পড়েছিল। মুখে না বললেও লিপিকা সে দিন রেজিস্ট্রি অফিসে আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি যাইনি। অমিতাভর পাশে বসে সেই দুপুরে লাইটহাউসে সিনেমা দেখেছিলাম। তামিল ছবি। সংলাপ একবর্ণ না বুঝলেও কিছু দৃশ্য দেখে লাল হয়ে যাচ্ছিলাম। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে আমার হাতের পাতায় তর্জনি দিয়ে অমিতাভ কিছু লিখছিল। কী লিখছিল, আমি জানি না। সিনেমার শেষে তর্জনি দিয়ে আঁকিবুকি কাটার মর্মার্থ অমিতাভ বলেছিল। শুনে আমি শিউরে উঠেছিলাম।

ড্রইংরুমের উজ্জ্বল আলোয় পুতুলের মতো বসে আছে চারজন মানুষ। তমালকাকা কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। টিপটিপ করছে আমার বুক। অমিতাভ সম্পর্কে কিছু খবর ইতিমধ্যে সহপাঠিনী হৈমন্তীর কাছ থেকে শুনেছিলাম। নবপল্লীতে হৈমন্তীদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে অমিতাভ থাকত। এখন থাকে বিরাটিতে। হৈমন্তীর মেজদার বন্ধু ছিল একসময়। ইঞ্জিনিয়ার মেজদার বয়স ত্রিশ। বোম্বাইতে চাকরি করে। অমিতাভর নাম শুনলে কানে আঙুল দেয়।

মাধ্যমিক কোনওমতে পাশ করার পরে অমিতাভর লেখাপড়ার পাট চুকে যায়। কলকাতার একটা কলেজে নাম লিখিয়ে স্মাগলিং শুরু করে। খুব সম্প্রতি এ সব খবর জানার পরে অভ্যুদয় সঙ্ঘ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের চাপেই নবপল্লী ছেড়ে বিরাটিতে বাসা নিতে অমিতাভর বাবা বাধ্য হয়েছে। হৈমন্তীর বিবরণের সঙ্গে লিপিকার প্রথম দিনের অনুমান মিলে যাচ্ছিল। সন্দেহের অতল ঘূর্ণিতে আমি পাক খেতে খেতে কল্পনায় যে অমিতাভকে গড়ে তুলেছিলাম, তাকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরলাম। অমিতাভ সম্পর্কে লিপিকার অনুমান যেমন ভুল ভেবেছিলাম তেমনই মিথ্যে লেগেছিল হৈমন্তীর বিবরণ। হৈমন্তী সত্যি বলছে না। অমিতাভর ওপর নিশ্চয় হৈমন্তীর দুর্বলতা ছিল। পাত্তা না পেয়ে এখন দুর্নাম করছে। তবু হৈমন্তীর বিবরণে জোর ধাক্কা খেয়েছিলাম। দু-তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। আঠারো বছরের তরুণী যে ভাবে প্রেমিকের সমর্থনে যুক্তি সাজায়, আমিও সাজিয়েছিলাম। ত্রিশ বছর বয়স, একজন পুরুষের পক্ষে এমন কিছু নয়। বারো বছরের বড়ো স্বামী তো কতো মেয়ের হয়। স্ত্রীর দ্বিগুণ বয়সী স্বামী প্রচুর আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেতে না পারলেও অমিতাভ ফালতু ছেলে নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে ব্যবসা করছে। স্বনির্ভর হতে দেরি নেই। জাপানে চিংড়ি মাছ রপ্তানি করে অঢেল টাকা কামাচ্ছে। ফুটো পয়সা আয় করার মুরোদ যাদের নেই, অমিতাভকে তারা স্মাগলার বলে প্রচার করছে। অমিতাভর দক্ষিণদাঁড়ির কারখানা, অফিস, আমি দেখিনি। ইচ্ছে করলে যে কোনওদিন সেখানে যেতে পারি। অমিতাভ বেশ কয়েকবার সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার জন্যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে। অমিতাভর ভালবাসায় বিন্দুমাত্র খাদ নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যে কোনও কাজ করতে পারে। লিপিকার প্রেমিক তারাপদ হালদারের চেয়ে অমিতাভ অনেক উঁচুদরের মানুষ। টর্পেডোকে লিপিকা বিয়ে করায় মা, বাবা যে আঘাত পেয়েছে, আমার ক্ষেত্রে তা ঘটবে না। অমিতাভকে জামাই করে মা, বাবা খুশি হবে।

বাবা শান্ত হবার জন্যে তমালকাকা অপেক্ষা করছে। বাবার পিসতুতো ভাই হলেও তমালকাকা আমাদের পরিবারের একজন। মা মারা যাবার পরে মামারবাড়িতে মানুষ হয়েছে। আমার ঠাকুরদা তফাত করেনি। বাবারও ভাই বলতে তমালকাকা ছাড়া কেউ ছিল না। তমালকাকারও তাই। সহোদর ভাই-এর মতো দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, আজও তা বজায় আছে। সঞ্জয় দত্তর পরিবারে দুঃখে সুখে তমালকাকা সবসময়ে পাশে এসে দাঁড়াত। লিপিকা, আর আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ করত। ধীরে ধীরে বাবা স্বাভাবিক হল। দু-তিনবার কেসে গলা সাফ করল। মাকে মিতাকাকি জিজ্ঞেস করল, ছেলে করে কী?

কিছু না। বিশ্ব বখাটে। নাম তারাপদ হালদার, সবাই বলে টর্পেডো। মাধ্যমিক ফেল। একবার নয়, তিনবার।

মিতাকাকি অবাক হয়ে শুনছে মায়ের কথা। মা বলল, আমাদের বাড়ির পিছনের মাঠে একদঙ্গল ছেলে নিয়ে ফুটবল খেলত, ক্রিকেট পেটাত। ক্রিকেট বল লেগে তিনচারবার আমাদের জানলার কাচ ভেঙেছে। একবার আমি চেঁচামেচি করায় যে ভাষায় গালাগাল দিয়েছিল, তা শোনা যায় না। আমার পাশে দাঁড়িয়ে অকথ্য গালাগাল লিপিও শুনেছে। এত অত্যাচার কী করে সে ভুলে গেল?

কষ্টে বুজে গেল মায়ের গলা। হাপরের মতো মা হাঁপাচ্ছে। মায়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মিতাকাকি। মা ফুঁপিয়ে উঠল, কেন এমন মেয়েকে জন্ম দিয়েছিলাম?

তমালকাকা, মিতাকাকিমা চুপ হয়ে গিয়েছিল। বাবা বলল, মীরা আর দুই মেয়েকে মাঠে দাঁড়িয়ে টর্পেডো যখন অকথ্য ভাষায় গাল দিচ্ছিল, একজন প্রতিবেশীও মুখ খোলেনি। বাড়ি ফিরে ঘটনাটা শুনে তখনই পাড়ার চা দোকানে গিয়েছিলাম। দলবল নিয়ে টর্পেডো সেখানে ছিল। হাতে চায়ের কাপ। আমি বলেছিলাম, তোমাদের খেলার জন্যে আমার যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ভাই। তিনবার ভাঙল জানলার কাচ।

আমার কথা টর্পেডোর কানে গেল না। নির্বিকারভাবে সে চা খেতে থাকল। কথাটা আমি দ্বিতীয়বার বলতে কাপের তলানি চা সে ছুঁড়ে দিল আমার মুখে। তার দলের তিন, চারজন ছেলে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। মীরা এসে না গেলে কী যে ঘটতো!

খবরটা পাড়ায় রটে গিয়েছিল। অপমানে কয়েকদিন মুখ তুলে হাঁটতে পারিনি। টর্পেডোর অত্যাচার ক্রমশ বাড়ছিল। ইটপাটকেল পড়ছিল বাড়িতে। আমাকে ভয় দেখাতে সাত সিলিন্ডারওলা বাইক চেপে যখন তখন ঝড়ের বেগে আমার গা ঘেঁষে চলে যেত। মীরার সঙ্গেও এই ব্যবহার করেছে। থানায় প্রতিকার চেয়ে পাইনি। থানার বড়বাবু বলেছে, ওরা পার্টিকর্মী। ওদের ছোঁওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি বরং পার্টিফান্ডে দশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে একটা রফা করে নিন। বাড়ি বিক্রি করে অন্য জায়গায় চলে যাবার কথা মীরা আর আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম। বিস্তর চিঠি পেয়েও প্রাণে ধরে বাড়িটা বিক্রি করতে পারলাম না। তখনই একদিন মীরার মুখে শুনলাম টর্পেডোর সঙ্গে লিপি চিঠি চালাচালি করছে। প্রথমে কাথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি। মনে হয়েছিল, মীরা ভুল করছে। লিপি এ কাজ করতে পারে না। সে রবীন্দ্রসংগীত শেখে, ছবি আঁকে, ভারতনাট্যম তালিম নিচ্ছে, চমৎকার অভিনয় করে। কলেজে পড়া শেষ করে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। অনেক পথ তাকে যেতে হবে। মীরার অভিযোগ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইলেও আতঙ্কে গুড়গুড় করছিল বুক। মীরা বলেছিল, শুধু চিঠি লেনদেন নয়, দুজনে রেস্টুরেন্টেও ঢুকছে।

বাবা থামল। লম্বা শ্বাস নিল। শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হল। বাবা বলল, আমাকে জানাবার আগে লিপির সঙ্গে মীরা কয়েক দফা কথা বলেছিল। লিপি পাত্তা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত হাতেনাতে ধরা পড়ল। টর্পেডোকে লেখা তার চিঠি পাওয়া গেল মালার স্বাস্থ্যবই-এর ভিতরে। মীরাই চিঠিটা হদিস করেছিল। ছোট বোনকে দূতীর কাজে লাগিয়েছিল লিপি।

যন্ত্রণায় কাঁপছিল বাবার গলা। জল এসে গিয়েছিল আমার চোখে। মনে হচ্ছিল, লিপির কথামতো কাজ করে অন্যায় করেছি। লিপি সম্পর্কে তমালকাকাকে বাবা যা বলছিল, আমার অজানা নয়। মা, বাবার চেয়ে আমি বরং বেশি জানতাম।

টর্পেডোর ভয়ে মা, বাবা তখন কাঁপছে। বাড়ি বেচে অন্য জায়গায় যাবার পরিকল্পনা করছে। মা, বাবার মতো আমিও ভয় পেতাম টর্পেডোকে। ঘেন্না হত, রাগ হত, ওকে খুন করার কথা পর্যন্ত ভাবতাম। মুখে প্রকাশ না করলেও বুকের ভিতরটা পুড়ে যেত। প্রথম দিকে আমার মতো ছিল লিপিকার মনোভাব। ক্রমশ সে বদলাতে থাকল। টর্পেডোর কথা উঠলে মুখ খুলত না। কড়া সমালোচনা শুরু হলে কোনও ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। লিপিকার আচরণে অবাক হতাম। আসল ঘটনা জানলাম এক দেড় মাস পরে। রাত তখন এগারোটা। ঘর অন্ধকার। পাশের বিছানা থেকে লিপিকা বলেছিল, মা, বাবা টর্পেডোকে যতো খারাপ ভাবে, সে তা নয়। মনটা ভাল। লেখাপড়া না শিখলেও এমন কিছু গুণ আছে, যা শিক্ষিত অনেক ছেলের নেই।

আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। অন্ধকার ঘরে লিপিকার কথা শুনে আমার দম আটকে যাচ্ছিল। তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। লিপিকার টর্পেডোপ্রশস্তি কিন্তু থামল না। ফি রাতে চলতে থাকল। লিপিকার মতো আমিও ভাবতে শুরু করলাম, বাইরে থেকে যাই মনে হোক, টর্পেডো খারাপ নয়। তারও কিছু গুণ আছে। তার অসভ্যতাও ভুলতে পারছিলাম না। টর্পেডো সম্পর্কে ঘৃণা আর আকর্ষণ, ইংরেজিতে যাকে বলে 'লাভ অ্যান্ড হেট' সমানভাবে অনুভব করতে থাকলাম। তখনই একদিন, মজার খেলা ভেবে চিঠি লেনদেনে রাজি হয়ে ক্রমশ লিপিকার একনম্বর পোস্টম্যান বনে গেলাম। টর্পেডোর ওপর রাগ কমে এল। বাড়তে থাকল আকর্ষণ।

আমি হেরে যাচ্ছি তমাল!

বাবার কথাটা হাহাকারের মতো শোনাল। বাবার কষ্ট আমি বুঝতে পারছিলাম। টর্পেডোর কাছে হেরে গিয়ে বাবার বুকের ভেতরটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। টর্পেডোকে জিতিয়ে দিয়েছে লিপিকা। জন্মদাতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় টর্পেডোর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মা বলল, কাল থেকে লিপিকার কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দাও। লেখাপড়ার আর দরকার নেই। অনেক পাপ করলে এমন মেয়ের জন্ম দিতে হয়।

বাবা সাড়া করল না। মা বলল, আজ বুঝতে পারছি, শুধু ভালো স্কুল, কলেজে পাঠিয়ে, নাচ গান, ছবি আঁকা শিখিয়ে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করা যায় না। আরও কিছু চাই। সেটা কি? আমি জানি না। কোন মা-বাবা জানে, তাও জানি না। আমাদের সংসারের কর্তা, এসব নিয়ে কখনও ভাবেনি।

বাবা প্রতিবাদ করল না। অপরাধীর মতো মুখ করে বসে আছে। হয়তো অনুতাপ করছে। আমি জানি, বাবা নির্দোষ। কোনও ভুল, কোনও গাফিলতি বাবা করেনি। তিপান্ন বছরের মধ্যে বাড়ি বানিয়েছে। সংসারে সবাইকে সুখে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। স্বামী হিসেবে, বাবা হিসেবে সঞ্জয় দত্তর ত্রুটি নেই। বাবা বলল, ছেলেমেয়ে মানুষ করতে লেখাপড়া, নাচগান শেখানো দরকার, আমি জানি। শেখাবার আয়োজন করে দিয়েছি। ভালো বই, গানের ভালো ক্যাসেট বেরোলে, মেয়েদুটোর জন্যে কিনে এনেছি। তারপরে আর কী দরকার, জানতাম না। আজও জানি না।

বাবা থামল। দু'মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট না ভাবার জন্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো করে বাবা বলল, ছেলেমেয়ে মানুষ করার অজানা উপকরণের হদিস পেলেও কিছু করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আমার সব চেষ্টা বেনো জলে ভেসে যেত। মেয়ে দুটোকে গিলে নিয়েছে সেলুলয়েডের পৃথিবী। লিপি ছেলেবেলায় টেলিভিশনকে বলত, আমার ছোটভাই। বোনের নাম মালা, ভাই-এর নাম টিভি। বলে, খিলখিল করে হাসত। বড় হয়ে সেকথা আর বলে না। বলার দরকার হয় না। ছোট ভাই এখন বড় ভাই হয়ে গেছে। বড় ভাই, টেলিভিশনের মানুষ, ঘরবাড়ি, জীবনযাপন, দু'মেয়ের কাছে সত্যি হয়ে উঠেছে। টেলিভিশনের মতো করে তারা চলতে, বলতে, ভাবতে শিখে ফেলেছে। কোথাও যাবার কথা থাকলে, তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে টিপটপ লাল মারুতি গাড়ি। গাড়িতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে ড্রাইভারের ছদ্মবেশে বসে আছে সুদর্শন নায়ক। সে ধর্মেন্দ্র, রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, যে কেউ হতে পারে। বেডরুমে নায়ক ঢুকে পড়লে মেয়েদের কীভাবে আমি আগলাব?

আমি জানি, বাবার কথা মিথ্যে নয়। টর্পেডোর সঙ্গে লিপিকার প্রেম করার প্রধান কারণ, তার চেহারা ধর্মেন্দ্রর মতো। চালচলন, কথাবার্তাতেও সে অবিকল ধর্মেন্দ্র। লিপিকা বলত,

ধর্মেন্দ্রর চেয়ে ও বেশি অ্যাট্রাক্টিভ। 'ও' শব্দটা উচ্চারণ করার মুহূর্তে তার দু'চোখ আবেশে বুজে আসত। টোল পড়ত দু'গালে।

মিতাকাকিকে বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, আজ তোমাদের কেন আসতে বলেছি, জানো?

তমাল, মিতা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে বাবা বলেছিল, সেই ছেলেটা, মানে টর্পেডো, রাত আটটায় আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবে। খবর পাঠিয়ে আমিই আসতে বলেছি। তোমরা পাশে থাকলে বুকে বল পাব। যা বলতে চাই, বলতে পারব। প্রথমে লিপিকে ছেড়ে দেবার জন্যে অনুনয়, বিনয় করব। দরকার হলে তাকে বিশ, পঁচিশ হাজার টাকা দিতে রাজি আছি। তা না হলে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বার করে বাবা কপালের ঘাম মুছল। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমার ভায়রাভাই রাজ্যেশ্বর ঘোষ, দুঁদে উকিল। তার সঙ্গে কথা বলে ইতিমধ্যে আদালতে লিপিকে দিয়ে এফিডেভিট করিয়েছি। এফিডেভিটের ভিত্তিতে টর্পেডো আর তার রেসুড়ে বাবার বিরুদ্ধে রাজ্যেশ্বর মামলা করবে। সঞ্জয় দত্তর সম্পত্তির লোভে তার মেয়ে লিপিকা দত্তকে ভুলিয়ে ভালিয়ে টর্পেডো বিয়ে করেছে, এই অভিযোগ আনা হবে। চক্রান্তে সাহায্য করছে টর্পেডোর বাবা মাখন হালদার। আদালতে সাক্ষির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এফিডেভিটের বয়ান থেকে লিপি একচুল না নড়লে, টর্পেডো, মাখন হালদারেব জেল হয়ে যাবে। এক ঢোঁক জল খেয়ে বাবা বলল, কয়েক বছরের জন্যে লিপিকে কানাডায় পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করছি। মীরার মাসতুতো বোন, মানে আমার শ্যালিকা অঞ্জনা বিশ্বাস কানাডায় থাকে। অঞ্জনা আর তার স্বামী দু'জনেই ডাক্তার। বিশাল বড়লোক। তাদের চিঠি দিয়েছি। কাল, পরশু টেলিফোন করব। আমার বিশ্বাস, লিপিকে রাখতে তাদের অসুবিধে হবে না। বিদেশে কিছুদিন থাকলে এসব ঘটনা লিপি ভুলে যাবে।

লিপিকা কী বলছে?

মিতাকাকি প্রশ্নটা করতে মা বলেছিল, ঠোঁট টিপে বসে আছে। আদালতে এফিডেভিট জমা করার পরেও একটা কথা বলেনি। মেয়েটা হঠাৎ অচেনা হয়ে গেছে। কীভাবে হলো, জানি না। পেটের সন্তান, বিশেষ করে মেয়ে, দূরে সরে যাচ্ছে, মা হয়েও বুঝতে পারিনি। অথচ দু'মেয়ের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলাম আমি। আমাকে সবকিছু না বলা পর্যন্ত তাদের পেটের ভাত হজম হতো না। মেয়েদের মুখ দেখে, তাদের বুঝতে পারতাম। মা হিসেবে যথেষ্ট গর্ব ছিল। সব ভেঙে গেছে। এখন টের পাচ্ছি, আমার মতো অযোগ্য মা আর নেই।

বাবা ঘড়ি দেখছে। সম্ভবত আটটা বেজে গেছে। যে কোনও মুহূর্তে টর্পেডো এসে যাবে। মা বলল, মালার জন্যে এখন ভয় করছে। সে আবার কী কাণ্ড ঘটাবে, জানি না। দিদির পথে সে হাঁটলে আমরা কী নিয়ে বাঁচব? তখন হয়তো বাঁচার দরকার থাকবে না।

মার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মিতাকাকি বলল, এতো ভাবছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিতাকাকির কথা মায়ের কানে ঢুকল না। আগের কথার জের ধরে মা বলছিল, লিপির জন্যে আমার আর একফোঁটা দরদ নেই। মনটাকে সে মরুভূমি করে দিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি এ বাড়ি ছেড়ে সে চলে যায়, তত মঙ্গল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচব। মালাকে বাঁচাতে পারব। মালার বিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ে দেব। মালা অবশ্য ডাঁটো মেয়ে। চট করে তাকে ফাঁদে ফেলা মুশকিল। মা বাবার কথা সে ভাবে। মা বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। কত দিন বাসবে, জানি

না। আমার সব বিশ্বাস শেষ হয়ে গেছে।

লম্বা শ্বাস ফেলে মা বলল, আমার কাছ থেকে মেয়েদুটোকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাদের বাবা, সঞ্জয় দত্ত। মায়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে বাবা তাকিয়ে আছে। মা বলল, আমাকে না জানিয়ে তাদের টাকা দিয়েছে, আরও কি, কি দিয়েছে, জানি না। সত্য গোপন করতে শিখিয়েছে।

কী বলছ তুমি?

বাবার অস্ফুট গলা শুনতে পেলাম। মা বলল, ঠিক বলছি। লিপির প্রাণের বন্ধু, যে আত্রেয়ীকে তুমি তৃতীয় মেয়ে বানিয়েছিলে, তার মা মিসেস চ্যাটার্জি কেমন শিক্ষা দিল? টর্পেডোর সঙ্গে জিপে চেপে ম্যারেজ রেজিস্টারের কাছে বিয়ের সাক্ষ দিয়ে এল। সে খবর তোমাকে শুনতে হলো ঠিকেদার নরেন সরকারের কাছে। পাড়ার সবাই খবরটা জেনে গেছে।

ঘাড় হেঁট করে বাবা বসে আছে। স্ত্রীর অভিযোগ পুরো ভুল নয়, জানে। রাস্তায় প্রতিবেশিদের কারও সঙ্গে দেখা হলে মুচকি হেসে বলছে, শুভ সংবাদ পেয়ে গেছি। কবে হচ্ছে ভোজ? জানাবেন কিন্তু।

আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। জ্ঞান হবার পর থেকে যে মা, বাবাকে উঁচু গলা কখনও করতে দেখিনি, হঠাৎ তারা বদলে গেছে। পরস্পরকে ছায়া দেওয়া ছাড়া যারা আর কিছু ভাবতে পারত না, তারা সবার সামনে ঝগড়া করছে। ঝগড়া বেড়ে গিয়ে তিক্ত কলহের চেহারা নিয়েছিল।

রাস্তা থেকে সাত সিলিন্ডার মোটরবাইকের জোরাল আওয়াজ ভেসে এল। আওয়াজটা আমার চেনা। আমার চেয়ে মা, বাবা বেশি জানে। বন্ধ গেটের বাইরে বাইক থামল। টর্পেডো এসে গেছে। গেট খুলে টর্পেডো বন্ধ করল না। রোমাঞ্চে খাড়া হয়ে উঠেছিল আমার গায়ের রোম। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছল বাবা। তমালকাকা সিগারেট ধরাল। মোরাম বিছানো পথ দিয়ে হেঁটে আসছে টর্পেডো। তার জুতোর মসমস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। পাশে দু'পথের সমান মাপের দেবদারু গাছের সারি। শিউলি, জবা, টগর, গন্ধরাজও আছে। গাছগুলো বাবা লাগিয়েছিল। এখনও যত্ন করে। হপ্তায় একদিন মালি এসে ডালপাতা ছেঁটে দিয়ে যায়। গাছে জল দেয়। বাবা দাঁড়িয়ে থেকে গাছের পরিচর্যা দেখে। আবছায়া মোরামের পথ দিয়ে টর্পেডো আসছে, জানলার আড়াল থেকে তার মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও, হাঁটার ডোন্টকেয়ার ভাব নজর এড়াল না। লালে মোড়া তার সর্বাঙ্গ। মাথায় লাল হেলমেট, শরীরে লাল উইন্ডচিটার, তার তলায় লাল গেঞ্জি, লালাভ খয়েরি ট্রাউজার্স, এমন কি, গোড়ালির ওপর পর্যন্ত ঢাকা, টিপকল লাগানো জুতো পর্যন্ত কালচে লাল। তমাল দেখছে টর্পেডোকে। বাবা তাকিয়ে আছে দেওয়ালের দিকে। দুঃস্বপ্নের হাত ধরে মৃত্যু এগিয়ে আসতে থাকলে, কে দেখতে চায়? মিতাকাকির চোখে ঘনীভূত বিস্ময়। মায়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে একটা হিন্দি ছবিতে এই পোশাকে ধর্মেন্দ্রকে দেখেছিলাম। ছবির নাম মনে করতে পারলাম না। ছবির একটা দৃশ্য মনে পড়ল। নির্জন জঙ্গলে নায়িকার ইজ্জত বাঁচাতে এগারো জন গুণ্ডাকে ধর্মেন্দ্র একা পিটিয়ে ছাতু করে দিয়েছিল। গুণ্ডারা পালাবার পথ পায়নি। আমার মনে হচ্ছিল মা, বাবা, কাকাকাকিকে সিনেমার ধর্মেন্দ্র পেটাতে আসছে।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বাবাকে টর্পেডো জিজ্ঞেস করল, আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ, ভেতরে এস।

টর্পেডো ঘুরে ঢুকল। বাঁ দিকের কৌচে বসে লাল হেলমেটটা পায়ের কাছে মেঝেতে

রাখল। বন্ধ জানলার খাঁজে চোখ রেছে টর্পেডোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। উইন্ডচিটারের তলায় লাল টিশার্টের তিনটে বোতাম খোলা। গলায় বাঘনখ লাগান সোনার চেন। বাবা কীভাবে কথা শুরু করবে, ভেবে পাচ্ছে না। বাবার দিকে সুর্মা লাগানো স্থির চোখে তাকিয়ে আছে টর্পেডো। অস্বস্তিতে জড়োসড়ো হয়ে বাবা প্রশ্ন করল, তুমি কী করো?

বিজনেস। এক্সপোর্টার।

এক্সপোর্ট আইটেম কি?

রেডিমেড পোশাক, চামড়ার গ্লাভ্‌স্‌।

বছরে টার্নওভার কত? টার্নওভার শব্দটা বুঝতে না পেরে টর্পেডোকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাবা জিজ্ঞেস করল, বছরে কতো টাকা লেনদেন করো?

দু'কোটি।

টাকার অঙ্ক শুনে বাবা হাঁ হয়ে গেল। কারখানার ঠিকানা জানতে চাইল না। ব্যাঙ্কের পাশবই দেখাতে বলল না।

আমার ব্যবসায়ী বাবা বুঝে গিয়েছিল, টর্পেডো একটাও সত্যি কথা বলছে না। বাবা বলল, লিপিকাকে তুমি ছেড়ে দাও।

মানে?

বিশ, পঁচিশ হাজার টাকা, যা চাইবে দেব। মেয়েটাকে তুমি মুক্তি দাও।

লাল হেলমেট কোলে তুলে নিল টর্পেডো। চোয়াল শক্ত করল। বলল, টর্পেডো হালদার টাকার ভুক্কার নয়।

দয়া করো আমাকে।

কথাটা বলে হাতজোড় করে টর্পেডোর দিকে বাবা তাকিয়ে থাকল। মুচকি হেসে টর্পেডো জিজ্ঞেস করল, আপনার মেয়ে কী বলছে? প্রশ্ন শুনে বাবা চুপসে গেল। টর্পেডো বলল, সামনের সপ্তায় লিপিকাকে নিয়ে যাব। মা মারা যাবার পর থেকে বাবার শরীর খারাপ। বাবাকে দেখাশোনা করার জন্যে বাড়িতে একজনের থাকা দরকার।

লিপির লেখাপড়া, পরীক্ষা?

আমাদের বাড়ি থেকে করবে।

তমালকাকা মুখ খুলল, বলল, পরীক্ষার দেরি নেই। পরীক্ষার পরে নিয়ে গেলে ভালো হত।

তমালকাকার দিকে চোখ সরু করে তাকিয়ে টর্পেডো জিজ্ঞেস করল, আপনি?

অপমানে তমালকাকা সিটিয়ে গেল। বাবা বলল, এ আমার ভাই, তমাল বোস। আর ওই ভদ্রমহিলা তমালের স্ত্রী মিতা।

নমস্কার করা দূরের কথা, মিতাকাকিকে টর্পেডো তাকিয়ে দেখল না। ঘরে নিশ্ছিদ্র নীরবতা। দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে আছে বাবার কপাল। রুগ্ন বাবাকে দেখাশোনার জন্যে লিপিকে টর্পেডো বিয়ে করেছে, এ কথাটা বাবা হজম করতে পারছিল না। পরিচারিকা হবার জন্যে লিপি জন্মায়নি। সবচেয়ে বড় কথা টর্পেডোর বাবা মাখন হালদার অসুস্থ নয়। সাতদিন আগে ডাকবাংলো মোড়ে তাকে রেসের বই-এর পাতা ওল্টাতে দেখেছে বাবা। কথাটা মাকে, আমার সামনে বাবা বলেছিল। বিপত্নীক মাখন হালদার যে দস্তুরমতো সুস্থ, অফিস যায়, আড্ডা মারে, লোকজনের মুখ থেকে বাবা শুনেছে। বাবার ধারণা ছেলেকে দিয়ে ফাঁদ পেতে লিপিকে ধরার ছক মাখন

হালদার করেছে। রেজিস্ট্রির একমাসের মধ্যে লিপিকে নিজের বাড়িতে আটকে ফেলতে চায়। টের্পেডো বলল, লিপিকে ডাকুন,সেকী চায়, নিজে বলুক।

ঘরে যেন বাজ পড়ল। শুকনো মুখ বাবা বলল, লিপি গেছে তার পিসির বাড়ি।

বাড়িটা কোথায়?

বরানগরে।

ঠিকানা?

প্রায় কোণঠাসা হয়ে গিয়ে বাবা বলল, কালই সে ফিরবে।

ফিচেল হাসি হেসে টর্পেডো বলল, এখানে ঢোকার সময়ে দোতলার জানলায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমার বাইকের শব্দ শুনেই বোধহয় জানলায় চলে এসেছিল।

লাল হেলমেট নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে টর্পেডো বলল, লিপি আমার বিয়ে করা বউ। সামনের সপ্তায় তাকে নিতে আসব।

মোরামের রাস্তা দিয়ে গটগট করে টর্পেডো চলে গিয়েছিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে মা কাঁদছিল। মুখ চুন করে বসেছিল মিতাকাকি। বন্ধ জানলার পাশ থেকে আমি যখন সরে গেলাম, চোখদুটো যন্ত্রণায় টনটন করছে।

রাত কত হলো, জানি না। দার্জিলিং মেল কোন একটা স্টেশনে ঢুকছে। ধীরে ধীরে কমে আসছে গাড়ির গতি। সামনে কোন স্টেশন? পাণ্ডুয়া, না গৌড়? জাহান্নাম হলেও আমার কিছু যায় আসে না।

টর্পেডো যা চেয়েছিল, তাই হলো। সেই সন্ধের সাতদিন পরে বাড়ি থেকে প্রায় একবস্ত্রে বেরিয়ে গিয়েছিল লিপিকা। বাড়িব কেউ জানতে পারেনি।

আত্মকথন-২

বোকারমতো লিপিকা এক কাপড়ে বাড়ি ছাড়লেও আমি সে ভুল করিনি। লিপিকার পরিণাম থেকে শিক্ষা নিয়েছিলাম। সে প্রসঙ্গের আগে লিপিকাপর্ব শেষ করে নিতে চাই।

স্টেশনে কিছু হইচই, যাত্রী ওঠা, নামার পরে দার্জিলিং মেল আবার চলতে শুরু করেছে। আজ রাতে আমার ঘুম আসবে না। জীবনের নানা পর্বের পরিচয়গুলো চলন্ত ট্রেনের মতো মগজের মধ্যে ঝমঝম করে ছুটতে থাকলে, কে ঘুমোতে পারে? ঘুমিয়ে পড়তে আমি ব্যস্ত নই। ট্রেনের গতির সঙ্গে ঘটনার গতি মিলিয়ে নিজেকে চিরে চিরে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কষ্ট হলেও থামতে পারছি না। রেলগাড়ির সঙ্গে সমান তালে ঘটনাস্রোতে ভেসে চলেছি। ষোড়শী মালবিকার বয়স হয়েছে উনিশ। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সদ্যবিবাহিতা তেইশ বছরের লিপিকা। লিপিকাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গৃহত্যাগিনী লিপিকার খোঁজে বাবা থানা, পুলিশ করেনি। তমালকাকাকে পর্যন্ত জানায়নি। ব্যবসা থেকে বাবার মন চলে গিয়েছিল। হপ্তায় এক, দু'দিনের বেশি বাড়ি থেকে বেরতো না। সংসার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাচ্ছিল। উদাসীনতা যত বাড়ছিল, অন্ধের মতো আমাকে আঁকড়ে ধরছিল। মা থেকে থেকে কাঁদত। মা বাবার দশা দেখে কষ্টে বুকেব ভেতরটা মুচড়ে উঠলেও অমিতাভর সঙ্গে যোগাযোগ শিথিল হয়নি। ঘনিষ্ঠতা লাফে লাফে বাড়ছিল। সম্পর্কের চরম মুহূর্তের জন্যে আমরা প্রতীক্ষা

করছিলাম। অমিতাভ মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে উঠলেও মধুর ছলনা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখছিলাম।

বাড়ি থেকে উধাও হবার মাসখানেক পরে একদিন শেষ বিকেলে মা, বাবার সঙ্গে লিপিকা দেখা করতে এসেছিল। মোটারবাইকের পিছনে বসিয়ে বাড়ির গেটে তাকে পৌঁছে দিয়ে টর্পেডো চলে গিয়েছিল। আমাদের বাড়িতে ঢোকেনি। জরিপাড়, লাল সবুজ ডোরাকাটা সিল্ক শাড়ি, লাল ব্লাউজ, দগদগে সিঁদুরে রঞ্জিত সিঁথি মেয়েকে দেখে মা হকচকিয়ে গিয়েছিল। লিপিকা এসেছে টের পেয়ে বাবা চুপচাপ বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। মেয়েকে আপ্যায়নে গর্ভধারিণী মায়ের কোনও ব্যস্ততা ছিল না। বলা যায়, চোখে পড়ার মতো শীতল ছিল মায়ের আচরণ। স্বামী, শ্বশুর, নতুন সংসার নিয়ে লিপিকাকে একটা প্রশ্ন করেনি। লিপিকা ভালো আছে, না মন্দ আছে, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিল। দু-চারটে কাজের কথা ছাড়া আর কিছু বলেনি। মায়ের কথা বলার ভঙ্গিতে আমার মনে হচ্ছিল, একজন মৃত মানুষ, আর এক মৃতের সঙ্গে কথা বলছে। সঙ্কোচে জড়োসড়ো লিপিকাকে মা বলেছিল, তোমার শাড়ি, গয়না,আর যা জিনিসপত্র, নিয়ে যাও। আজ সব নিতে না পারলে, বাকি জিনিস আমি পাঠিয়ে দেব। কষ্ট করে তোমাকে আসতে হবে না।

কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল লিপিকার মুখ। ছলছল করছিল চোখদুটো। কৌতূহলে আমি ফেটে পড়ছিলাম। কত কথা যে শোনার ছিল, বলার ছিল, হিসেব নেই। মায়ের আচরণে দপ করে নিভে গিয়েছিল আমার আগ্রহ। পরিবারে বাইরের লোক হয়ে গেছে লিপিকা, সেই প্রথম অনুভব করলাম। লিপিকাকে ছায়ার মতো মা অনুসরণ করছিল। ছোট মেয়ের মাথা, লিপিকা খারাপ করে দিতে পারে, মা এই ভয় পাচ্ছিল। শোবার ঘরে ঢুকে, নিজের এককালের খাটটার দিকে মুহূর্তের জন্যে লিপিকা করুণ চোখে তাকাল। লিপিকার আলমারি খুলে দিয়ে মা সরে দাঁড়াল। দুটো ব্যাগে শাড়ি, ব্লাউজ, কিছু বই খাতা গোছাতে লিপিকার সঙ্গে আমিও হাত লাগিয়েছিলাম। সন্ধের মুখে আমাকে একান্তে ডেকে লিপিকা জিজ্ঞেস করেছিল, অমিতাভর সঙ্গে দেখা হয়?

হয়।

সাবধানে মেলামেশা করিস। আমার মতো ভুল করিসনি।

আমি বলতে পারতাম, ভুল আমি করিনি, এবং করব না। সবাই টর্পেডো হালদার নয়। অমিতাভর মতো সাচ্চা ছেলেও সংসারে আছে।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার মতো কথাগুলো বলিনি। লিপিকাকে দেখে মায়া হচ্ছিল। যাই হোক, সে আমার দিদি। দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছি, একঘরে শুয়েছি। রাতে কখনও ভয় পেলে লিপিকাকে পাশে ডেকে নিয়েছি। ঘুমচোখে আমার পাশে এসে সে শুয়েছে। দুই বোনে কথা, গল্প, আড়ি, ভাবের শেষ ছিল না। বাড়ি ছেড়ে লিপিকা চলে যেতে আমি একা হয়ে গিয়েছিলাম। একা এবং নিঃসঙ্গ। লিপিকা পাশে থাকার সময়ে, আমার কতটা সে জুড়ে ছিল, চলে যাবার পরে টের পাচ্ছিলাম। রাতে বিছানায় শুয়ে কতবার যে তাকে মনে পড়ত। রাতের পর রাত ঘুমোতাম না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতাম। প্রার্থনা করতাম, লিপিকা যেন সুখে থাকে। পেটমোটা দুটো ব্যাগ নিয়ে ড্রইংরুমে টর্পেডোর জন্যে লিপিকা অপেক্ষা করছিল। সন্ধের পরে মোটরবাইক নিয়ে টর্পেডো এসে গেল। হর্ন বাজাল দু'বার। আওয়াজ পেয়ে সোফা থেকে উঠে আমার পিঠে হাত রেখে লিপিকা বলেছিল,

সাবধানে থাকিস।

মা ছিল রান্নাঘরে। বাইকের আওয়াজ শুনেও বেরোয়নি। মায়ের সঙ্গে দেখা করে দুটো ভারি ব্যাগ নিয়ে মোরাম বিছানো পথে লিপিকা একা চলে গেল। আমি যাইনি। তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মুচড়ে উঠছিল আমার বুক। গেট পর্যন্ত লিপিকাকে এগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ভারী দুটো ব্যাগের একটা অনায়াসে বয়ে দিতে পারতাম। কেন দিলাম না? লিপিকাকে মা, বাবার পাশ কাটানো দেখে আমিও তাকে কাটাতে চাইছিলাম। সহযোগিতা করা উচিত কিনা বুঝে উঠতে পারিনি। লিপিকার সঙ্গে এই শেষ দেখা।

বাড়ির দরজা তার কাছে বরাবরের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাকি জিনিসপত্র লোক দিয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে মা পাঠিয়ে দিয়েছিল। টর্পেডোর সঙ্গে এক বছরের বেশি দাম্পত্যজীবন কাটানো লিপিকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বছর ঘোরার আগে লিপিকার জীবনে দাঁড়ি পড়েছিল। অন্তসত্ত্বা লিপিকা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তখনও তার পঁচিশ হয়নি। গলায় ফাঁস দেবার আগে এক টুকরো কাগজে লিখে গিয়েছিল, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

অথচ সবাই জানতো, টর্পেডো দায়ী। লিপিকাকে খুন করে সিলিং ফ্যান থেকে সে ঝুলিয়ে দিলে অবাক হবার কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক। তবু লিপিকার আত্মহত্যার কাহিনী সবাই মেনে নিল। প্রকৃত ঘটনা কেউ জানল না। লিপিকার লেখা চিরকুট বাঁচিয়ে দিল টর্পেডোকে। চিরকুট লিখতে সে বাধ্য হয়েছিল কিনা, এ প্রশ্ন কেউ তুলল না। খবরটা শুনে বাবা এমনভাবে তাকিয়েছিল, যেন লিপিকা নামটা কখনও শোনেনি। লিপিকা নামে সঞ্জয় দত্তের কোনও মেয়ে ছিল না। মা হঠাৎ বুড়ি হয়ে গিয়েছিল। ছেচল্লিশ বছর বয়সে সাদা হয়ে গিয়েছিল মাথার অর্ধেক চুল।

আমার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সাতদিন আগে লিপিকা আত্মহত্যা করেছিল। খবরটা শুনে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল আমার বুক। কেঁদে কূল পাইনি। পরীক্ষার পড়া ডকে উঠেছিল। মহকুমায় মাধ্যমিকে প্রথম হওয়া মেয়েটা, তৃতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করবে কি না, সন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত টায়ে টায়ে সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছিলাম। রেজাল্ট দেখে সবাই বলেছিল, মেয়েটা গোল্লায় গেছে। লিপিকার মৃত্যু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পড়ার বই সামনে রেখে লিপিকার পরিণাম নিয়ে ভাবতাম। কেন মরতে হলো লিপিকাকে? টর্পেডোকে কেন কাটাতে পারল না? লিপিকা একবার আমাকে বলেছিল, মা বাবার পছন্দ করা শিক্ষিত, সুপাত্রদের মধ্যে থেকে একজনও যখন আমাকে বিবাহযোগ্য মনে করল না, তখন তারাপদ নিজে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এত সম্মান কে দিতে পারত?

লিপিকা সেদিন যাই বলে থাকুক, আমি বিশ্বাস করিনি। লিপিকা পুরো সত্যি বলছে না, ধরে ফেলেছিলাম। বিয়ের আগে টর্পেডোর সঙ্গে এমন জড়িয়ে গিয়েছিল, যে জাল কেটে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। জালটা কী, যা জীবনের মতো তাকে বেঁধে ফেলল? ভালবাসা না থাকলে মেয়েরা অনেকসময় ভয়ে পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। টর্পেডোকে লিপিকা ভয় পেয়েছিল। ভয়েব কারণ কী? লিপিকা না বললেও আমি অনুমান করতে পারতাম। দিঘাতে টর্পেডোর সঙ্গে লিপিকা এমন কিছু করেছিল যা প্রকাশ্যে বলা যায় না। প্রথমত, দিঘা গিয়েছিল গোপনে। দ্বিতীয়ত, তাকে ফাঁসানোর অস্ত্র সে নিজে টর্পেডোর হাতে তুলে দিয়েছিল। অস্ত্রটা কী হতে পারে, আমি ভাবতাম। দু'জনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের কয়েকটা ছবি কি টর্পেডো তুলে রেখেছিল? রাখতে পারে। লিপিকার লেখা সমস্ত প্রেমপত্র নিশ্চয় সমান নিরীহ ছিল না।

চারপাশ থেকে তাকে এমনভাবে টর্পেডো বেঁধে ফেলেছিল, যে তার নড়াচড়া করার ক্ষমতা ছিল না। টর্পেডোকে ভালবাসতে বাধ্য হয়েছিল। সংসারে হরবক্ত এমন হয়। পরিস্থিতির চাপে সবচেয়ে ঘৃণার পুরুষকে ভালো না বেসে একজন মেয়ের উপায় থাকে না। আবার উল্টোটাও হয়। ভালবাসার মানুষ সম্পর্কে জীবনের কোনও এক পর্যায় তীব্র ঘৃণা জাগতে পারে। ভালবাসার পাত্রকে ঘৃণা করা গেলে, ঘৃণার পাত্রকে ভালবাসতে অসুবিধে কি? কোনও অসুবিধে নেই। ঘটনাটা অস্বাভাবিক নয়। পুরো স্বাভাবিকও নয়। ভালবাসার মানুষকে ঘৃণা করে এবং ঘৃণার মানুষকে ভালবেসে কিছু মেয়ে যখন আত্মহত্যা করে, তখন ধরা পড়ে, সম্পর্কে অস্বাভাবিকতা ছিল। ভালবাসার মানুষকে ঘৃণা করার চেয়ে ঘৃণ্যজনকে ভালবাসতে বাধ্য হওয়ায় অস্বাভাবিকতা বেশি। সেখানে আত্মহত্যাও বেশি। লিপিকার মতো মেয়েকে মরতে হয়। সেই বয়সে ঠিক এভাবে ভাবিনি। ভাবার কথা নয়। লিপিকার মৃত্যু আর অমিতাভর সংসর্গ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। লিপিকার মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে অমিতাভকে দেবশিশু বানাতে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছিলাম। চিন্তার এতরকম কসরত করতে হচ্ছিল, যাকে ক্লান্তিকর আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু বলা যায় না। অমিতাভ দেবশিশু নয়, আমি জানতাম। তবে সে যে টর্পেডোর মতো তৃতীয় শ্রেণীর জীব নয়, এ বিশ্বাস আমার ছিল। ভয়ে নয়, ভক্তিতে নয়, নিজের ইচ্ছেতে তাকে ভালবেসেছিলাম। ঘৃণায় পুরুষকে বাধ্য হয়ে ভালবাসার সঙ্গে আমার ভালবাসার আকাশপাতাল তফাত ছিল। ভালবাসার মানুষকে ভালবেসে তার জীবনসঙ্গিনী হতে চেয়েছিলাম। তাকে দেখলেই মনে পড়ত, একঝাঁক উজ্জ্বল ছাত্রের সঙ্গে সম্বর্ধনাসভামঞ্চে বসে আছে মহকুমায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারিনী একটি মেয়ে। মাইকে তার নাম ঘোষণা করছে গুণমুগ্ধ একজন পুরুষ। ঘোষণায় পুরাণ, উপনিষদের মহীয়সী মহিলাদের সঙ্গে সঞ্জয় দত্তর মেয়ে মালবিকা দত্তর নাম উচ্চারিত হচ্ছে। প্রশংসায় সবাই খুশি হয়। আমি হয়েছিলাম। তোষামোদে সবাই গলে যায়। আমি গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, আমার ভালবাসা বাড়ির অনুমোদন পাবে। মা, বাবা পছন্দ করবে অমিতাভকে। আমার জীবনের প্রথম সুখস্মৃতির সঙ্গে যে মিশে ছিল, সে অপছন্দের মানুষ নয়। প্রথম যেদিন সে আমাদের বাড়িতে আসে, মা তাকে পছন্দ করেছিল। চা, মিষ্টি খাইয়েছিল। তারপর তিন বছর আমাদের বাড়িতে আর আসেনি। আসার মতো উপলক্ষ ঘটেনি। অমিতাভ জানত, লিপিকা তাকে অপছন্দ করছে। তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে। অমিতাভকে এসব তথ্য আমি-ই সরবরাহ করছিলাম। একান্ত পারিবারিক ঘটনাও অমিতাভকে গোপন করিনি। মা, বাবা, দিদি, গোটা পরিবারের চেয়ে অমিতাভ আপনজন হয়ে উঠেছিল। আমার অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছিল। সেখান থেকে তাকে সরানো সম্ভব ছিল না। তার সম্পর্কে বিসদৃশ খবর কানে এলে গুরুত্ব দিতাম না। খবরগুলো সংশয়াতীত নয়, এই ভেবে "বেনিফিট অব ডাউট" -এ সব অভিযোগ খারিজ করে দিতাম। খারিজ করার আর একটা কারণ, আমার আত্মাভিমান। আমি যাকে পছন্দ করেছি, সে খারাপ হতে পারে না। আমার পছন্দের মানুষ গুণবান হতে বাধ্য। ছিদ্রান্বেষীরা গুণবান মানুষেরও দোষ খুঁজে বেড়ায়। সামান্য দোষত্রুটিকে অপরাধ, এবং অপরাধকে পাপ বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে। ছিদ্রান্বেষীরা হলো চালুনি। ছুঁচকে বলে, তোমার শরীরে ফুটো কেন?

শতছিদ্র চালুনির উদাহরণ হাতের কাছে ছিল। সে লিপিকা। অমিতাভ সম্পর্কে তার সমালোচনা আমার কাছে অমিতাভর গুরুত্ব, উচ্চতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি যে সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, তা হল, লিপিকা যাকে খারাপ বলছে, সে ভালো না হয়ে পারে না, এবং আমি

যাকে ভালো বলছি, সে খারাপ হতে পারে না। আত্মাভিমানের চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে বালিকা বয়সে যে রোমান্স শুরু হয়েছিল, লিপিকার মৃত্যুতে তা নব্বই ডিগ্রি বাঁক নিল। লিপিকা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় আমার মনে যে শূন্যতা তৈরী হয়েছিল, তা মায়ের চোখ এড়ায়নি। সেই দুর্দিনেও আমার ভালমন্দে মায়ের নজর ছিল। রাতে আমাকে পাশে নিয়ে শুতে শুরু করেছিল। বাবাকে পাচার করা হয়েছিল পাশের ঘরে, আমার বিছানায়। তড়িঘড়ি আমার বিয়ে দিতে মা ব্যস্ত হয়েছিল। একটার পর একটা ছেলে এসে আমাকে দেখে যেতে লাগল। তারা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, বিজনেস ম্যাজেমেন্ট করেছে কেউ। পাত্র হিসাবে সবাই হিরের টুকরো হলেও আমি বিবক্ত হচ্ছিলাম। দর্শনার্থী কারও নেকনজরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সিঁটিয়ে থাকতাম। অমিতাভকে সব বলছিলাম। আমার আশঙ্কার কথা শুনে অভয় দিয়েছিল অমিতাভ। ব্যবসায় তখন তাব মন্দা চলছে। চিংড়িমাছের বড় কয়েকটা চালান ঠিক সময়ে জাপানে না পৌঁছনোয় ষাট, সত্তর হাজার টাকা ডুবে গেছে। গলা পর্যন্ত ঋণ। এম এল কেজরিওয়াল নামে, অল্পবয়সী, ধুবন্ধর এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর সহকারী হয়ে হংকং, সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করার চিন্তা শুরু করেছে। বছরে ছ'মাস সেখানে থাকতে হবে। কেজরিওয়াল তাকে ভীষণরকম চাইছে। বি টেক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। লেখাপড়ার সঙ্গে তিনবছর সম্পর্ক নেই। অমিতাভর জন্যে আমার কষ্ট হতো। তার দুর্গতির জন্যে দায়ী মনে হতো নিজেকে। সাধ্যমত তার পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করতাম। সিনেমা দেখতে গেলে, পাঁচ, ছমাস ধরে দুটো টিকিটের দাম আমি দিতে শুরু করেছিলাম, রেস্টুরেন্টে পাওনা মেটাতাম, অমিতাভর পকেটে প্রায়ই দু-একশো টাকা গুঁজে দিয়ে তৃপ্তিতে ফুলে উঠতাম। অমিতাভর জন্মদিনে তাকে একটা সোনার আংটি উপহার দিয়েছিলাম। আংটিটা বাবার। বছর দুই আগে আমাকে পরতে দিয়েছিল। ডান হাতের অনামিকায় সেটা চমৎকার মানিয়েছিল। ছ'মাসের বেশি ব্যবহার করিনি। আলমারিতে রেখে দিয়েছিলাম। আংটির কথা বাবা ভুলে গিয়েছিল। আংটিটা অমিতাভর চেনা। আমার আঙুলে দেখেছে। তবু ভেলভেট বসানো নতুন লাল বাক্স থেকে সদ্য পালিশ করা ঝকঝকে সোনার আংটি বার করে তার আঙুলে পরিয়ে দিতে সে চিনতে পারেনি। আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। ব্যবহার করা, পুরনো আংটি প্রেমিককে, তার জন্মদিনে দেওয়া যায় না। তখনও জানতাম না, সোনা পুরনো হয় না। আংটি পেয়ে খুশিতে আপ্লুত অমিতাভ জিজ্ঞেস করেছিল, এটা কি 'ওয়েডিং রিং?'

আমি বলেছিলাম, জন্মদিনের উপহার।

বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে আংটিটা পরে অমিতাভ বলেছিল, আমি কিন্তু এটাকে ফুলশয্যার রাতে পাওয়া "ওয়েডিং রিং" হিসাবে নিলাম। এরপর ফুলশয্যা ছাড়া কিছু করা যায় না।

ফুলহীন, শয্যাহীন, পর্দা ঢাকা নিভৃত কেবিনে আমাকে প্রায় ফুলশয্যার নববধূর মতো, (সামান্য কম) আদর করেছিল অমিতাভ। সন্ধের আগে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম।

বাড়ির খুঁটিনাটি সব খবর আমি বলতাম অমিতাভকে। নিজের বাড়ির কথা অমিতাভও বলত। বাবা মা ছাড়া তার বাড়িতে ছিল দুই দাদা, দুই দিদি। সে সবার ছোট। দাদা, দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। অঢেল টাকা। গলা নামিয়ে অমিতাভ বলেছিল, মাইনের দশগুণ ছিল বাবার উপরি ইনকাম।

ঘুষখোর বাবার কথা এত অক্লেশে বলা যায়, আমি জানতাম না। অবাক হলেও অমিতাভর সরলতায় খুশি হয়েছিলাম। তার কাছে আমারও কিছু গোপন করার নেই, এমন ধারণা হয়েছিল।

লিপিকার মুক্তির বিনিময়ে টর্পেডোকে বাবা ত্রিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, এ খবরও শুনিয়েছিলাম। খবরটা শুনে চকচক করে উঠেছিল অমিতাভর চোখ। আমার দেখায় ভুলও হতে পারে। অমিতাভ চুপ করে শুনত আমার কথা। টর্পেডো সম্পর্কে একটাও মন্তব্য করত না। আমি মনে করতাম, টর্পেডোকে সে চেনে না। লিপিকার মৃত্যুসংবাদ শুনে টর্পেডো প্রসঙ্গে সে কথা না বলার পরেও আমার মনে প্রশ্ন জাগেনি। অমিতাভর হাবভাব খেয়াল করার অবস্থা তখন আমার ছিল না। তার পাশে বসে আমি শুধু কেঁদেছিলাম। লিপিকার অনুপস্থিতির শূন্যতা অমিতাভ ধীরে ধীরে ভরে দিচ্ছিল। দুই দাদার মোটা মাইনের চাকরি, দিদিদের শ্বশুরবাড়ির বিলাসবৈভব, বড় জামাইবাবুর নতুন মারুতি, আমেরিকা থেকে ছোট জামাইবাবুর আনা পঁচিশরকম পারফিউম, এইসব ছিল অমিতাভর গল্পের বিষয়। মহকুমার মেয়েদের মধ্যে প্রথম হওয়া এক তরুণীমনের শূন্যতা ভরানোর বিষয়, এগুলো নয়। তবু ভরে যেত। তার কণ্ঠস্বর শুনে আবেগে উপচে পড়ত মন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে একদিন ছাড়া তাকে না দেখলে মেজাজ খিঁচড়ে যেত। অকারণে জল আসত চোখে। পড়ার বই সামনে নিয়ে বোকার মতো তাকিয়ে থাকতাম। একবর্ণ মাথায় ঢুকত না। মাথার ঘিলু শুকিয়ে ইট হয়ে গিয়েছিল। অমিতাভর মতো আমিও এলোমেলো বকতে শুরু করেছিলাম। আমার বিয়ে বাবদ ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা আছে, নতুন কী কী গয়না কেনা হয়েছে, দুটো নেকলেসে ক'ভরি সোনা আছে, অমিতাভর জানা হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রত্যেকটা কথা সে গিলত। আমার বিবরণে ছিটেফোঁটা মিথ্যে ছিল না। লিপিকাকে অবহেলা করার মাশুল দিতে আমার বিয়ের যে এলাহি আয়োজনে মা নেমেছিল, আমি বরং তা কমিয়ে বলতাম। বাবা চুপচাপ হয়ে গেলেও মায়ের পরামর্শ মতো আমার বিয়ের আয়োজনে উজাড় করে দিয়েছিল সর্বস্ব। লিপিকার কথা ভেবে মায়ের চেয়ে বাবা বেশি অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিতে বাবার যেমন আপত্তি ছিল না, তেমনই আমাকে ছেড়ে থাকার কথা চিন্তা করতে পারছিল না। একই সঙ্গে উদাসীন আর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। বাবার বুকের ভেতরটা অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতরে ভেসে বেড়ানো রঙিন মাছের মতো দেখতে পেতাম। বাবার খণ্ড-বিখণ্ড, বিচূর্ণ ভাবনাগুলো ছিল এরকম। লিপিকা আমার মেয়ে। চোর-চামার যাকেই বিয়ে করুক, সন্তান তো কখনও প্রাক্তন সন্তান হয় না। মা, বাবাও তাই। প্রাক্তন মা, বাবা হয় না। টর্পেডোকে বিয়ে করার পরেও লিপিকা, আমার মেয়ে ছিল। আমরা তাকে ত্যাগ করলেও সে আমাদের মেয়ে থাকতে চেয়েছিল। আমরা থাকতে দিইনি। পর করে দিয়েছিলাম। অসহায়, একা করে দিয়েছিলাম। পিতৃকুল বিচ্ছিন্ন মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে সম্মান পায় না। তার সম্পর্কে 'দূর ছাই' মনোভাব তৈরি হয়। পদে পদে তাকে খোঁটা সহ্য করতে হয়। শ্বশুরবাড়িতে অসম্মানের অতল অন্ধকারে লিপিকাও পড়েছিল। বাঁচার ইচ্ছে শেষ হয়ে গিয়েছিল। মা, বাবা পাশে থাকলে তাকে এভাবে মরতে হতো না। মরার আগে মনে করত, সে নিরাশ্রয় নয়। মা, বাবা আছে। তাদের বাড়ির দরজা কখনও বন্ধ হবে না। সেরকম ঘটেনি। ঘটার উপায় ছিল না। লিপিকা জেনে গিয়েছিল, সে সহায়সম্বলহীন, অবাঞ্ছিত, একা। লাথিঝাঁটা খেয়ে মুখ বুজে তাকে শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকতে হবে। সে তাই করেছিল। পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠতে আত্মবিনাশের পথ নিয়েছিল। আমরাই সে পথে তাকে ঠেলে দিয়েছি।

বাবার মনোবেদনা বুঝতে পারার জন্যেই বোধহয় মাঝে মাঝে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত। বাড়ি ছেড়ে আমি চলে গেলে মা, বাবার অবস্থা কী হতে পারে, কল্পনা করতে চেষ্টা করতাম। না, লিপিকার মতো বাড়ি ছেড়ে আমি পালাব না। ছোটবেলা থেকে আমি ডাকাবুকো

মেয়ে। স্বভাবে লুকোছাপা নেই। যা করার সবাইকে জানিয়ে করি। অপ্রিয় সত্য সামনাসামনি বলি। মা, বাবাকে জানিয়ে অমিতাভকে বিয়ে করব।

সুপাত্র, যারা আমাকে দেখতে আসছিল, কোনওভাবে লিপিকার ঘটনা জানতে পেরে কেটে পড়লেও দুটো পরিবার দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার যোগাযোগ করে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে আগ্রহ দেখাল। সোদপুরবাসী বিধবা মায়ের একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটিকে বাবার পছন্দ হয়েছিল। ছেলের বয়স আটাশ। বিবাহিতা এক দিদি আছে। দিদি স্কুলে পড়ায়। জামাইবাবু ডাক্তার। টেক্সম্যাকো কারখানায় পাত্র যে পদে চাকরি করে, তা সাপলুডোর মই-এর মতো মসৃণ। সেখানে সাপ নেই, শুধু মই, আর ক্রমাগত ওপরে ওঠা। পাত্র লোভনীয়, সন্দেহ নেই। ভালো মাইনে পায়। সোদপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকে। বিয়ের পরে অফিসফ্ল্যাটে চলে যাবার কথা ভাবছে। সম্ভাব্য কন্যাবিরহে কাতর বাবার একটা হিসেব ছিল। নিজের কাছে মেয়েজামাইকে রাখতে চাইছিল। ছেলের মা-ও সেখানে থাকতে পারবে। মেয়ে কাছছাড়া হবে না এবং জামাইও নিজেকে যাতে ঘরজামাই না ভাবে, এমন একটা পথ খুঁজছিল। আমার বিয়ের কথাবার্তা শুরুর আগে থেকে মধ্যমগ্রামে আমাদের বাড়ির দোতলার ছাতে, দক্ষিণ দিকে, দু'কামরা ফ্ল্যাটের নকশা, পঞ্চায়েতের অনুমোদন পেয়েছিল। ফ্ল্যাটটা তাড়াতাড়ি তুলে ফেলতে চেয়েছিল বাবা। কাজও শুরু হয়েছিল। ফ্ল্যাটে জামাই আর তার মা ন্যায্য ভাড়ায় আসতে রাজি হয়েছিল। ভাড়া নেবার শর্ত না মেনে বাবার উপায় ছিল না। বিয়ে সংক্রান্ত কথা দ্রুত এগোচ্ছিল। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি উঠছিল ফ্ল্যাট। আলাদা সিঁড়ি তৈরি হচ্ছিল। ছেলের মামা, মামি একদিন দেখে গেল আমাকে। আমার সৌন্দর্য আর গুণপনার ভুরি ভুরি প্রশংসা করল। ছেলের মা এল এক বিকেলে। স্নেহপরায়ণ, নরম মনের ভদ্রমহিলা। আমার মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে হবু শাশুড়ি যখন আদর করছিল, তাকে নিজের মা ছাড়া আর কিছু ভাবার উপায় ছিল না। সবাইকে প্রতারণা করছি ভেবে কষ্ট হচ্ছিল। জল আসছিল চোখে। অমিতাভর মুখ মনে করে শক্ত করেছিলাম নিজেকে। সেই বিকেলে ঠিক করেছিলাম, আর দেরি নয়। অমিতাভর কথা চটপট মা, বাবাকে জানানো উচিত। আশীর্বাদের দিন ঠিক হবার আগে অমিতাভর বাড়িতে বাবাকে পাঠাতে হবে। সোদপুরের ছেলের সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেলে মা, বাবা মুশকিলে পড়বে। ঘটনা যে গতিতে এগোচ্ছে, পরে সামাল দেওয়া যাবে না। দু'পক্ষের কথাতে মনে হয়েছে, সাতদিন পরে আশীর্বাদ হবে। দেড় মাস পরে শ্রাবণ মাসের সতেরো তারিখে বিয়ের দিন আছে। সম্ভবত বিয়ের জন্যে সেই দিনটা নির্ধারিত হবে। সবার আগে অমিতাভর সঙ্গে একদফা কথা বলে নেওয়া দরকার।

কলেজে আমার এক বন্ধু ছিল রুমকি। তারও প্রেমিক ছিল। প্রেমিককে সে বলত 'বর'। কারণ হিসেবে জানাত, আনুষ্ঠানিক বিয়ে না হলেও দাম্পত্য রহস্য তার জানা হয়ে গেছে। কলেজে প্রথমদিকে তার সঙ্গে কথা বলতাম না। ছ'মাসের মধ্যে সে প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠেছিল। রুমকি জানত, অমিতাভর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। সম্পর্ক কীভাবে বেঁধে ফেলতে হয়, সে বিষয়ে পরামর্শ দিত। কিছু কিছু পরামর্শ শুনে আমি শিউরে উঠতাম। বিয়ের আগে প্রেমিকের সঙ্গে রাত কাটাবার চিন্তা, আমি করতে পারতাম না। সে সাহস ছিল না। সুযোগ ছিল না। রুচিতে আটকাতো। রুমকি বলত, তুই ব্যাকডেটেড। বুড়ি ঠাকুমার চেয়ে প্রাচীনপন্থী। নানা প্রশ্ন করে অমিতাভর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটা এগিয়েছে, রুমকি জেনে নিত। আমি বলতাম। তারপর অবস্থা এমন দাঁড়াল যে অমিতাভর সঙ্গে দেখা করার পরে খুঁটিনাটিসমেত ঘটনা রুমকিকে না

বলা পর্যন্ত হাঁসফাঁস করতাম। মেয়েদের এই হলো মুশকিল। সবচেয়ে গোপন কথাটা বলার জন্যে পাশে একজন বন্ধু চায়। সে প্রকৃত সুহৃদ কিনা, বাছবিচার করে না। সে ডোবাবে না ভাসাবে, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাস্তব আর কল্পনা মেশানো প্রেমের বিবরণ তাকে অনর্গল বলে যেতে চায়। বলে আনন্দ পায়, হালকা করে নিজেকে গোপনীয়তা বজায় রাখতে অন্ধের মতো তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে, এবং ভরাডুবি হয়। মেয়েদের সবচেয়ে বেশি বিপথগামী করে মেয়েরা। আগুনে হাত পোড়ানো মেয়ে দগ্ধ সঙ্গিনী খোঁজে। অদগ্ধ বন্ধু ধরে, বেগুনের মতো পুড়িয়ে সঙ্গিনী করে নেয়। বারো বছর ধরে এসব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ঝলসে গেছি। আমিও পরে দগ্ধ সঙ্গিনী খুঁজেছি। অদগ্ধ সঙ্গিনীকে দগ্ধ করার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। রুমকির সঙ্গে মেলামেশার সময়ে এত জানতাম না। সরল, নিরীহ ছিলাম।

বলা যায়, বোকা ছিলাম। সোদপুরবাসিনী হবু শাশুড়ি আসার দু'দিন পরে অমিতাভর সঙ্গে দেখা হতে রুমকির উপদেশ মতো বিয়ের কথা পাড়লাম। অমিতাভকে বললাম, মা, বাবা তোমাদের বাড়ি যাবে। বাড়ির ঠিকানা, কীভাবে যেতে হয়, বলে দাও। তুমি কিন্তু বাড়ি থাকবে।

কথাটা শুনে অমিতাভর কেঁপে ওঠার কথা নয়, তবু আমার মনে হল, সে চমকে গেছে। চমকে ওঠার কারণ জানার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। আমি শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।। তার কাছ থেকে দু-একটা আশ্বাসের কথা শুনতে চাইছিলাম। আশীর্বাদের তারিখ ঠিক হয়ে গেলে বিয়ে পর্যন্ত আমার কলেজ যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আভাসে, ইঙ্গিতে কথাটা মা জানিয়েছিল। সেরকম ঘটলে অমিতাভর সঙ্গে দেখা হবে না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ভয়ঙ্কর সেই পরিস্থিতির কথা ভেবে আমার মাথায় বাজ পড়েছিল। রোজ কলেজে গেলেও ক্লাস করা আগেই শিকেয় উঠেছিল। সপ্তায় দু'দিনের বেশি ক্লাস করতাম না। বাকি চারদিন অমিতাভর সঙ্গে কাটাতাম। রুমকিও তাই করত। কলকাতা ছাড়া আশেপাশে, নিরিবিলিতে প্রেম করার, নানা জায়গার হদিশ রুমকি দিয়েছিল আমাকে। দরজা বন্ধ বেডরুমের চেয়ে সে সব জায়গার প্রিভেসি বেশি। কিছু জায়গা অমিতাভর অজানা ছিল না। হপ্তায় দু'দিন কলকাতায় গেলে, ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে যেতাম একদিন, একদিন যেতাম কল্যাণী উপনগরীর নির্জন পার্কে, টাকি, হাসনাবাদেও প্রেম করার জায়গা খুঁজে বার করেছিলাম। কলকাতার মতো মফস্বল শহরগুলিতে সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট আছে। রেস্টুরেন্টে কেবিন আছে। কেবিনের মুখে পর্দা, এবং কাঠের পার্টিশনে ফুটো আছে। তাছাড়া চুটিয়ে প্রেম করার মতো জনমানবহীন এমন কিছু জায়গা আছে, যা কলকাতায় নেই। অমিতাভর হাত ধরে সেইসব নন্দনকাননে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ব্যবসায় মন্দার দরুণ অমিতাভর পকেটে বিশেষ পয়সাকড়ি থাকত না। টাকা জোগাতাম আমি। বাড়ি থেকে মাসে হাতখরচ যা পেতাম, তার সঙ্গে কিছু উটকো টাকাকড়ি আসত। বাবার কাছ থেকে বই, খাতা, কলম কিনতে পঞ্চাশ, একশো টাকা নিয়ে, উদ্বৃত্ত থাকলে ফেরত দিতে হতো না। বাবা চাইত না। মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে হেয়ারপিন, ক্রিম, নেলপালিশ কিনে অনেক সময় কিছু টাকাপয়সা বেঁচে যেত। মা জিজ্ঞেস করত, কত ফিরল? ব্যস, ওই পর্যন্ত। উদ্বৃত্ত দু-পাঁচ, দশটাকা মা নিত না। বলত, রেখে দাও।

টাকাকড়ির হিসেব মা, বাবা সেভাবে রাখত না। বাবার কাছে পাঁচ, দশ টাকা চাইলে পার্স বা ড্রয়ার থেকে বার করে নিতে বলত। পাঁচের বদলে কুড়ি নিলে বাবা জানতে পারত না। পারলেও কিছু জিজ্ঞেস করত না। একবারও নিইনি। নিলে, বলে দিতাম। মায়ের কাছে টাকা

াইলে আলমারি খুলে বার করে নেবার জন্যে চাবির গোছা হাতে ধরিয়ে দিত। লকারের চাবিও সেখানে থাকত। লকারে সোনাদানার সঙ্গে জরুরি দরকারের জন্যে এক, দুহাজার টাকা মা রেখে দিত। খুচরো পঞ্চাশ, একশো টাকা আলমারির ভেতরে মায়ের শাড়ির তলায় থাকত। লিপিকা, আমি, দরকার মতো মাকে জানিয়ে সেখান থেকে টাকা নিতাম। বাবা ছিল স্বচ্ছল ব্যবসায়ী। ংসারে অর্থাভাব ছিল না। মঝে মাঝে লিপিকা আর আমার কাছ থেকে বাবা টাকা ধার চাইত। পঞ্চাশ, একশো, যার কাছে যা থাকত, বাবাকে দেবার জন্যে দুই বোনে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতাম। আমরা জানতাম দশদিনের মধ্যে দ্বিগুণ ফেরত পাব। সেটাই রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। হাতসাফাই, টাকা সরানোর কথা আমরা চিন্তা করতে পারতাম না। এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময়েও লিপিকা একটা টাকা সরায়নি। ব্যবসাতে অমিতাভ মার খাবার পরে বাবার ব্যাগ থেকে, মায়ের আলমারি খুলে প্রায়ই আমি দু-একশো টাকা সরাতে শুরু করলাম। বাবা টের পেত না। টের পেলে ভাবত, মা নিয়েছে। মা বুঝতে পেরেছিল। আমাকে শুনিয়ে কখনও কখনও বলত, একশো টাকা যে কোথায় রাখলাম!

আমি মুখ টিপে থাকতাম। মুখে না বললেও মায়েব মনে সন্দেহ জেগেছিল। চাবির গোছা সহজে আঁচলছাড়া করত না। লিপিকার মৃত্যুতে মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে যাবার পরে বাকি চুল পাকতে শুরু করে দিল। টাকা হারানোর চেয়ে টাকাটা কোথায় গেল, এ নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়ছে, টের পেতাম। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থী মেয়ের এক দুশো টাকা কেন দরকার পড়ছে, মা হদিস করতে পারত না। টাকা চাইলে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে মা, বাবাকে না জানিয়ে মেয়ে কেন টাকা নেয়, মাযের মনে এ প্রশ্ন হয়তো জেগেছিল। মায়ের উদ্বেগ বুঝতে পারতাম। অমিতাভর খবর মায়ের কাছে তাড়াতাড়ি ভাঙতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। সেই দুপুরে ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় অমিতাভর পাশে বসেছিলাম। বিশাল গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে, অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। নির্জন, ছায়াময় গাছতলা। গঙ্গায় ভাটা চলেছে। তীরের অনেকটা জুড়ে চড়া পড়েছে। আষাঢ়ের একটুকরো মেঘ পুব থেকে পশ্চিম আকাশে ভেসে যাচ্ছে। মেঘ জমছে পশ্চিমে। বিকেলে বৃষ্টি হতে পারে। হাওয়া নেই। অমিতাভর জন্যে এক প্যাকেট ইন্ডিয়া কিং সিগারেট কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার কথা শুনে অমিতাভর সিগারেট ফোঁকা বেড়ে গিয়েছিল। ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল তার মুখ। ধোঁয়া সরে গিয়ে মুখ অস্পষ্ট ভেসে উঠলে আবার একতাল ধোঁয়া এসে আড়াল করছিল। কুড়িটা কিং সাইজ সিগারেটের পাঁচটা খাওয়া হয়ে গেছে। ছ'নম্বর সিগারেট ধরিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের বাড়িতে কবে যেতে চান তোমার মা বাবা? তুমি বললে কাল, পরশু পাঠাতে পারি।

অমিতাভ বলল, তিনদিন হলো মাকে নিয়ে বাবা কাশী গেছে। কাশীতে সাতদিন থেকে বৃন্দাবন, মথুরা যাবে। বাড়ি ফিরতে একমাস।

মুখে আফসোসের শব্দ করে অমিতাভ বলল, সাতদিন আগেও যদি বলতে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল হাত-পা। কোনওমতে বলেছিলাম, তাহলে?

শুরুতে চমকে গেলেও অমিতাভ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। শান্ত, সপ্রতিভ হাবভাব। বলেছিল, উপায় একটা হবে।

ব্যাকুল চোখে আমি তাকিয়েছিলাম অমিতাভর দিকে। তার মুখ থেকে উপায়টা শুনতে

চাইছিলাম। ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে অমিতাভর মুখ। আমার চোখ জ্বালা করছিল। ষষ্ঠ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অমিতাভ বলল, কাশীর হোটেলের টেলিফোন নাম্বার তোমার বাবাকে দিতে পারি। আমার বাবার সঙ্গে ফোনে তিনি কথা বলতে পারেন।

প্রকাশ্য গাছতলায় সেই প্রথম অমিতাভকে চুমু খেলাম।

বললাম, নাম্বারটা দাও। লিখে রাখি।

নাম্বার কাছে নেই।

বাড়িতে তো আছে?

বাড়িতেও নেই। 'তীর্থযাত্রা স্পেশাল' পর্যটক সংস্থার অফিস থেকে জোগাড় করতে হবে।

সামান্য যা আশা জেগেছিল, দপ করে নিভে গেল। আমার লম্বা বেণীর ডগা নিয়ে নিজের মুখে তুলির মতো বোলাতে বোলাতে অমিতাভ বলল, তীর্থযাত্রী স্পেশাল থেকে ফোন নাম্বার নেবার আগে জানা দরকার, মা বাবা এখনও কাশীতে আছে, না বৃন্দাবন রওনা হয়ে গেছে।

আমি বললাম, তোমার দাদা, বৌদিদের সঙ্গে বাবা কথা বলতে পারে।

তা পারে।

কবে বাবাকে পাঠাব?

ভাবছি।

ডুবন্ত মানুষের মতো কুটো আঁকড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। বললাম, আর একটা কাজ করা যায়।

কী?

আমাদের বাড়িতে তুমি আসতে পার।

তারপর?

মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তোমার। তোমার মা-বাবা ফিরলে বিয়ের কথা শুরু হবে।

এক মুহূর্ত থেমে বললাম, মায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল। তোমাকে মা অপছন্দ করেনি। বাবাও অপছন্দ করবে না। অমিতাভ রাজি হয়ে গেল। নতুন সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমার অসুবিধে নেই।

অমিতাভর ডান হাতের কড়ে আঙুলে ঝকঝকে সোনার আংটিতে চোখ পড়তে আমি থতমত খেলাম। এটা বাবার আংটি। অমিতাভকে দিয়েছিলাম। আংটিটা বাবা কি চিনতে পারবে? মা চিনলেও বাবা খেয়াল করবে না। মা-বাবা, দুজনে চিনলেও কিছু যায় আসে না। যাকে বিয়ে করব, সেই প্রিয় পুরুষকে আংটি উপহার দেওয়ায় অপরাধ নেই। দিতেই পারি। অমিতাভকে প্রথম দর্শনে বাবার পছন্দ হয়ে গেলে আংটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাল কখন আসবে?

বিকেলে।

বাবাকে থাকতে বলব।

বেণী ছেড়ে দিয়ে আমার হাতে হাত রেখে অমিতাভ বলেছিল, নতুন একটা চিন্তা মাথায় এল।

কী?

তোমাদের বাড়িতে যাবার আগে বড়দার সঙ্গে একদফা কথা বলে নিলে কেমন হয়?

প্রশ্নের জবাব অমিতাভ নিজে দিল। বলল, আমার ধারণা, সেটাই সবচেয়ে ভাল। দাদা রাজি থাকলে, কাল, পরশু আমাদের বাড়িতে তোমার বাবা আসতে পারেন। দিনটা তোমাকে জানিয়ে দেব।

কালই জানাবে?

না, পরশু। একটা দিন হাতে রাখা ভাল।

সময় যে বড় কম অমিতাভ।

দূর পাগলি। আমি তো আছি। দাদা না রাজি হলে আমি যাব তোমাদের বাড়ি। দিনক্ষণ এখনই বাড়িতে জানাবার দরকার নেই। অমিতাভ কত নম্বর ইন্ডিয়া কিং ধরাল, হিসেব রাখা সম্ভব ছিল না। ধোঁয়ার নিটোল রিং ছাড়ছিল সে। প্রতিটা বৃত্ত বড় হতে হতে বাতাসে মিশে যেতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল অমিতাভর মুখ। আমার চোখে জ্বালা কমে এসেছিল। অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, দাদাকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে যদি আমি যাই, কেমন হয়?

অমিতাভর প্রস্তাবে খুশিতে হাততালি দিয়ে বলেছিলাম, দারুণ হয়!

কবে যাবে?

পরশু না হলে, তার পরের দিন।

সিগারেটে পর পর দুটো টান দিয়ে অমিতাভ বলল, যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব?

কবে, কোথায়?

অমিতাভ একটু ভেবে বলল, পরশু দুপুর একটায়, প্রাচী সিনেমার সামনে।

আমি হিসেব করছিলাম, পরশু বুধবার। এই সপ্তাহে যদি আশীর্বাদের দিন ঠিক হয়ে যায়, হাতে সময় থাকবে না। আশীর্বাদের পক্ষে শুক্রবার শুভদিন। পাত্রপক্ষ হয়তো শুক্রবারে অনুষ্ঠান সেরে ফেলতে চাইবে। মাতৃসমা সেই মহিলার কথা শুনে আমার সেরকম ধারণা হয়েছিল। তাড়াহুড়োতে বাবার আপত্তি থাকলেও মা অরাজি নয়। মা রাজি থাকলে বাবা মেনে নেবে। তাহলে? রুমকির কথা মনে পড়েছিল। সে বলেছিল, ভালবাসার জন্যে সব কিছু ছাড়া যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্যে ভালবাসা ছাড়া যায় না। কোনও কিছুর মধ্যে পরিবার, মা, বাবা পড়ে।

রুমকির কথাতে মনে পড়েছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন, "ভালবাসা পেলে আমি সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে চলে যেতে পারি।" স্মৃতি থেকে পংক্তিটা কি নির্ভুল উদ্ধৃত করতে পারলাম? জানি না। রুমকিকে মনে পড়তে কিছুটা চাঙ্গা হয়েছিলাম। বেগতিক বুঝলে রুমকির পরামর্শ নেব। রুমকি কী বলবে, আমি জানতাম। কথাগুলো আগেই সে বলেছিল। আশীর্বাদের পরে বিয়ে ভেঙে যাবার ঘটনা কম নেই। সেটা ভাল নয়। তবে নিরুপায় হলে কিছু করার থাকে না। প্রেমিকের হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়।

রুমকি যাই বলুক আমি ঠিক করেছিলাম, সেরকম কিছু করব না। মা-বাবাকে দাগা দেব না। লিপিকার ঘটনাতে মা-বাবার সম্মান যথেষ্ট নষ্ট হয়েছে, আর নয়। তাদের অসম্মান আমি বাড়াব না। রিং-এর বদলে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে অমিতাভ বলল, তাহলে ওই কথা রইল। মা-বাবাকে পরশু সন্ধ্যের পরে আমার কথা বলো। দেখা করার দিন পরশু ঠিক করে নেব। তার আগে মুখ খুলো না।

অমিতাভর হুকুম না মেনে আমার উপায় ছিল না। আমি তখন তার বাঁদি হয়ে গিয়েছিলাম। মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে লিপিকাকে মনে পড়েছিল। দু'বছর আগে আমার পিঠে হাত

রেখে লিপিকা বলেছিল, সাবধানে থাকিস।

লিপিকার সেই শেষ পরামর্শ। লিপিকার সঙ্গে শেষ দেখা। সাবধানে থাকার নিয়মকানুন আমাকে না শিখিয়ে পৃথিবী ছেড়ে লিপিকা চলে গিয়েছিল। শেষ বিকেলে ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট থেকে কলেজের বইখাতা নিয়ে শুকনো মুখে বাড়ি ফিরেছিলাম। মা জিজ্ঞেস করেছিল, শরীব খারাপ?

আমি বলেছিলাম, না।

বাবা বাড়ি ছিল না। সদ্য তৈরি গরম হিং-এর কচুরি, আলুর দম প্লেটে সাজিয়ে আমাব সামনে রেখে মা বলেছিল, শুক্রবার আশীর্বাদ। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে সতেরোই শ্রাবণ। তোব শাশুড়ি এসেছিলেন। তিনি এমনভাবে বললেন যে, 'না' করতে পারলাম না। কাল থেকে তোকে কলেজে যেতে হবে না। বিয়ে পর্যন্ত সুস্থ থাকতে হবে। রোদে পোড়া মুখ একটু চকচকে হলে নতুন বেনারসিতে তোকে কী সুন্দর যে দেখাবে! জামাই অবশ্য রূপে নয়, তোর গুণে মুগ্ধ। সে-ও দেরি করতে চায় না।

একটুকরো কচুরি মুখে পুরে আমি ক্রমাগত চিবিয়ে যাচ্ছিলাম। গলা দিয়ে সেটা নামছিল না। মা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল আমাকে। হঠাৎ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, বিয়েতে কি তোব সায় নেই?

প্রশ্ন শুনে কচুরির দলা গলায় আটকে যাবার উপক্রম হলো। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে মা দেখছিল আমাকে। জন্মনাড়ি পর্যন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছিল মায়ের চোখ। গলা আরও নামিয়ে মা প্রশ্ন করল, তুই কি কাউকে পছন্দ করে রেখেছিস?

অনায়াসে আমি 'হ্যাঁ' বলতে পারতাম। বলা উচিত ছিল। পরশু পর্যন্ত খবরটা চেপে রাখাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম অমিতাভকে। মাকে হ্যাঁ, না কিছু বলতে পারলাম না। জল এসে গিয়েছিল আমার চোখে। মেয়েকে কাঁদতে দেখে মা ভাবল, বাড়ি ছেড়ে যাবার কথা ভেবে মেয়ের চোখের জল উপচে পড়ছে। বিয়ের আগে বেশিরভাগ মেয়ের এরকম হয়। মা শুতে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাকে।

পরের দিন কলেজে না গেলেও বুধবার বেরোতে হলো। প্রাচী সিনেমার নিচে অমিতাভ অপেক্ষা করছিল। উস্কোখুস্কো চুল, লালচে চোখ, মুখে দুদিনের বিজবিজে দাড়ি, অসুস্থ লাগছিল তাকে।

অবাক হয়ে আমি তাকিয়েছিলাম। অমিতাভ বলল, দাদা-বৌদিদের সঙ্গে কাল তুমুল কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে তারা বার করে দিতে চায় আমাকে।

কেন?

বিয়েতে তাদের মত নেই।

আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। অমিতাভ বলল, অনেক কথা তোমাকে বলাব আছে। নিরিবিলিতে বসা দরকার।

রাস্তা পেরিয়ে অমিতাভ খালি ট্যাক্সি দাঁড় করাল। ট্যাক্সি স্টার্ট নেবার পরে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, টাকা আছে সঙ্গে?

হ্যাঁ।

কতো?

সাড়ে চারশো।

বাইপাস ধরে চিনে মহল্লার একটা রেস্টুরেন্টের সামনে অমিতাভ ট্যাক্সি দাঁড় করাল। কেবিন না থাকলেও ভরদুপুরে রেস্টুরেন্ট ফাঁকা। ভেতরে আলো কম। সামান্য স্যাঁতসেঁতে ভাব। কোণের একটা টেবিলে আমাদের মতো এক যুগল ছাড়া খদ্দের নেই। আমাকে নিয়ে অন্য কোণের টেবিলে অমিতাভ বসল। আমাদের পরে তৃতীয় জুটি ঢুকে নির্জন এক টেবিল বেছে নিল। তিন জোড়া যুবকযুবতী তিনটে টেবিল দখল করার পরেও ফাঁকাভাব আগের মতো থেকে গেল। অচেনা দুই যুগলের চেয়ে বেশি করে দেখছিলাম অমিতাভকে। তাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। বেয়ারাকে ডেকে হুইস্কি অর্ডার করে অমিতাভ বলল, কিছু মনে কোরো না, আমি ভীষণ ক্লান্ত। কাল রাত থেকে পেটে কিছু পড়েনি।

অমিতাভর কথায় আমি গলে গেলাম। আমার জন্যে বেচারা কষ্ট পাচ্ছে। অপমানের ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। কাল রাত থেকে এখনও কিছু খায়নি। আহা, কী কষ্ট! যা ভালো লাগে, ও খাক। দেড় ঘন্টায় তিন পেগ হুইস্কি, দু প্লেট চাউমিন-এক প্লেট চিলি চিকেন সাবাড় করে অমিতাভ কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হলো। মিথ্যে বলব না, চার চামচ চাউমিন, দু টুকরো চিলি চিকেন আমিও খেয়েছিলাম। অমিতাভ বলছিল, কাশীর হোটেলে কাল রাতে ফোন করে মা-বাবাকে সে পায়নি। কাল সকালে তারা বৃন্দাবন রওনা হয়েছে। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় মঠের যে ধর্মশালায় তারা উঠবে, সেখানে টেলিফোন নেই। সুতরাং মাসখানেক অপেক্ষা করতে হবে।

কথাটা শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। অমিতাভর বেশ নেশা হয়েছিল। আমাকে কাঁদতে দেখে থিতিয়ে গেল। জানতে চাইল, কী হয়েছে?

শুক্রবার আশীর্বাদ, সতেরোই শ্রাবণ বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে, আমি জানাতে কয়েক সেকেন্ড অমিতাভ গুম হয়ে থাকল। জিজ্ঞেস করল, কালই তোমাকে বিয়ে করতে চাই, রাজি?

অমিতাভর ডান হাতের পাতা আমি আঁকড়ে ধরলাম। অমিতাভ বলল, বিয়ের খবর আপাতত দু'বাড়িতে জানাবার দরকার নেই। কাল বিকেলে কালীঘাটে বিয়ে সেরে তোমাকে নিয়ে রাতের ট্রেনে রাঁচিতে পিসির বাড়ি চলে যাব। পিসি আমার মায়ের মতো। ভীষণ ভালবাসে আমাকে। মাসখানেক সেখানে থেকে বিয়ের খবর অভিভাবকদের জানাব। আমাদের হয়ে পিসি যোগাযোগ করবে।

অমিতাভর সব কথা আমার কানে ঢুকছিল না। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলাম। আমার হাতের ওপর হাত রেখে অমিতাভ বলেছিল, কাল সন্ধ্যের মধ্যে আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে যাব। তারপর একমাস রাঁচির জঙ্গল, পাহাড়, জলপ্রপাতের ধারে দুর্দান্ত হানিমুন করে বেড়াব। মাস কাবার হলে মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে সাজানো বিয়ের পিঁড়িতে দু'জনে বসে যাব।

অমিতাভর দুর্দশায় কিছুক্ষণ আগে কষ্ট হলেও সেই মুহূর্তে তার স্বপ্নে আমি মশগুল হয়েছিলাম। তার নির্দেশ অমান্য করার শক্তি আমার ছিল না। আশীর্বাদের আগের দিন, বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় রুমকির সঙ্গে দেখা করার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কলঘরে মা স্নানে ঢুকেছিল। ফাঁকা বাড়ি। সকাল ন'টায় বাবা বেরিয়ে গেছে। এই সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। চামড়ার ছোট সুটকেসে কয়েকটা শাড়ি, বিয়ের জন্যে কেনা পনেরো ভরি সোনার গয়না, মায়ের লকার থেকে দেড় হাজার টাকা নিয়ে, কলঘরের বন্ধ দরজার সামনে এসে বললাম, আমি বেরোচ্ছি।

জলের আওয়াজ হচ্ছিল কলঘরে। কল বন্ধ হলো। জলের শব্দ থামতে মা বললে, সদর

দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিস। আশীর্বাদে রুমকি যেন থাকে। তাড়াতাড়ি ফিরিস
ড্রইংরুমের ভেতর দিয়ে সদরের দিকে পা বাড়ালাম। ড্রইংরুমে কাবার্ডের ওপর স্টি ফ্রেমে বাঁধানো মা-বাবার কম বয়সের ছবি। ছবিতে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়ালাম। ঝকঝ করছে দু'জনের মুখ। কপালে রেখা নেই। মা-বাবার সঙ্গে, ছবির সূত্রে, সেই শেষ দেখা। তারপ রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে বেঁচে থেকেও আমি ছবি হয়ে আছি। আমি মালবিকা নই। মালবিক মারা গেছে। তার জায়গায় নূপুর সেনগুপ্ত পরিচয়ে যে হাজির হলো, সে ফ্রেমে আঁটা মালবিকা ছবি, মালবিকার মৃতদেহও বলা যায়।

আত্মকথন-৩

কনাদ লাহিড়ির সংস্পর্শে আমি যখন সুপ্রিয়া লাহিড়িতে রূপান্তরিত হলাম, তখন আমা বয়স ছাব্বিশ। ঘটনাটা একদিনে হয়নি। মালবিকাকে যত সহজে নূপুর সেনগুপ্ত বানানো সম্ভ ছিল, নূপুরকে সুপ্রিয়া বানানো তত সহজ ছিল না। পাঁচ বছর আমি নূপুর ছিলাম। পাঁচ বছরে অভিজ্ঞতায় পেকে ঝুনো হয়ে গিয়েছিলাম। যা দেখেছিলাম, বললে মহাভারত হয়ে যাবে। বে বলবে সেই কাহিনী? কে শুনবে সেই মহাভারত? বৈশম্পায়ন মুনিও নেই, মহারাজ জনমেজয়ও নেই। পড়ে আছে পরিবার পরিজনহীন অজ্ঞাতকুলশীল এক স্ত্রীলোক। সে কার কন্যা নয়, স্ত্রী নয়, মা নয়, এমনকি বারাঙ্গনাও নয়। সে কে? কী তার নাম? চলন্ত দার্জিলি মেলের চাকা থেকে প্রশ্নটা উঠে আসছে। কী তোমার নাম? কী তোমার নাম? প্রশ্নের উত্ত আমি জানি না। পরিচয়ের খোঁজে শিলিগুড়ি ছেড়ে কলকাতায় যাচ্ছি। কলকাতার দোকান বাজারে আত্মপরিচয় কিনতে পাওয়া যায় না, জানি। তবু যাচ্ছি। রাত কত হলো? উত্তর মেলে না। বাঙ্কে শুয়ে টের পাচ্ছি, মাঝরাত। অন্ধকার গভীর, গভীরতর হচ্ছে। মাঠ, প্রান্তর, নদী ছোট বড় সেতু পেরিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। ছেলেবেলায় রাতে, ট্রেনে ঘুম ভেঙে গেলে মনে হতো, ইঞ্জিনবিহীন, ড্রাইভারবিহীন কয়েকটা কামরা অদৃশ্য শক্তির টানে ছুটে চলেছে। একট কামরায় আমি আছি এবং ছুটে চলেছি। এ দৌড় থামানো আমার কর্ম নয়। ছেলেবেলায় যাবে অদৃশ্য শক্তি ভাবতাম, এখন মনে হয় তার নাম নিয়তি। নিয়তি কেন বধ্যতে। নিয়তিকে এড়ানো যায় না। মানুষকে সে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। দৌড় করাচ্ছে। পরিণামহীন এই দৌড়ে মানু কোথাও পৌঁছোয় না। ট্রেনের চাকা থেকে উঠে আসছে মাঠ, প্রান্তর অতিক্রম করার আওয়াজ চাকার ঘষটানিতে ঝমর ঝমর যে শব্দ অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলেছে, সেটা কি ফারাক্কা ব্রিজ হতে পারে। আমি পাশ ফিরলাম। আজ রাতে ঘুম আসবে না। বালিশে কান রেখে ব্রিজের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। রাতের গভীর থেকে উঠে আসা শব্দের ধাতব নিরবচ্ছিন্নতা উপভোগ করছি শব্দের হাঁ মুখের ভেতরে দাঁত, জিভ, টাগরা আর প্রগাঢ় অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। দাঁতের ফাঁকে জিভের ডগায়, টাগরার গা ঘেঁষে রয়েছে মালবিকা, নূপুর, সুপ্রিয়া, তাদের জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম সুপ্রিয়া পর্ব আপাতত শেষ হলো। কে আসবে এবার? কী তোমার নাম? জানি না।

নূপুর সেনগুপ্ত সেজে পাঁচ বছর থাকার পরে ছাব্বিশ বছর বয়সে সুপ্রিয়া লাহিড়ি হয়েছিলাম। পৃথিবী সম্পর্কে পাঁচ বছরে নূপুর সেনগুপ্তর যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার মূল কথাটা হলো, মানুষকে বিশ্বাস কোরো না। বরং অবিশ্বাস করো। মানুষকে অবিশ্বাস করার মতো

বিশ্বাস রপ্ত করতে না পারলে মারা পড়বে। পুরুষকে একদম বিশ্বাস কোরো না। তাদের মুখ থেকে ভাল ভাল কথা শুনে ভুলে যেও না। নিরানব্বই ভাগ পুরুষ হলো প্রতারক। যে যত বড় প্রেতারক, সে তত সুশ্রী, হ্যান্ডসাম, বচনবাগীশ। পাঁচ বছরে ষোলোআনা পুরুষবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলাম। পুরুষ ঘায়েল করার সবরকম কেরামতি শিখে গিয়েছিলাম। অনায়াসে তাদের চিৎপটাং করতে, চাকরের চাকর বানাতে অসুবিধে হতো না। আর শিখেছিলাম কিছু শব্দ, কিছু কথা। কাগজ কলমে সে সব কথা লেখা যায় না। প্রথম দিকে কথা গুলো শুনলে গা গোলাতো। ক্রমশ সেই 'হারগিস', 'জিন্দেগি', 'বেশরম', 'সরাবি', 'ছক্কাপাঞ্জা', 'দামড়ি' এরকম কত শব্দ, আর বাক্য যে আমার শব্দভাণ্ডারে ঢুকে পড়েছিল, জানতাম না। নূপুরের সংগ্রহ করা শব্দগুলো তাড়াতে সুপ্রিয়া লাহিড়িকে কম কসরৎ করতে হয়নি। গৃহবধূ হয়ে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়।

নূপুর সেনগুপ্ত পরিচয়ে মনমেজাজ ঝামাপাথরের মতো হয়ে গেলেও মালবিকার গৃহত্যাগের কথা ভাবলে আজও আমার চোখে জল আসে। চামড়ার ছোট সুটকেসে যথাসর্বস্ব নিয়ে দমদম মেট্রো স্টেশনে অমিতাভর কাছে দুপুর দুটোর আগে পৌঁছে গিয়েছিলাম। নববিবাহিত জীবনের স্বপ্ন , রাঁচিতে মধুচন্দ্রিমা করার প্রত্যাশায় টলটল করছিল দু'চোখ। কালীঘাট মন্দিরে সেই বিকেলে সিঁথিতে সিঁদুর লেপে মালবিকা দত্ত থেকে মালবিকা হাজরা হয়ে গেলাম। বাড়ি থেকে আনা নগদ দেড় হাজার টাকা থেকে একশো টাকা নিজের কাছে রেখে বকি চোদ্দশো টাকা তুলে দিয়েছিলাম অমিতাভর হাতে। মা-বাবা জেনে গেলে কী ঘটতে পারে ভেবে আমার বুক কাঁপছিল। বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। মনের ভেতর যে মন আছে, সেখানে কেউ চাইছিল, কলকাতা ছাড়ার আগে, মা-বাবা ঘটনা জেনে যাক। আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করুক।

অমিতাভ এসব নিয়ে ভাবছিল না। খিদে পেয়েছিল তার। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে মোগলাই পরোটা, কষা মাংস খেয়েছিল। আমি নিয়েছিলাম চকোলেট আইসক্রিম। চকোলেট খেতে ভালবাসতাম। আজও চকোলেট কিনে লুকিয়ে কুটকুট করে খাই। সেই বিকেলে চামচে আইসক্রিম তুলে প্রতিবার মুখে ঢোকানোর আগে মনে হচ্ছিল, মা-বাবা, এখনই রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকবে, আমাদের দুজনকে ডেকে বাড়িতে নিয়ে যাবে। রাত ন'টায় হাওড়া স্টেশন থেকে হাতিয়া এক্সপ্রেসে ওঠার মুহূর্তেও আশা ছাড়িনি। প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে মানুষ। সেই ভিড়ে দুটো চেনা মুখ দেখার জন্যে ঘুরে ঘুরে.তাকাচ্ছিলাম। মালা বলে কেউ ডেকে উঠবে, আশা করছিলাম। সেরকম কিছু ঘটল না। পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় রাঁচি স্টেশনে নেমে অমিতাভ বলেছিল, একটা বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমার ধারণা তোমাকে খুঁজতে তোমার বাবা পুলিশে খবর দেবে। তোমার হদিস পেতে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরনো অসম্ভব নয়। বিজ্ঞাপনে নিশ্চয় তোমার ছবি থাকবে। ভাগ্য ভাল, সংবাদপত্রে ছাপা ছবি দেখে মানুষ চেনা যায় না। তবু সাবধান হওয়া ভাল।

অমিতাভর দূরদর্শিতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাহলে কী হবে?

অমিতাভ হাজরার বউ মালবিকা হাজরা, এখন থেকে বলবে তার নাম নূপুর সেনগুপ্ত। বিয়ের পর হাজরা হয়েছে। হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছিল অমিতাভর কথা। তবু শুনছিলাম। অমিতাভ বলল, কেউ নাম জানতে চাইলে বলবে নূপুর সেনগুপ্ত। তারপর জিভ কেটে বলবে, স্যরি, হাজরা। মাত্র সাতদিন বিয়ে হয়েছে। পৈতৃক পদবি বদলে গেলেও বলার অভ্যেস সহজে যায়না। আমারও যায়নি। পিসিও জানে, তোমার নাম নূপুর সেনগুপ্ত।

রাঁচি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সেই সকালে নূপুর সেনগুপ্ত হয়ে গিয়েও মালবিকা দত্তকে আ
ভুলতে পারছিলাম না। মালবিকার একপাশে দাঁড়িয়েছিল তার মা, অন্যপাশে বাবা। মা-বাবা
সঙ্গে আমার এরকম একটা ছবি বাড়িতে অ্যালবামে আছে। রাঁচি স্টেশন ক্যান্টিনে চা খে
ঢুকে চেয়ারে বসে হাই তুলছিলাম। ট্রেনে গাদাগাদি ভিড়ে কোনওরকমে বসতে পারলে
শোবার জায়গা মেলেনি। ঘুম হয়নি সারারাত। শোবার জায়গা পেলে ঘুমোতে পারতাম কি
না সন্দেহ। প্রতি মুহূর্তে মা-বাবাকে মনে পড়ছিল। সন্ধের পরেও আমি বাড়ি না ফিরতে তার
নিশ্চয় ভয় পেয়ে গেছে। আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। আশীর্বাদের অনুষ্ঠানে বন্ধুদে
আসতে বলার জন্যে যে মেয়ে দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, সে কোথায় যেতে পারে? রাত
বাড়তে দেখে নিখোঁজ হবার খবর বাবা নিশ্চয় পুলিশকে জানিয়েছে। হাসপাতালে, হাসপাতালে
ঘুরেছে। আলমারির লকার খুলে গয়না, টাকা ঠিকঠাক আছে কি না দেখার চিন্তা মা হয়তে
করেনি। আজ না খুললে কাল লকার খুলবে। লকার খুললে সব বুঝতে পারবে। তারপর
আমি আর ভাবতে পারছিলাম না। ভূমিকম্পে একজন ছাড়া, একটা গোটা পরিবারের সবাই
মাটির নিচে তলিয়ে গেলে, সেই একজনের যা অবস্থা হয়, আমার তাই হয়েছিল। কাজটা ঠিক
করেছি কি না, ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না। রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর। রুমকির উপদেশ শোনা
উচিত হয়নি। মাল রাখার ক্যারিয়ারে নিজের কিট্‌স ব্যাগ রেখে আমার সুটকেস বুকে জড়িয়ে
অমিতাভ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। বাইরে অন্ধকারের দিকে আমি তাকিয়েছিলাম। বারবার প্রশ্ন
জাগছিল, মা-বাবার কী হবে? কী নিয়ে তারা বাঁচবে? কথা ছিল, রাঁচি থেকে একমাস বাদে
মা-বাবাকে চিঠি লিখে সব ঘটনা জানাব। অমিতাভও তাই করবে। সেই রাত থেকে কতদিনে
একমাস পূর্ণ হয়, হিসেব করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। কাল থেকে উনত্রিশ দিন পরে একমাস।
পরশু থেকে ধরলে হয় আটাশ দিন। তারপর সাতাশ, তারপর ছাব্বিশ, হিসেব করে যাচ্ছিলাম।

কাপে শেষ চুমুক দিয়ে অমিতাভ সিগারেট ধরাল। বলল, চা জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে, খাও। বাড়িতে চায়ের অভ্যেস ছিল না। কাপে চুমুক দিলাম। বিস্বাদ লাগল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে অমিতাভর যে পিসির বাড়ি গিয়ে উঠব, তিনি কেমন লোক জানি না। অমিতাভর কথা থেকে জানতে পেরেছি, পিসি তার বাবার সহোদর বোন নয়। সম্পর্কটা কী, স্পষ্ট করে না জানালেও অমিতাভ বলেছিল, আপন পিসির চেয়ে গিরিপিসি বেশি আপনজন। গিরিপিসি বলতে আমি তো অজ্ঞান!

প্রথমে বাসে, পরে সাইকেল রিকশা ধরে বেলা এগারোটার মধ্যে গিরিপিসির বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম। শহরের বাইরে পুরনো দু'কামরার বাড়ি। পাঁচিল দিয়ে এক সময়ে ঘেরা ছিল। ডানদিকের পাঁচিল জরাজীর্ণ, বাঁদিক ভেঙে পড়েছে। ভাঙা পাঁচিলের পাশে বুনো ঝোপঝাড় বোঝাই একটা মাঠ। মাঠের শেষে একটা বাড়ি। সেটাও একতলা, পোড়ো বাড়ির মতো চেহারা। গিরিপিসির বাড়িতে ঢুকে প্রথমে চোখে পড়ল, মুশকো চেহারা একজন লোক গামছা পড়ে উঠোনের মাঝখানে কুয়ো থেকে বালতিতে জল তুলে স্নান করছে। তার দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে চোখ ঘোরালাম। আমার সুটকেস, নিজের কিট্‌স ব্যাগ চাতালে রেখে অমিতাভ দু'তিনবার পিসি বলে ডাকতে মাঝবয়সি, থলথলে, গম্ভীর মুখ, কালো নরুণ পাড় থান পরা এক মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মাথায় ঘোমটা টেনে জড়োসড়ো হয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। চাতাল থেকে উঠোনে এসে গিরিপিসি শীতল চোখে আমার দিকে তাকাতে অমিতাভ বলল,

আমার বউ নূপুর। তোমাকে এর কথা বলেছিলাম। গিরিপিসির ভাবান্তর হলো না।

আমাকে অমিতাভ বলল, পিসিকে প্রণাম করো।

অনিচ্ছে নিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে দেখলাম, গিরিপিসির বাঁ পায়ে গোদ। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত টাটিয়ে এমন লাল হয়ে আছে, যে কোন মুহূর্তে ফেটে রক্ত বেরোতে পারে। আমার গা শিরশির করছিল। বাড়িতে থাকলে তখনই সাবান দিয়ে হাত ধুতাম। বাড়ির কথা আবার মনে পড়ল। গিরিপিসির মতো কাউকে সেখানে প্রণাম করতে হতো না। গিরিপিসি গ্রাহ্য করল না আমার প্রণাম। অমিতাভকে জিজ্ঞেস করল, তা কি মনে করে?

গলা নামিয়ে অমিতাভ বলল, ঘরে গিয়ে বলছি।

গিরিপিসির সঙ্গে যে ঘরে আমরা ঢুকলাম, সেখানে একটা তক্তপোশ ছাড়া আসবাব নেই। তক্তপোশে তেলচিটে বিছানা। ঘরের দেওয়ালে পেরেকে টাঙানো দড়িতে আধময়লা কয়েকটা ধুতি, শার্ট ঝুলছে। কুলুঙ্গির ভিতরে মূর্তিটা গণেশ, না লক্ষ্মী আবছা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। শুঁড় ভাঙা গণেশ হবার সম্ভাবনা বেশি। পিসির হাতে পাঁচটা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে অমিতাভ বলল, রাখো।

নোটগুলোর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে পিসি জিজ্ঞেস করল, কতদিন থাকবে?

পনেরো দিনের বেশি নয়।

অমিতাভ কেন একমাসের বদলে পনেরো দিন বলল, বুঝতে পারলাম না। মুশকো লোকটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গামছা ছেড়ে কোমরে লুঙির কসি আঁটছিল। পায়ের কাছে পড়ে ছিল ভিজে গামছা। বাড়িতে ঢোকার পর থেকে জায়গাটা আমার ভাল লাগছিল না। আগে কখনও এরকম জায়গায় থাকিনি। আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল। আজ আমার আশীর্বাদ। আলপনা আঁকা পিঁড়িতে এখন আমার বসে থাকার কথা। আত্মীয়-বন্ধুরা ঘিরে থাকত। ধান, দুর্বোয় ভরে যেত সিঁথি। শাঁখ বাজত! উলুধ্বনি উঠত। তার বদলে এ কোথায় এলাম! মাথা ঝিমঝিম করছিল। মা-বাবার কথা ভেবে কান্না পাচ্ছিল। গিরিপিসি বলেছিল, তা হলে তোমরা এ ঘরে থাক। গদাধরকে বলছি তার জিনিসপত্র নিয়ে আমার ঘরে যেতে।

দরজার বাইরে দাঁড়ানো লুঙি পরা লোকটাকে গিরিপিসি বলল, অ গদাধর, তোর জিনিসপত্র এখান থেকে নিয়ে আমার ঘরে রাখ।

ঘর থেকে যাবার আগে অমিতাভকে গিরি পিসি বলল, দরকার হলে একটা তক্তপোশ ভাড়া করতে পার। আগের দেনা কিন্তু থেকে গেছে।

মুখ টিপে হেসে অমিতাভ বলল, জানি।

গিরিপিসি চলে যেতে ভিজে গামছা কাঁধে ঘরে ঢুকল গদাধর। আলনা থেকে আধময়লা পোশাকগুলো নিয়ে, উবু হয়ে বসে তক্তপোশের তলা থেকে একটা টিনের বাক্স বার করল। গদাধরকে অমিতাভ বলল, আপনাকে তো চিনলাম না।

গদাধর বলল, আমিও আপনাকে চিনতে পারলাম না।

অমিতাভ বলল, গিরিবালা দেবী আমার পিসি।

আমারও পিসি।

অমিতাভকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, মুচকি হেসে গদাধর বলল, আপনি বোধহয় ভুল করছেন, উনি আপনার মাসি।

দুজনের কথা বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছিলাম না। বাক্সপেঁটরা নিয়ে ঘর থেকে গদাধর বেরিয়ে

যেতে অমিতাভ বলল, পাগল।

তারের আলনায় জামা, গেঞ্জি মেলে দিয়ে খালি গায়ে তক্তপোশে টানটান হয়ে শুয়ে অমিতাভ বলল, এসো, এখানে বসো।

ধবধবে ফর্সা অমিতভর বুকে গোছা গোছা বাদামি লোম। চামড়া থেকে গোলাপি আভা বেরোচ্ছে। অমিতাভ আবার তার পাশে বসার জন্যে আমাকে ডাকল। তক্তপোশের ধার ঘেঁষে আমি বসতে মটমট করে শব্দ হলো। অমিতাভ বলল, তক্তপোশটা বোধহয় মজবুত নয়।

দুহাতে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, দুপুরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে তক্তপোশটা টেস্ট করে নেব।

আমি সরে না এলে অমিতাভ তখনই তক্তপোশ পরীক্ষা শুরু করে দিত। তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে তক্তপোশের কিনারায় আমি বসেছিলাম। রাঁচির পাহাড়, জঙ্গল, জলপ্রপাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে মধুচন্দ্রিমা করার স্বপ্ন সাতদিনে ঘুচে গিয়েছিল। পুলিশের ভয়ে প্রথম তিন-চারদিন বাড়ি থেকে আমাদের বেরনো হলো না। আমাকে প্রায় জোর করে অমিতাভ বাড়িতে আটকে রাখল। কলকাতার সংবাদপত্রে নিরুদ্দেশ কলাম দেখতে শেষ বিকেলে সে একা বাজারে, এক বাঙালি ডাক্তারবাবুর চেম্বারে যেত। বাড়ি ফিরত সন্ধের পরে। এক রাতে আমাকে ঘোরতর আদর করার পরে অমিতাভ বলল, গতকাল আনন্দবাজারে নিরুদ্দেশ কলামে তোমার মা-বাবার একটা চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠির ওপরে তোমার ছবি আছে। স্পষ্ট ছবি। তোমাকে চেনা যাচ্ছে। কাগজটা কেনার জন্যে দু-তিনটে দোকানে গেলাম। পেলাম না। কাগজ বা ছবি নিয়ে আমার আগ্রহ ছিল না। মা-বাবা চিঠিতে কী লিখেছে, শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। অন্ধকার ঘর। প্রথম রাতের থেকে মেঝেতে তোষক পেতে আমরা শুতাম। নিস্তব্ধ রাতে পলকা তক্তপোশের ক্যাঁচকোঁচ শব্দে মেঝেতে তোষক বিছিয়ে শুতে বাধ্য হয়েছিলাম। তক্তপোশ ভেঙে পড়ার ভয় ছিল। সে রকম ঘটলে কেলেঙ্কারির শেষ থাকত না। মা-বাবার চিঠি সম্পর্কে একটা কথা না বলে অমিতাভ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। বলল, কাগজে এই ছবি বেরোবার পরে দশদিন তোমাকে নিয়ে কোথাও যাওয়া যাবে না। যে দেখবে, চিনে ফেলবে। খবর চলে যাবে পুলিশের কাছে। তারপর হাজতবাস। পাহাড়, জঙ্গল, জলপ্রপাত দেখতে আবার রাঁচি আসতে হবে।

রাঁচি বেড়াবার সাধ তিন-চারদিনে মিটে গিয়েছিল। শাড়ি জড়ানো শরীরে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কুয়োর জলে স্নান করে, খাটা পায়খানা আর হারিকেনের আলো দেখে রীতিমতো ভয় পেয়েছিলাম। তেমনই ছিল খাবারের ছিরি। আমাদের বাড়ির ঠিকে ঝি, যশোদাকেও এর চেয়ে ভাল খাবার দেওয়া হয়। এত খারাপ খাবার আগে খাইনি। এত মলিন, ছেঁড়া তোষকে আগে কখনও শুইনি। তবু রাতে কয়েক ঘন্টা সুখাবেশ ঘিরে থাকত। অমিতাভর লোমশ পুষ্ট বুকে মাথা রেখে চারপাশের শ্রীহীনতা ভুলে যাবার চেষ্টা করতাম। সাতদিনের বেশি পারিনি। তার মধ্যে আনন্দবাজারে ছাপা মা-বাবার চিঠির খবরে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। কান্নায় বুজে আসছিল আমার গলা। মা-বাবা চিঠিতে কী লিখেছে, অমিতাভ কেন বলছে না। কান্না জড়ানো গলায় শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করতে বাধ্য হলাম। আমাকে ঘিরে অমিতাভর হাতের বাঁধন আলগা হলো। বিরক্তি মেশানো গলায় বলল, তুমি এত ছিঁচকাঁদুনে কেন?

সন্তর্পণে চোখের জল মুছে বলেছিলাম, কাঁদছি না তো।

আমার মুখ, চোখ, চোখের জল, অন্ধকারে অমিতাভ দেখতে পাচ্ছিল না। একতাল মাংসের মতো সে পেতে চাইছিল আমাকে। আমার কথা শুনে বুকের কাছে মাংসপিণ্ডটাকে টেনে নিল।

শুরু করল নতুন খেলা। আমি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। তবু আরও একবার প্রশ্নটা করলাম, মা-বাবা চিঠিতে কি লিখেছে?

উদাসীন ভঙ্গিতে অমিতাভ বলল, সব মা-বাবা যা লেখে, ফিরে এসো, যা চাও, হবে, ভয় নেই, টাকার দরকার থাকলে জানাও। এক মুহূর্ত থেমে অমিতাভ বলল, শেষ কথাটাই একমাত্র কাজের কথা। বাকিগুলোর দাম নেই।

অন্য পাঁচজন মা-বাবার চেয়ে আমার মা-বাবা আলাদা, অমিতাভকে বলতে পারিনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, একমাস পূর্ণ হতে কত দিন বাকি?

অমিতাভ তেইশ দিন বলতে আমি জানিয়েছিলাম, বাইশ দিন।

যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন।

অমিতাভর গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, বাইশ-তেইশ দিন অপেক্ষা না করে কালই তো আমরা ফিরে যেতে পারি। তোমাকে দেখে মা-বাবা যে কী খুশি হবে, বলার নয়। যাবে?

অন্ধকারে অনুভব করলাম, অমিতাভর শরীরের পেশি শক্ত হয়ে উঠেছে। সামান্য সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, পালাবার কথা ভাবছ নাকি?

অমিতাভর গলায় এত ঝাঁঝ আগে কখনও পাইনি। ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, লক্ষ্মীটি ভুল বুঝো না। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

তা হলে কালই বাড়ি ফিরতে চাইছ কেন?

এ প্রশ্নের জবাব হয় না। চুপ করে গেলাম। আমি তখন সত্যি কাঁদছিলাম। প্রথম রাতে যে বালিশে মাথা রেখে ঘুমোতে ঘেন্না হয়েছিল, সেই বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছিলাম। কান্নার শব্দ অমিতাভ যেন না শোনে! আমার চোখের আশিভাগ জল রাঁচিতে শেষ হয়েছিল। বাকি কুড়ি ভাগের অর্ধেক আসানসোলে, অর্ধেক কলকাতায় ঝরে যেতে সতীসাধ্বী হবার দায় থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। দেহোপজীবিনী হিসেবে পেশাদারিত্ব অর্জন করতে তারপর দেরি হয়নি। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে মধুচন্দ্রিমা পর্বের শেষাংশে একুশ বছরের মালবিকা বলে নিতে চায়।

গিরিপিসির বাড়িতে আসার দশম দিনে নবীন শিল্পপতি, এস এন কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে অমিতাভ আসানসোলে যায়। আগে থেকে ঠিক করা ছিল সাক্ষাৎকার। আমি তাই জানতাম। আসানসোল যাবার আগের দিন রাতে আমাকে বিস্তর আদর-টাদর করে অমিতাভ বলেছিল, আসানসোল থেকে চারদিনের মধ্যে ফিরে আসবে। তারপর বাকি দুই হপ্তা আমাকে নিয়ে আসানসোলের কেজরিওয়ালের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার গেস্টহাউসে থাকবে। শহর থেকে অল্পদূরে অভিজাত পাড়ায় উঁচু পাঁচিল-ঘেরা অতিথি নিবাসে ফুলের বাগান, সুইমিং পুল, ঝর্না আছে। পাঁচতারা হোটেলের মতো খাওয়া-দাওয়া, আরাম।

নিজের বুকের ওপর আধখানা শরীর সমেত আমার মাথাটা তুলে নিয়ে অমিতাভ বলেছিল, আমি জানি, এখানে তোমার অসুবিধে হচ্ছে। গিরিপিসি আগের মতো নেই। পাতানো ভাইপো পেয়ে নিজের ভাইপোকে পাত্তা দিচ্ছে না। পরে নাজেহাল হবে। গলা নামিয়ে অমিতাভ বলেছিল, গদাধর লোকটা ভাল নয়। নোংরা স্বভাব। পাঁচিলের ফুটো দিয়ে স্নানের সময়ে ভেজা কাপড় সাপটানো তোমার শরীর দেখে। দুদিন নজর করেছি। কলকাতা হলে ওর চোখদুটো গেলে দিতাম। বিদেশ বিভুঁই বলে কিছু করতে পারছি না। সবচেয়ে বেশি ভয়, তোমার গয়নার বাক্স নিয়ে। চারদিন তোমাকে একা পেলে গয়নার বাক্স হাপিস করে দিতে পারে। তা হতে

দেব না। আসানসোলে যাবার সময়ে বাক্সটা নিয়ে যাব।

কথাটা শুনে ধড়াস করে উঠেছিল আমার বুক। গদাধর চোর কি না জানি না, তবে দেখে কাণ্ডজ্ঞানহীন, নিরীহ মনে হয়। লুকিয়ে সিক্তবসনা পরস্ত্রী দেখার মানুষ নয়। আমার তাই ধারণা হয়েছিল। তা ছাড়া আমি ঘরে থাকলে গয়নার বাক্স চুরি করা গদাধরের পক্ষে সম্ভব নয়। জিভের ডগায় কথাগুলো এলেও বলতে পারলাম না। পরের দিন আসানসোল যাবার আগে পনেরো ভরি সোনার গয়না বোঝাই বাক্সটা অমিতাভ কিট্‌স ব্যাগে পুরে নিল। করুণ চোখে আমি তাকিয়ে ছিলাম। আপত্তি করতে পারিনি। বলা বাহুল্য, চারদিন পরে অমিতাভ ফিরল না। পাঁচ দিন, ছ'দিন পরেও নয়। গিরিপিসির মেজাজ যত গরম হচ্ছিল, তত শুকিয়ে যাচ্ছিল আমার মুখ। সপ্তম দিন বিকেলে চাতালে দাঁড়িয়ে তেতো গলায় গিরিপিসি জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেছে তোমার বর?

ঢোঁক গিলে বললাম, আসানসোল।

খর চোখে গিরিপিসিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে দ্বিতীয় ঢোঁক গিলে বললাম, বোধহয় কাজে আটকে গেছে।

মুখ বেঁকিয়ে গিরিপিসি বলল, বোধহয় কাজে আটকে গেছে। ওই আনন্দে থাকো। একটা বিশ্ববেকার নাকি কাজে আটকে গেছে। তোমার বাপ-মা কি দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিল, না লাভম্যারেজ?

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে গিরিপিসি বলল, অ্যাতো কথায় কাজ নেই। ফেল কড়ি মাখো তেল। মাত্র পাঁচশো টাকা ঠেকিয়ে লোকটা কি মাসের পর মাস আমার ঘাড় ভঙতে চায়? এটা কি ধম্মোশালা, না আমি দানছত্তর খুলে বসেছি? সুটকেসে টাকাকড়ি থাকলে দাও। না থাকলে সরে পড়ো।

দিন শেষ হয়ে এসেছে। ছায়া ঘন হচ্ছে। ভাঙা পাঁচিলের গা ঘেঁষে বেলগাছের আড়ালে বসে গাঁজা খাচ্ছিল গদাধর। রোজ খায়। পিসিকে সম্মান দিতে বেলগাছের আড়ালে বসে ছিলিম নিয়ে। গিরিপিসির বাজখাঁই গলা শুনে বেলগাছের আড়াল থেকে ছিলিম হাতে গদাধর বেরিয়ে এল। চোখ লাল। বলল, বউমানুষকে এ সব বলে কী লাভ?

গদাধরকে গিরিপিসি বলল, থাম তো, বউ, না হাতি। বউ হলে আমি বলার আগে পাওনা মিটিয়ে দিত।

অমিতাভকে চোদ্দশো টাকা দেবার পরে আমার হাতব্যাগে একশো টাকা ছিল। একশো টাকা দেওয়া ঠিক হবে কি না, বুঝতে না পেরে গলা থেকে বারোমেসে সোনার চেনটা গিরিপিসিকে দিলাম।

অম্লানবদনে হারটা নিয়ে গিরিপিসি জিজ্ঞেস করেছিল, সোনা তো?

জবাব দেওয়ার শক্তি আমার ছিল না। উঠোনের মাঝখানে চলে এসেছিল গদাধর। পিসিকে জিজ্ঞেস করেছিল, হারটা তুমি নিলে?

নেব না তো কি?

আমার বউ-এর কাছ থেকে নিতে পারতে?

থতমত খেয়ে গিরিপিসি বলল, কথাটা তুই বলতে পারলি?

কেন পারব না?

নাকি সুরে কান্নার ভান করে গিরিপিসি বলল, তুই আমার একমাত্র ভাইপো, সহোদর ভাই-

এর ছেলে, রাস্তার একটা উটকো লোকের জন্যে নিজের পিসিকে এত বড় অপমান করতে পারলি?

নেশা কেটে যাবার ভয়ে 'যা বাব্বা' বলে গদাধর চুপ করে গিয়েছিল। গিরিপিসি থামেনি। কলের গানের মতো বেজে যাচ্ছিল। বলছিল, রেলগাড়িতে ভাইপো পাতানো একজনের সঙ্গে তুই কী করে মেলালি নিজেকে। গ্যাঁজা টেনে তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে?

গদাধর কথা বলতে চাইছিল না। গিরিপিসি বলল, কী কুক্ষণে ছোঁড়াটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল জানি না। যত বদগুণ, সব আছে। বাড়িতে অন্ধ বাবা, পঙ্গু মা, চারটে বিয়ের যুগ্যি বোন থাকতে যে বেআক্কেলে ছোঁড়া নিজে বে করে, তার মুয়ে আগুন। সংসারে একটা পয়সা ঠেকোবার মুরোদ নেই, অথচ সাজপোশাক, টেরির বাহার দেখে মনে হয়, নবাবপুত্তুর। ছ্যা, ছ্যা।

আমার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছিল। অন্ধকার দেখছিলাম চোখে। ছিলিম নিভে যাওয়ার আশঙ্কায় বেলগাছের আড়ালে চলে গেছে গদাধর। গিরিপিসি থামার পাত্রী নয়। বলছিল, আমি আর কতটা জানি। ওর কোন কথাটা সত্যি, আর কোনটা মিথ্যে, ধরতে পারার সাধ্যি শিবের বাপের নেই।

ফুটন্ত সিসের মতো কথাগুলো আমার কানে গিরিপিসি ঢেলে দিচ্ছিল। কানের পর্দা পুড়ে যাচ্ছিল। যন্ত্রণায় তছনছ হলেও মুখে আওয়াজ ছিল না। গিরিপিসির বিবরণের সঙ্গে আমার কিছু অভিজ্ঞতার মিল পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। নিক্তির মতো হাতের পাতা ছোট করে, সোনার চেনের ওজন অনুমান করতে চাইছিল গিরিপিসি। দেড় ভরি চেনটাকে, একভরিও নয় বলে, মন্তব্য করে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। সেই রাতে আমি কিছু খাইনি। ঘরের মেঝেতে শুয়ে সারারাত কেঁদেছি, আর ভেবেছি আমি কি ভুল করলাম? নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনলাম? কাল সকালে, প্রথম ট্রেন ধরে কি বাড়ি ফিরে যাব? অসংখ্য প্রশ্ন ছুঁচের মতো আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিঁধে যাচ্ছিল। অন্ধকার ঘরে শান বাঁধানো মেঝেতে শুয়ে ছটফট করছিলাম। কী করব? কী করা উচিত? অমিতাভ সম্পর্কে গিরিপিসির অভিযোগ যাচাই না করে এখান থেকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। ঝোঁকের মাথায় কাজ করা উচিত নয়। অমিতাভ হয়তো সত্যি কোনও অপরাধ করেনি। সে নির্দোষ, নিরপরাধ। তার সম্পর্কে গিরিপিসি অযথা বদনাম করছে। গিরিপিসির কোনও মতলব আছে। আমার গলার চেনটা নেবার পরে হাতের বালা দুটোয় নজর পড়েছে। অমিতাভর অনুপস্থিতিতে ভাইপো গদাধরকে নিয়ে গিরিপিসি আমার বিরুদ্ধে কোনও চক্রান্ত করছে। অমিতাভ সম্পর্কে বিষিয়ে দিতে চাইছে আমার মন। অমিতাভর ওপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যেতে চাইলে, দুজনে আমার পথ আটকে দাঁড়াবে। বালা, দুল, হাতের ঘড়ি পর্যন্ত কেড়ে নেবে। কিছু অসম্ভব নয়। অমিতাভ ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমি তার বিয়ে করা বউ। তার পরানো সিঁদুর সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে। আজ সন্ধেতেও সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছি। যাত্রাপালার সিঁদুর নয়। সত্যিকার এয়োতি চিহ্ন। মধ্যমগ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলেও সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যেতে হবে। সিঁদুর পরা নববিবাহিতা মেয়ে একা বাপের বাড়ি ফিরতে পারে না। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। মা-বাবাকে কী বলব? কাকে বিয়ে করেছি? তার পরিচয় কি? আরও কথা আছে। গিরিপিসির বাড়িতে এসে আমাকে না দেখলে অমিতাভ রেগে আগুন হয়ে যাবে। আমি পালিয়ে গেছি। সে যা সন্দেহ করেছিল, তাই ঘটেছে। ইহজীবনে আমার মুখ দেখবে না। না, সেরকম কিছু ঘটতে দেওয়া যায় না। অমিতাভর জন্যে আমি অপেক্ষা করব। কতদিন? জানি না। হয়তো

অসুস্থ হয়ে আসানসোলে কেজরিওয়ালের অতিথিনিবাসে অমিতাভ শুয়ে আছে। পথে কোনও দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। ব্যবসার কাজে কলকাতায় যেতে পারে। ফিরতে দেরি হওয়ার কারণ কম নেই।

অমিতাভর পক্ষে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে মন শান্ত করলাম। কিছুটা শান্তি পেলাম। তাকে ভুল বোঝার জন্যে লজ্জিত হলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, এমন ভুল আর হবে না। শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দুঃস্বপ্ন দেখে যখন ঘুম ভাঙল, বেলা হয়েছে। ধড়ফড় করে উঠে বসে দু হাতে মুখ ঢাকলাম। স্বপ্নে দেখেছিলাম মৃত বাবার মুখ। বাবাকে ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে। লিপিকা সাজাচ্ছে। জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তার দু'চোখ। না, এ হতে পারে না। আমার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। টের পেলাম, জ্বর হয়েছে। সারারাত মেঝেতে শুয়ে থাকার জন্যে ঠাণ্ডা লেগেছে। আগে কখনও মেঝেতে শুয়ে রাত কাটাইনি।

অষ্টম, নবম দিনে অমিতাভ না ফিরতে নতুন করে দুশ্চিন্তা শুরু হলো। তার সঙ্গে জুড়ে গেল বাবাকে নিয়ে দেখা দুঃস্বপ্ন। মনে হলো, এখনই বাড়ি ফিরে যাই। অমিতাভর পক্ষে যে সব যুক্তি সাজিয়েছিলাম, সেগুলোর পাল্টা যুক্তি খাড়া হতে থাকল। পরিচয়ের পর থেকে অমিতাভ কম মিথ্যাচার করেনি। শুরুতে বয়স ভাঁড়িয়েছিল। ত্রিশ ছুঁইছুঁই অমিতাভ বলেছিল তার বয়স তেইশ। অলোকদা, কাল্টুদাব সূত্রে বয়স নিয়ে তার মিথ্যাচার, লিপিকা ধরে ফেলে। পরে, সহপাঠিনী হৈমন্তীর বিবরণ শুনে বুঝেছিলাম, লিপিকা ভুল বলেনি। অমিতাভ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ দেখেনি, এমনকি কলেজ পর্যন্ত পৌঁছোয়নি, আমি টের পেয়েছিলাম। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা তখন এসে গেছে। অমিতাভর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দ্বিতীয় বছর। এক দুপুরে রেস্টুরেন্টে বসে অমিতাভ জিজ্ঞেস করেছিল, কিসে যেন তোমার অনার্স? অমিতাভ ভাল করে জানত, আমি উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী। যা জানত না ত হলো, উচ্চমাধ্যমিকে অনার্স বলে কিছু নেই। স্নাতক পর্যায়ে অনার্স পড়া যায়।

অমিতাভর প্রশ্নে হতভম্ব হয়েছিলাম।

বোকার মতো হেসে অমিতাভ পাশ কাটাতে চেয়েছিল। লিপিকা তখনও বেঁচে। লজ্জায় কথাটা তাকে বলিনি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, শুধু ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা নয়,আমার জন্যে উদ্বেগ থেকে লিপিকা আত্মহত্যা করেছিল। প্রেমিক নির্বাচনে ছোট বোনের সামনে মন্দ নজির রাখার জন্যে অনুতাপে ভুগছিল। আমার দুর্ভাগ্যের কথা আগেভাগে জানতে পেরেছিল। টর্পেডোর চেয়ে অমিতাভ যে বড় শয়তান, চিনতে ভুল করেনি। টর্পেডো চেনা শয়তান, অমিতাভ অচেনা শয়তান। তার শয়তানি কখনও ধরা পড়বে না। বাস্তবিক তাই। অচেনা এক গিরিপিসির বাড়িতে বসে টর্পেডোর চেয়ে অমিতাভকে বেশি অচেনা লাগছিল। অমিতাভর বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত জানি না। অমিতাভ দেয়নি। বাড়ি নিয়ে পারতপক্ষে কথা বলত না। বললে, মিথ্যে বলত। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে মেসে থাকার কারণও সম্ভবত এই মিথ্যাচার। আমাকে দেখে মেসের সেই মাতাল আবাসিকটি যে সব কথা বলেছিল, মর্যাদাসম্পন্ন কোনও মানুষকে তা বলা যায় না। মাতাল অবস্থাতেও নয়। হুল ফোটানো কথাগুলো অমিতাভ চুপচাপ শুনেছিল। প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, মুখ চুন করে দাঁড়িয়েছিল। ছিটেফোঁটা আত্মসম্মান থাকলে এ আচরণ কেউ করে না। আমার মা-বাবার সঙ্গে অমিতাভ কেন দেখা করতে চায়নি, জলের মতো বুঝতে পারছিলাম। এ আচরণ টর্পেডো করত না। অনেকদিন পরে টর্পেডোকে মনে পড়তে একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। আপাদমস্তক লাল পোশাক পরে মোরাম বিছানো রাস্তা দিয়ে

গটগট করে টর্পেডো হেঁটে আসছে। লুচ্চা হলেও টর্পেডোর সাহস ছিল। তাকে বোঝা যেত। অমিতাভ দুর্বোধ্য। তাকে বুঝতে পারিনি। সঞ্জয় দত্ত, মীরা দত্তর মুখোমুখি হবার মতো সাহস তার ছিল না। হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবার ভয় ছিল। তার আসল পরিচয় বাবা জেনে যেত। জাপানে চিংড়িমাছ রফতানির কাহিনীও ডাহা মিথ্যে। সেই প্রথম অনুভব করলাম, নিজের নাম ছাড়া অমিতাভ কোনও সত্যি কথা বলেনি। আমি ঠকে গেছি। আমার ঘুম ছুটে গিয়েছিল। জ্বরতপ্ত মাথায় অমিতাভর আচরণে নিত্যনতুন অসঙ্গতি খুঁজে পেতাম। অমিতাভ যে সত্যি কথা বলতে ভুলে গেছে, এ নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। তবু গিরিপিসির বাড়িতে দশদিন অমিতাভর প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিলাম। রোজ সকালে ভাবতাম, আজ অমিতাভ ফিরবে। সন্ধেতে সিঁদুর ছোঁয়াতাম কপালে। অমিতাভর কথা ভেবে রাতে একা শুয়ে কাঁদতাম। আমি তপস্বিনী নই। সোনাদানা, টাকাকড়িতে লোভ না থাকলেও আকাঙ্ক্ষা ছিল। পনেরো ভরি গয়না আর চোদ্দশো টাকার জন্যে শোক উথলে উঠত। অমিতাভকে টাকাটা দিলেও গয়নার বাক্স হাতছাড়া করা উচিত হয়নি। বাক্সে এক লাখ টাকার গয়না ছিল।

দশম দিন সকালে জ্বর কম হলেও শরীর ম্যাজম্যাজ করছিল। বাবাকে নিয়ে স্বপ্নটা বারবার মনে পড়ছিল। বাবার মৃতদেহ সাজাতে মৃত লিপিকাকে দেখার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। খোঁজার মতো মনের জোর ছিল না। জ্বলে যাওয়া তুবড়িব খোলের মতো ঠনঠনে ফাঁকা মাথায় কিছু ভাবতে পারছিলাম না। বেলা দশটা নাগাদ অমিতাভর চিঠি নিয়ে অচেনা একজন লোক এল। হিন্দিভাষী বিহারি। বাড়ি খুঁজতে যে কতটা তকলিফ হয়েছে, প্রথমে বর্ণনা করল। চাতালে বসে এক লোটা জল খেয়ে কাঁধের গামছা নিয়ে ঘাম শুকোতে লাগল। বন্ধ খামে চিঠি পাঠিয়েছে অমিতাভ। খামের ওপর লেখা ছিল নূপুর সেনগুপ্ত, (হাজরা)। ইংরেজিতে লেখা চার লাইনের চিঠির বয়ান এইরকম। আসানসোলে আটকে গেছি। নিজে যেতে পারছি না। পত্রবাহকের সঙ্গে আজই চলে এস। কোনও ভয় নেই। মিতা।

বিয়ের আগে থেকে অমিতাভকে নিভৃতে 'মিতা' বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম। চিঠিতে সেই শব্দটা পেয়ে যেমন খুশি হয়েছিলাম, তেমনই অপাঠ্য ইংরেজিতে লেখা চারটে লাইনে নটা ভুল বানান দেখে ব্যথিত হয়েছিলাম। কী দরকার ছিল ইংরেজিতে চিঠি লেখার? ভাল ছাত্রী ছিলাম। কাগজেকলমে ভুল দেখলে কষ্ট পেতাম। অমিতাভর চিঠি পেয়ে সব কষ্ট ফুৎকারে উড়ে গেল। তাকে অবিশ্বাস করার জন্যে অনুতাপ হলো। আসানসোলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে অমিতাভ। কতদিন যে তাকে দেখিনি। আমাকে যে নিতে এসেছিল, তার নাম রামপূজন। শক্ত সমর্থ চেহারা, লম্বা গোঁফ, কেজরিওয়ালের অতিথিনিবাসের দারোয়ান। প্রথম নজরে পালোয়ান মনে হলেও, সাদাসিধে মানুষ। তার সঙ্গে নিশ্চিন্তে আসানসোল যাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, সে অমিতাভর চিঠি নিয়ে এসেছে। রাঁচি থেকে মাঝদুপুরে হাতিয়া বর্ধমান লোকাল ধরে, মাঝখানে আদ্রায় ট্রেন পালটে রাত সওয়া দশটায় আসানসোল পৌঁছেছিলাম। স্টেশনের বাইরে আমার জন্যে গাড়ি ছিল। প্ল্যাটফর্মে অমিতাভকে না দেখে ভেবেছিলাম, গাড়িতে আছে। গাড়িতেও অমিতাভকে না দেখে অভিমান হয়েছিল। তখনই ভেবেছিলাম, কাজে আটকে যাওয়া অসম্ভব নয়। আমাকে নিতে গাড়ি পাঠিয়েছে স্টেশনে। এটাই বা কম কি? কেজরিওয়ালের অতিথিনিবাসে সে নিশ্চয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। গাড়িটা কেজরিওয়ালের, রামপূজন বলেছিল। কেজরিওয়ালের সঙ্গে অমিতাভ ভালরকম ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

কেজরিওয়ালের মতো একজন উঁচু দরের ব্যবসায়ীর সঙ্গে অমিতাভ মিশতে পেরেছে, এটা কম নয়। আমি খুশি হয়েছিলাম।

যে কথা এখনও বলা হয়নি, তা হলো, তিনদিন আগে ভোররাতের সেই দুঃস্বপ্ন, ছায়ার মতো অনুসরণ করছিল আমাকে। বাবাকে দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে মধ্যমগ্রাম যেতে অমিতাভ না করতে পারবে না, এমন ধারণা ছিল। একমাস পূর্ণ হতে দেরি নেই। অভিভাবকদের চিঠি লেখার সময় প্রায় হয়ে এসেছিল। অমিতাভকে যে কথা বলা যাবে না, তা হলো, বাঁ হাতের বালা খুলে গিরিপিসিকে দিয়ে আসতে হয়েছে। গিরিপিসির হিসেব মতো অমিতাভর পুরনো ঋণ, আর আমার খাইখরচের দু'হাজার টাকা শোধ না করলে সে পুলিশ ডাকত।

অতিথিনিবাসে গিয়ে শুনলাম, অমিতাভ নেই। পাশপোর্ট নিতে দুপুরের ট্রেনে কলকাতায় গেছে। পাশপোর্ট কাল পাবে। হংকং, সিঙ্গাপুরের ভিসা করিয়ে আসানসোল ফিরবে। আমার সঙ্গে নিজে আলাপ করে এম এল কেজরিওয়াল খবরটা দিয়েছিল। খবরটা ভাল লাগেনি। মেয়ে হিসেবে অশুভ কিছু গন্ধ পেয়েছিলাম। আমাকে চিঠি পাঠিয়ে আসানসোলে এনে অমিতাভ কলকাতায় চলে যাবে, ভাবতে পারিনি। কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে ছিলাম। কেজরিওয়ালের সামনে কাঁদব কী করে? কেজরিওয়াল বুড়ো মানুষ নয়। বয়স, বেশি হলে পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ। প্রায় ছ ফুট লম্বা সুঠাম শরীর। সামান্য ভুঁড়ি হলেও হাইটের জন্যে বোঝা যায় না। শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মামুলি দু-একটা কথা, রাঁচি কেমন লাগল, ট্রেন ঠিকমতো এসেছে কিনা, এই সব বলেছিল। পারিবারিক বিষয়ে একটা প্রশ্ন করেনি। প্রথম পরিচয়ে খারাপ লাগেনি কেজরিওয়ালকে। রাতে কেজরিওয়ালের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেয়েছিলাম।

অতিথিনিবাসের দোতলার ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কেজরিওয়াল বলেছিল, ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। দোতলার ঘরে রামপূজন পৌঁছে দিয়েছিল আমাকে। ক্লান্ত হলেও অনেক রাত পর্যন্ত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আমাকে রেখে অমিতাভ কেন চলে গেল, গয়নার বাক্স কোথায় রেখেছে, এরকম নানা প্রশ্ন মনে আসছিল। মনে পড়ছিল বাবাকে। বাবা ভাল আছে তো? লকার দেখে এতদিনে মা সব বুঝে গেছে। কেঁদে কেঁদে মা কি অন্ধ হয়ে গেল? কত রাতে ঘুমিয়েছিলাম, জানি না। ঘুম ভাঙলো ভোরে। বিছানা ছেড়ে খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। জানলায় গোলাপি হাফ পর্দা লাগানো। পর্দার ওপর দিয়ে বাইরে তাকালাম। স্বর্গের নন্দনকানন না দেখলেও কেজরিওয়ালের অতিথিনিবাস তার কাছাকাছি। সাজানো বাগান দেখে চোখদুটো ভরে গিয়েছিল। টাকার সঙ্গে লোকটার রুচি আছে।

পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। আমি আসানসোল পৌঁছবার পরেরদিন, তার পরের দিন, এমনকি এক সপ্তা পরে অমিতাভ ফিরল না। এক সপ্তা থেকে দশদিন, দু সপ্তা গেল। অমিতাভ এল না। আমি নন্দনবাসিনী, নূপুর সেনগুপ্ত হয়ে গেলাম। রূপান্তরের পর্বে অনেক টানাপোড়েন, রক্তপাত, কয়েক বালতি চোখের জল ঝরে পড়ার ঘটনা আছে। সে বিবরণে গেলাম না। সিঁদুর ব্যবহার ছেড়ে দিলাম। শাঁখা, পলা, নোয়া খুলে রেখে যখন পুরোপুরি নূপুর সেনগুপ্ত হয়ে গেলাম, দু মাস পার হয়ে গেছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর গা ঘেঁষে রামবাগানে এক বিরাট বাড়ির চারতলার ফ্ল্যাটে কেজরিওয়াল নিয়ে এল আমাকে। কেজরিওয়ালের বাতানুকূল গাড়িতে

াসানসোল থেকে কলকাতা পৌঁছলাম। সঙ্গে এল রামপূজন। বাড়ির সামনে গাড়ি এসে ামতে পিছনের ডিকি থেকে মালপত্র যে নামাচ্ছিল, তাকে দেখে চমকে গেলাম। সে অমিতাভ ্জরা। আমি তাকালাম না। কেজরিওয়াল আর আমার সুটকেস চারতলা পর্যন্ত অমিতাভ বয়ে িয়ে এল। তার পিছনে রামপূজন। রামপূজনের হাতেও দুটো ঢাউস সুটকেস। ফ্ল্যাটের দরজা ্লে একজন মোটাসোটা, বয়স্কা বিধবা দাঁড়িয়েছিল। ফ্ল্যাটে ঢুকে ড্রইংরুম। সোফা, কৌচ, ভানে সাজানো, পুতুলভর্তি কাচের আলমারি রয়েছে। ঘরের মাঝখানে লাল গালিচা পাতা। দওয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো নগ্নিকা পেন্টিং। ভিজে শাড়ির আড়ালে তার প্রতিটা ঙ্গ, এমনকি দেহের ভাঁজ দেখা যাচ্ছে। ঘরের মাঝখানে প্রথমে অমিতাভ, তারপর রামপূজন ্টকেস নামিয়ে রাখল। চোরের মতো দাঁড়িয়েছিল অমিতাভ। সেটাই স্বাভাবিক। অমিতাভ চাব তো বটেই। তার পাশে রামপূজন। আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাবার জন্যে মিতাভ উসখুস করছিল। আমি যেতে দিলাম না। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে থাকলেও ার শার্টের কলার খামচে ধরলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, আমার গয়নার বাক্স কোথায়?

কোন গয়নার বাক্স?

প্রশ্নটা শেষ হবার আগেই অমিতাভর গালে ঠাস করে এক চড় কষালাম। ঘর ছেড়ে মিতাভ পালাতে চাইছিল। তাকে দাঁড় করাল কেজরিওয়াল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার ক? আমি বললাম। কেজরিওয়াল শুনল। অমিতাভকে বলল, দাঁড়াও।

নড়ার ক্ষমতা অমিতাভর ছিল না। তার মালপত্র একতলার সার্ভেন্ট রুম থেকে আনতে ামপূজনকে পাঠাল কেজরিওয়াল। জীবনে প্রথম একজনকে চড় মেরে আমার হাতের পাতা ালা করছিল। বয়স্কা মহিলা ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছে। পাঁচ মিনিটে একটা কিট ব্যাগ, কঝকে নতুন একটা চামড়ার সুটকেস নিয়ে রামপূজন ফিরে এল। কিট ব্যাগ চেনা, সুটকেসটা াগে দেখিনি। কিট ব্যাগের দিকে আঙুল তুলে বললাম, ওটার ভেতরে আমার গয়নার বাক্স াছে।

রামপূজনকে কেজরিওয়াল ব্যাগ খুলতে বলল। জিপের মাথা ধরে ফরফর করে ব্যাগ খুলে মঝেতে উপুড় করে দিল রামপূজন। গয়নার বাক্স সেখানে নেই। সুটকেসটা অমিতাভকে কজরিওয়াল খুলতে বলল। অমিতাভ দোনামনা করতে রামপূজনকে কেজরিওয়াল বলল, ক ভাঙো।

লক ভাঙার দরকার হলো না। চাবি লাগিয়ে অমিতাভ সুটকেস খুলল। সুটকেস ওলটাতে লো না। জামাকাপড়ের পাশে বাক্সটা ছিল। কেজরিওয়াল জিজ্ঞেস করল, ওই বাক্স?

হ্যাঁ।

দেখে নাও।

সুটকেস থেকে বাক্স বার করে খুললাম। অর্ধেক গয়না নেই।

কেজরিওয়ালকে কথাটা বলতে অমিতাভর সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, বাকি য়না কোথায়?

অমিতাভ নিরুত্তর, পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সপাটে তার গালে এক চড় মেরে কজরিওয়াল টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, পুলিশ ডাকছি।

কেজরিওয়াল রিসিভার তোলার আগে অমিতাভ বলল, বেচে দিয়েছি।

কাকে?

টর্পেডো হালদারকে।

নামটা শুনে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কেজরিওয়ালের মুখ দেখে বুঝলাম, টর্পে নামটা তার অজানা নয়। ভ্রূ কুঁচকে এক মুহূর্ত চুপ থেকে অমিতাভকে কেজরিওয়াল বলেছি তোমার মালপত্র নিয়ে একতলায় চলে যাও। ঘরে থাকবে। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কোথা যাবে না।

অমিতাভ ঘরের বাইরে যাবার আগে তাকে বললাম, আমার আংটি দাও।

কড়ে আঙুল থেকে অমিতাভ আংটি খুলে দিল। রামবাগানে কেজরিওয়ালের চারতল ফ্ল্যাটে আমি স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলাম। ফ্ল্যাটের পরিচারিকা পদ্মবালা হলো আমার পদ্মমাসি সাড়ে চার বছর ধরে পদ্মবালা যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, তা হলো, গতর থাকতে আখের গুছি নাও। না করলে রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে।

রামবাগানের ফ্ল্যাটে আমি আসার পরের দিন বিকেলে রামপূজনের সঙ্গে অমিতাভ আসানসোলে পাঠিয়ে দিয়েছিল কেজরিওয়াল। ছমাস বাদে কেজরিওয়ালের মুখে শুনেছিলা আসানসোলে অমিতাভ পৌঁছয়নি। গভীর রাতে ট্রেন থেকে পড়ে মারা যায়। তার মৃত্যুবৃত্ত শুনিয়ে কেজরিওয়াল মুচকি হেসে বলেছিল, ট্রেনে বসে বহুৎ দারু খেয়েছিল।

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে কেজরিওয়াল থাকত আলিপুরে। আলিপুরে তার প্রাসাদের মে বাড়ির বিবরণ পদ্মমাসির মুখে শুনেছিলাম। কেজরিওয়ালের বাবার শ্রাদ্ধে পদ্মমাসি সেখা একবার গিয়েছিল। কলকাতায় থাকলে সপ্তায় দু'তিনদিন আমার কাছে কেজরিওয়াল আসত বাকি সন্ধেগুলোতে আসত তার নির্বাচিত কিছু ব্যবসায়ী বন্ধু। বাইরের কেউ ফ্ল্যাটে ঢুকতে পে না। বলা যায়, স্ত্রীলোক সংসর্গের জন্যে কিছু লম্পট বড়লোক সোনাগাছির কাছাকাছি, অথ সোনাগাছি নয়, এরকম হাফগেরস্ত পাড়ায় একটা ক্লাব করেছিল। আমি ছিলাম মক্ষিরানী মৌমাছিদের মধ্যে যতদূর জানি, মক্ষিবাজ থাকে না। সবাই শ্রমিক। রামবাগান মধুচক্রে মক্ষিরা ছিল কেজরিওয়াল। ফ্ল্যাট তার। বিত্তে, সামর্থে সে ছিল সবার ওপরে। যৌনজীবনে বিকারগ্র ছিল। চার বছর মুখ বুজে তার অত্যাচার সহ্য করেছিলাম। কেজরিওয়ালের বিকৃত ক্ষিধে নি বলার আগে আমার কিছু কৈফিয়ত আছে। না বললে শান্তি পাব না। অমিতাভর কাছে প্রতারি হয়ে মা বাবার কাছে আমি কী ফিরে যেতে পারতাম না? পারতাম। আমি জানতাম, বাড়ি দরজা আমার জন্যে খোলা আছে,·খোলা থাকবে। তবু গেলাম না। বাড়ি ফেরার পথে অভিম আর লোকলজ্জা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছিল। লজ্জার চেয়ে বেশি ছিল অভিমান। কোন মু মা-বাবার সামনে দাঁড়াব? আমাকে দেখে মা-বাবা কী বলবে? সরাসরি ফেলে না দিলে সারাজীবন খোঁটা দেবে। আমি কথা বলতে পারব না। মা-বাবাদের মতো ছেলেমেয়ের কি অহমিকা থাকে। আমারও ছিল। বাড়ি না ফেরার আরও একটা কারণ ছিল। সন্দেহ নেই, আমি বিপথগামী হয়েছিলাম। কোন নরকে বিপথ শেষ হয়, দেখতে চাইছিলাম। বছর শেষ হবা আগে পেশাদার দেহোপজীবিনী হয়ে গেলাম। কেজরিওয়ালের গৃহপালিত রক্ষিতা হলেও তা বন্ধুদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করতে অসুবিধে ছিল না। কেজরিওয়াল অনুমতি দিয়েছিল তবে ক্লায়েন্ট সংখ্যা কখনও একডজন ছাড়ায়নি।

পাঁচ বছরের পেশাদারি জীবন নিয়ে সব কথা বলতে গেলে সাত কাণ্ড রামায়ণ হয়ে যায় তার দরকার নেই। দেহোপজীবিনী নিয়ে অনেক সাহিত্য, সিনেমা হয়েছে। মা, বোনদে কাহিনীর চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে দেহোপজীবিনী বৃত্তান্ত। সে বৃত্তান্তে না গিয়ে প্রাসঙ্গি

ঘটনাগুলো বলা ভাল। পেশাজীবনে আমি কখনও নিজেকে সাহিত্য, সিনেমার চরিত্র ভাবতে পারিনি। নূপুর সেনগুপ্তর জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা, বলা যায়, স্মরণীয় ঘটনা হলো, কনাদ লোহিড়ির সঙ্গে পরিচয়। রামবাগানে থাকার চতুর্থ বছরে, এক সন্ধেতে কেজরিওয়ালের সঙ্গে ফ্ল্যাটে এসেছিল কনাদ লাহিড়ি। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কেজরিওয়াল বলেছিল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। কনাদ ছিল ভাল ছাত্র, আমি ছিলাম খারাপ ছাত্র। কনাদের চেয়ে বয়সে আমি বড় হলেও তিন, চার বছর গাড্ডু খেয়ে তার সমান হয়ে গিয়েছিলাম। লেখাপড়ায় ফেল করলেও ব্যবসাতে প্রথম চালে কিস্তিমাত করেছি। কনাদ পারেনি। বারোটা ব্যবসায় ফেল মেরে ভাল ছাত্র, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কনাদ এখন তেরো নম্বর ব্যবসা শুরু করেছে। ব্যবসায় দাঁড়াতে না পেরে বেচারি বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছে না।

কেজরিওয়ালের রসিকতায় কনাদ হাসছিল। রসিকতার সঙ্গে মেশানো খোঁচাতে কান দিচ্ছিল না। কেজরিওয়াল থামতে কনাদ বলেছিল, নূপুরকে দেখে মনে হচ্ছে, লেখাপড়ায় ভাল ছিল। কথাটা শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল আমার বুক। জিজ্ঞেস করেছিলাম, মুখ দেখে, লেখাপড়ায় ভালমন্দ বোঝা যায় নাকি?

আমি বুঝতে পারি।

ট্রেতে হুইস্কি, জিন, কাজুবাদাম, পনির ভাজা সাজিয়ে পদ্মমাসি টেবিলে রেখে গেল। খাত বদলাল আলোচনার। কেজরিওয়ালের তিন, চারজন বন্ধু এসে গিয়েছিল। জমজমাট আড্ডার মাঝখানে ইশারায় আমাকে ডেকে বেডরুমে নিয়ে গিয়েছিল কেজরিওয়াল। আমি জানতাম, কেন ডেকেছে। কেজরিওয়ালের যারা কাছের লোক, তাদেরও অজানা ছিল না। জানত না শুধু কনাদ। ঘরে ঢুকে আমাকে উলঙ্গ করে বিছানায় শোয়াতে চাইছিল কেজরিওয়াল। আমি রজস্বলা, সে জানত। ঘরে ডাকার কারণও তাই। রামবাগানের ফ্ল্যাটে আমি আসার পর থেকে মাসের বিশেষ চারদিন সে হিসেব রাখত! রক্তাক্ত, ক্লান্ত মেয়েরা এই চারদিন সাবধানে থাকে। বিশ্রাম চায়। বিবাহিতারা স্বামী সংসর্গ করে না। আমার সে উপায় ছিল না। সপ্তায় বরাদ্দ দু তিন দিন ছাড়াও মাসের ওই চারদিন কেজরিওয়ালের দাবি মেটাতে হতো। যন্ত্রণায় আমি চেঁচাতাম, কাঁদতাম। বিকারগ্রস্ত কেজরিওয়ালের হাত থেকে রেহাই পেতাম না। বেশিদিন চুপ থাকা সম্ভব ছিল না। পতিতাদের লজ্জা থাকতে পারে, কেজরিওয়াল বিশ্বাস করত না। প্রথম বছরে মেনে নিয়েছিলাম তার নির্যাতন। দ্বিতীয় বছরে খানিকটা পোড় খেয়ে, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দূরে রাখতে চাইতাম। পারতাম না। তৃতীয় বছরে শুরু হলো প্রতিবাদ। কেজরিওয়াল প্রতিবাদ কানে তুলত না। চতুর্থ বছরে শুরু হলো প্রতিরোধ। খণ্ডযুদ্ধ লেগে যেত মাঝে মাঝে। কাচের গ্লাস, প্লেট, ছাইদান মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফেলতাম। ঝনঝন শব্দে ফ্ল্যাট কাঁপত। ড্রইংরুমে কেউ থাকলে কান দিত না। আমার কাছ থেকে বাধা পেয়ে রক্তপিপাসু দানব হয়ে যেত কেজরিওয়াল। অসুরের শক্তি ছিল তার শরীরে। আমাকে কাবু করতে সময় লাগত না। আমাকে শয্যাশায়ী করে, আমার হাত-পা শাড়ি অথবা দড়িতে বেঁধে ফেলত। আমি থুতু ছিটোতাম তার মুখে। দুই চড় মেরে সে আমাকে নির্জীব করে দিত। কনাদ লাহিড়ি যে সন্ধেতে প্রথম এল, একই ঘটনা ঘটল। ঘরের দরজা আগলে দাঁড়ানো কেজরিওয়ালকে লক্ষ করে পেতলের ফুলদানি ছুঁড়ে মেরেছিলাম। মাথায় লাগলে রক্তারক্তি হতো। লাগল না। ড্রেসিং টেবিলের আয়না ঝনঝন করে ভেঙে গেল। কনাদ ছুটে এসেছিল ঘরে। কেজরিওয়াল তখন আমাকে বিছানায় পেড়ে ফেলেছে। তার শরীরে এক টুকরো অধোবাস

ছাড়া কিছু ছিল না। কনাদের দিকে না তাকিয়ে টেনে-হিঁচড়ে আমার ব্লাউজ, ব্রা, ছিঁড়ে ফেলেছিল। ঘরের দরজায় কনাদকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিলাম, মাসে পাঁচটা দিন কি ছুটি পাব না?

যা বোঝার বুঝে নিয়ে মাথা নিচু করে দরজা থেকে কনাদ চলে গিয়েছিল। তারপর আর ড্রইংরুমে বসেনি। টেলিফোন নম্বর জোগাড় করে ফোন করেছিল। ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যোগাযোগ। ঘনিষ্ঠতা বাড়ছিল। কখনও কেজরিওয়ালের সঙ্গে, কখনও তাকে না জানিয়ে দুপুরে আমার কাছে কনাদ চলে আসত। সবটা শরীরী আকর্ষণ নয়, বুঝতে পারতাম। ফুল নিয়ে আসত মাঝে মাঝে। কয়েকটা ভাল বই উপহার দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল তিন খণ্ড শরৎ রচনাবলী। আমার সঙ্গে গল্প করে কনাদ যেমন আনন্দ পেত, আমিও পেতাম। বিকেলে যাবার আগে পদ্মামাসির হাতে পঞ্চাশ, একশো টাকা গুঁজে দিত। তার আসার খবর কাকপক্ষী টের পেত না। কনাদের তেরো নম্বর ব্যবসা তখন ভাল চলছে। রাসায়নিক নানা উপকরণের সঙ্গে সার তৈরি করত। পোকামারা ওষুধ বানাত। লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছিল, লাউডন স্ট্রিটে অফিস নিয়েছিল। ফোন ছিল সেখানে। টেলিফোন নাম্বার, ঠিকানা, দিয়ে বলেছিল, দরকার হলে ফোন কোরো। ইচ্ছে হলে অফিসে চলে আসতে পাবে'।

আমি শুনতাম। কিছু বলতাম না। বলার সময় তখনও আসেনি। অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে সময় এল। কেজরিওয়াল তখন আসানসোলে। ভরদুপুরে আমার ফ্ল্যাটে এসেছিল ত্রিলোচন ত্রিপাঠি। ত্রিলোচন উত্তরপ্রদেশের লোক, বয়স পঁয়ষট্টি। বাগরি মার্কেটে ওষুধের হোলসেলার। বিরাট দোকান। কেজরিওয়ালের সঙ্গে দু'বছর আগে ত্রিলোচন প্রথম এসেছিল। তার বাড়িতে বউ, ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনি ছিল। দুই নাতনির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দুপুরে এসে সন্ধের আগে ত্রিলোচন চলে যেত। বিকৃতকাম কতরকম হয়, কেজরিওয়াল তার একটা উদাহরণ হলে, আর এক উদাহরণ ত্রিলোচন ত্রিপাঠি। সুপ্রিয়া লাহিড়িতে আমার রূপান্তরে অপ্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল ত্রিলোচন। তার চাহিদা ছিল অন্যরকম। হাতকড়া লাগানো দুটো লোহার শেকল ত্রিলোচন দিয়েছিল আমাকে। দুহাতে হাতকড়া লাগিয়ে লোহার শেকল দিয়ে জানলার শিকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুখৃস্টের মতো তাকে বেঁধে রাখতে হতো। শেকলে বাঁধা পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো অত্যাচারিত হতে চাইত। ক্লায়েন্টের নির্দেশ না মেনে আমার উপায় ছিল না। নোংরা বুড়োটাকে জুতোপেটা করে বিশ্বসংসারের ওপর যাবতীয় রাগ মেটাতাম। নির্যাতন সে উপভোগ করত। যাবার আগে দু'তিনশো টাকা পারিশ্রমিক দিত।

ফ্ল্যাটে দুটো শোবার ঘর ছিল। একটা বড়, একটা ছোট। দু'ঘরের মাঝখানে ছিল দরজা। দুজন মক্কেল একসঙ্গে এসে গেলে আলাদা ঘরে তাদের আপ্যায়ন করতাম। ছোট বেডরুমের জানলার সঙ্গে হাতকড়া বাঁধা ত্রিলোচন ত্রিপাঠিকে কয়েক ঘা জুতো মেরে সেই দুপুরে সবে মাত্র বড় ঘরে এসে শুয়েছি, টেলিফোন বাজল।

কেজরিওয়াল আর তার কয়েকজন বন্ধু ছাড়া আমাকে ফোন করার কেউ ছিল না। কদাচিৎ ফোন করত কনাদ। রিসিভার কানে তুলে কনাদের গলা শুনলাম। বলল, এখনই একবার তোমাকে দেখা করতে হবে।

কেন?

খুব দরকার।

কোথায় যাব?

পার্ক স্ট্রিটে একটা রেস্টুরেন্টের নাম করে বলল, যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো। কনাদ আগে কখনও আমাকে রেস্টুরেন্টে ডাকেনি। ফোন করেছে দু-তিনবার। তবু জানতাম, কনাদ ডাকবে। সত্যিকার ডাক পাঠাবে। তার ফোন পেয়ে অবাক হইনি। কিন্তু বুড়ো ত্রিলোচনকে ফেলে যাই কী করে? ক্লায়েন্টকে শোবার ঘরে শেকলে বেঁধে রেখে, কীভাবে বেরুব, ভেবে পেলাম না। দু'ঘন্টার আগে ত্রিলোচন বন্ধনমুক্ত হতে চায় না। সবে কুড়ি, পঁচিশ মিনিট হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের তুলনায় কিছুই নয়। দু-আড়াই ঘন্টার মধ্যে ফিরে এলে অসুবিধে নেই। ঠিক করলাম, তাই আসব। নিজের ঘরে শাড়ির আঁচল বিছিয়ে পদ্মমাসি ঘুমোচ্ছিল। জাগালাম না। ল্যাচ লাগানো দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে নিচে নেমে এলাম। সেন্ট্রাল অ্যাভিনু থেকে ট্যাক্সিতে আধঘন্টায় পার্কস্ট্রিট পৌঁছে গেলাম। রেস্টুরেন্টের বাইরে ফুটপাতে অপেক্ষা করছিল কনাদ। আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। মুখোমুখি আমরা বসলাম। রুমালে মুখ মুছল কনাদ। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, জরুরি দরকারে তোমাকে ডেকেছি।

তার মুখের দিকে তাকালাম। ওয়েটারকে দুটো ফ্রুট জুস হুকুম করে কনাদ বলল, কলকাতার ফ্যাক্টরি শিলিগুড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। আমার ব্যবসার বেশিটা উত্তরবঙ্গ, আসামে। সম্প্রতি, সার জোগানের দুটো বড় বরাত পেয়েছি গুয়াহাটিতে। কলকাতার পাট তুলে পাকাপাকি শিলিগুড়িতে থাকার জন্যে একতলা ছোট একটা বাড়ি কিনেছি সেখানে।

এক মুহূর্ত থেমে কনাদ জিজ্ঞেস করল, তুমি যাবে?

প্রশ্নটা বুঝেও আমি চুপ করে থাকলাম। কনাদ বলল, স্ত্রীর সম্মান দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাব।

আমার কাছে কনাদের প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবু চমকালাম। বাড়ি ছাড়ার পর থেকে সাড়ে পাঁচ বছরে পৃথিবীকে কম দেখিনি। মানুষকে অবিশ্বাস করার মতো বিশ্বাস রপ্ত করে ফেলেছিলাম। কনাদ লাহিড়িকে মানুষ হিসেবে অন্যরকম লাগলেও ভালবাসার প্রশ্ন ছিল না। ভালবাসা শব্দটাতে আমার অভালবাসা জন্মে গিয়েছিল। অভিজ্ঞতায় টের পাচ্ছিলাম, আমার সম্পর্কে কনাদ দুর্বল হচ্ছে। যে কোনওদিন প্রেম নিবেদন করতে পারে, বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। দেহোপজীবিনী নূপুর সেনগুপ্তর সামনে বিয়ের টোপ ঝুলিয়ে রেখে তাকে প্রেমিকা বানাতে চায়। প্রেমিকা মানে বিনি পয়সার মেয়েমানুষ, জেনে গিয়েছিলাম। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা হাস্যকর লাগলেও উড়িয়ে দিতে পারিনি। দু'বছর ধরে কেজরিওয়ালকে চরম এক শাস্তি দেবার প্ল্যান করছিলাম। বুকের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছিল প্রতিহিংসার আগুন।

ফলের রসে চুমুক দিয়ে কনাদ বলেছিল, সহধর্মিণীর মর্যাদা তোমাকে দেব।

এত মেয়ে থাকতে আমাকে কেন?

তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

খিকখিক করে আমি হেসে উঠতে কনাদ থতমত খেয়ে গিয়েছিল। অপমানে কালো হয়ে গিয়েছিল তার মুখ। আমি বলেছিলাম, আপনি বোধহয় খুব বেশি শরৎ চাটুজ্জের বই পড়েন।

তা পড়ি।

বেশ্যা বিয়ে করার আগ্রহ দেখে বুঝতে পেরেছি।

করুণ গলায় কনাদ বলেছিল, 'বেশ্যা' শব্দটা দয়া করে আমার সামনে বলো না।

কেন?

শুনলে কষ্ট হয়।

কনাদের কথায় ভান ছিল না। আমিও কি ভিতরে ভিতরে নরম হচ্ছিলাম না? ভালরকম হচ্ছিলাম এবং অনেকদিন ধরে হচ্ছিলাম, কনাদকে বুঝতে দিতে চাইনি। পার্কস্ট্রিটের নিভৃত রেস্টুরেন্টে নিজেকে প্রকাশ করে ফেললাম। বলছিলাম, তিনটি শর্তে আপনাকে বিয়ে করতে পারি।

শর্তগুলো কনাদ জানতে চাইল। আমি বললাম, প্রথম শর্ত আমার পিতৃপরিচয় জানতে চাইবেন না।

আজ পর্যন্ত চাই নি।

ভবিষ্যতেও চাইবেন না।

রাজি।

দ্বিতীয় শর্ত, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে আইনমাফিক বিয়ে করতে হবে।

রাজি।

তৃতীয় শর্ত, পাঁচজন গৃহস্থের মতো নিয়মনীতি মেনে সংসার করতে হবে।

রাজি।

আমি বললাম, তিন নম্বর শর্ত আমিও মেনে চলব।

জানি।

বিয়ের মুহূর্তে নূপুর সেনগুপ্তর মৃত্যু হবে। জন্ম নেবে মিসেস লাহিড়ী।

মুচকি হেসে কনাদ বলল, সুপ্রিয়া লাহিড়ি। আজ সন্ধেতে সুপ্রিয়া লাহিড়ির জন্ম হবে।

এবার আমার অবাক হবার পালা। আমার হাতে হাত রেখে কনাদ বলল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা বলে আজ বিকেল পাঁচটায় সময় করে রেখেছি। রেজিস্ট্রারের সামনে সুপ্রিয়া সেনগুপ্তকে বিয়ে করবে কনাদ লাহিড়ি। তিন বন্ধুকে সাক্ষী হিসেবে হাজির থাকতে বলেছি। তোমার পদবি সেনগুপ্ত বজায় রেখে বিয়ের নোটিশে নূপুরকে সুপ্রিয়া করে দিয়েছি। আশা করি; তুমি রাগ করবে না। আমি হাসলাম। আমি যে আদতে নূপুর সেনগুপ্ত নই, বলতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত না নিয়ে কোন ভরসায় বিয়ের নোটিশ দিলেন? মুচকি হেসে কনাদ বলল, বিয়েতে তোমার অমত হবে না, বুঝতে পেরেছিলাম।

কীভাবে?

আমার মনের কথা তুমি যেভাবে টের পেয়েছিলে, সেভাবে।

টের তো পাইনি।

মুচকি হেসে কনাদ বললো, না পেলে ফোনে একবার ডাকতে চলে আসতে না।

ধরা পড়ে গিয়ে চুপ করে থাকলাম।

কনাদ বলল, আজ থেকে সবাই তোমাকে কনাদ লাহিড়ির স্ত্রী সুপ্রিয়া লাহিড়ি নামে চিনবে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিসে যাবার আগে কনাদকে বলেছিলাম, আজ বিয়ে হলেও রামবাগানের ফ্ল্যাটে কিছুদিন থাকব।

কেন?

কাজ আছে।

কী কাজ?

কনাদের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললাম, আমার চতুর্থ শর্ত হলো, এ নিয়ে তুমি কিছু

নতে চাইবে না।

তথাস্তু।

ভাল করে ভেবে বলছ তো?

ভাবার কিছু নেই।

পাঁচটার বদলে সাড়ে পাঁচটায় হিন্দু সিভিল আইনে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। কনাদ জিজ্ঞেস করেছিল, কবে হানিমুনে যাবো?

হিসেব করে বলেছিলাম, এগারো থেকে পনেরো দিন বাদে।

জবাবটা হেঁয়ালির মতো শোনালেও কনাদ চুপ করে থাকল। খোলসা করে তাকে বোঝাতে চাইলাম না বললাম, ছোট একটা কাজ বাকি আছে। সতেরো থেকে একুশে জুলাই-এর মধ্যে আশা করি কাজটা সেরে ফেলব। আজ থেকে পনেরোদিন পরে একুশে জুলাই। সম্ভবত, আগেই হয়ে যাবে। সতেরো থেকে একুশে জুলাই-এর মধ্যে কোনও এক বিকেলে বাক্সপ্যাটরা নিয়ে তোমার অফিসে পৌঁছে যাব। অফিস থেকে সোজা হানিমুন।

কনাদ কী বলেছিল, খেয়াল নেই। গররাজি হয়নি। অখুশি দেখায়নি তাকে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে বেরিয়ে দুজনে একসঙ্গে খেয়েছিলাম। রামবাগানে ফিরতে রাত নটা বেজে গিয়েছিল। আমি না থাকায় দু'চারজন ক্লায়েন্ট যারা এসেছিল, চলে গেছে। ড্রইংরুম ফাঁকা। ড্রইংরুমে ঢুকে ধক করে উঠল বুক। মনে পড়ল, বেডরুমে লোহার শেকল দিয়ে ত্রিলোচন ত্রিপাঠিকে বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম। কনাদের সঙ্গে দেখা করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিসে যাওয়া পর্যন্ত ত্রিলোচনের কথা মনে ছিল। তারপর ভুলে যাই। খুশির জোয়ারে ভাসছিলাম। শুধু ত্রিলোচন কেন, কেজরিওয়ালের বন্ধুরা কেউ আসতে পারে, খেয়াল ছিল না। ত্রিলোচন ত্রিপাঠি বেঁচে আছে তো? দুপুর দুটো থেকে রাত নটা পর্যন্ত শৃঙ্খলিত ত্রিলোচন ত্রিপাঠি যদি মরে যায়! আমার বেডরুমে তার মৃতদেহ পেলে পুলিশ আস্ত রাখবে না আমাকে। একে স্ত্রীলোক, তার ওপর দেহোপজীবিনী, সমাজের চোখে আমি দু'ভাবে অপরাধী। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। পদ্মমাসি সকালে একবার ফ্ল্যাট ঝাড়পোঁছ করে। বিকেলে আমার অনুপস্থিতিতে পারতপক্ষে দুটো শোবার ঘরে সে ঢোকে না। কোনও কারণে ঢুকলে, ত্রিলোচন বেঁচে যেতে পারে। পদ্মমাসি ফ্ল্যাটে নেই। আশেপাশে কারও সঙ্গে গল্প করতে গেছে। ড্রইংরুমে আলোগুলো ফটাফট জ্বেলে দিয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকলাম। শোবার ঘরে আলো জ্বাললাম। পাশে ছোট বেডরুম। মাঝখানের দরজা ভেজানো। বিকেলে পদ্মমাসি এদিকে আসেনি, বুঝতে অসুবিধে হলো না। ভেজানো দরজা খুলে দুরুদুরু বুকে সেখানে গেলাম। বড়ঘরের আলো ছোট ঘরে পড়েছে। জানলায় বাঁধা ত্রিলোচনকে দেখতে পেলাম। সে বেঁচে আছে, না মৃত, আবছা অন্ধকারে বুঝতে পারলাম না। ঘরে আলো জ্বাললাম।

ত্রিপাঠির মাথা বুকের ওপর ভেঙে পড়েছে। শেকল থেকে ঝুলছে গোটা শরীর। আলো জ্বলতেও মুখ তুলে তাকাল না। মনে হলো, সামান্য নীল হয়ে গেছে শরীর। শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে কিনা বুঝতে পারলাম না। আতঙ্কে ধড়াস ধড়াস করছিল বুক। ত্রিলোচনের সামনে গিয়ে তার নাকের নিচে হাত রাখলাম। ঢিমেতালে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে। বুকে কান রেখে শুনতে পেলাম ধুকপুক শব্দ। তাড়াতাড়ি শেকল খুলে ত্রিলোচনকে বিছানায় শোয়ালাম। আলমারি খুলে ব্র্যান্ডির বোতল বার করে কয়েক চামচ খাওয়াবার কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে তাকাল। মুচকি হেসে বুড়োটা বলল, আজ যা আরাম দিলে, জবাব নেই।

মনে মনে ত্রিলোচনের আদ্যশ্রাদ্ধ করছিলাম। বললাম, বাড়ি যান, রাত হয়েছে।

ঘর থেকে বেরোবার আগে প্রভূত আনন্দ দেবার জন্যে ত্রিলোচন পাঁচশো টাকা পারিশ্রমি দিয়েছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। জুলাই-এর আঠারো তারিখ শেষ বিকেলে বা কাজটা সেরে ফেললাম। দু'দিন আগে শান্তিপুরে বোনের বাড়ি গিয়েছিল পদ্মমাসি। পাঁচদিনে ছুটি দিয়েছিলাম তাকে। ফাঁকা ফ্ল্যাটে মাঝদুপুরে কেজরিওয়াল হাজির হয়েছিল। হিসেব মতে মাসের সেই চারদিনের দ্বিতীয় দিনে পাওনা আদায় করতে এসেছিল। শান্তভাবে আ আত্মসমর্পণ করেছিলাম। পশুর মতো রক্তস্নান করে বিবস্ত্র কেজরিওয়াল বিছানায় শুয়ে ছিল ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ। বালিশের তলা থেকে ধারালো ক্ষুরটা নিঃশব্দে বার করলাম। নিউমার্কে থেকে কেনা জার্মান ক্ষুর। ফলাটা ঝকঝক করছিল। শেষ কাজটা সফলভাবে করলাম। প্রা না মেরে, জীবনের মতো অকেজো করে দিলাম তাকে। ওঁয়াক করে একটা আওয়াজ তু কেজরিওয়াল বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। আমার রক্তের সঙ্গে কেজরিওয়ালের রক্ত মিশে বিছা ভিজে উঠছিল। কলঘরে ঢুকে সাবান মেখে ভালো করে স্নান করলাম। তাড়া ছিল না। দুটো সুটকেসে নিজের জিনিসপত্র, আগে থেকে গুছিয়ে রেখেছিলাম। পাঁচ বছরে গয়না, শাড়ি, সখে জিনিস কম হয়নি। নগদ ছিল বাহাত্তর হাজার টাকা। নতুন, পুরনো মিলিয়ে, গয়নার দাম দু'লাখ টাকার কম হবে না। দুটো ভারি সুটকেস নিয়ে একতলায় নেমে ট্যাক্সি ধরতে দম বেরিয়ে গিয়েছিল। ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার আগে শোবার ঘরে উঁকি মেরে দেখেছিলাম, বিছানার পাশে রাখা টেলিফোন রিসিভার খুঁজতে কেজরিওয়াল অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছে। টেলিফোন সেখান থেকে আগে সরিয়ে ফেলেছিলাম।

লাউডন স্ট্রিটে কনাদের অফিসে পৌঁছলাম বিকেল পাঁচটায়। আমার মুখ দেখে কিছু অনুমান করে কনাদ বলেছিল,—তিনদিন ধরে আমিও তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছি। রাত আটটা দশে কলকাতা-ম্যাড্রাস ফ্লাইট ধরতে এখনই বিমানবন্দরে রওনা হতে হয়। আমার মাথা কাজ করছিল না। কনাদের হাত ধরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের আটটা দশের বিমানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। কনাদকে বিয়ে করে, দাম্পত্যসুখ কী জিনিস, অনুভব করেছিলাম। বাপের বাড়িতে মা, বাবার কাছ থেকে পাওয়া স্নেহ, আদরের ধারাবাহিকতা দাম্পত্যজীবনে বজায় না থাকলে কোনও মেয়ে সুখী হয় না। এরকম খুব কম ঘটে। অসুখী স্ত্রীর সংখ্যা তাই বেশি। বিয়ে করে আমি অসুখী হইনি। কেরালার কোভালাম সমুদ্রসৈকতে মধুচন্দ্রিমা করতে গিয়েছিলাম। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিলাম প্রতিটা মুহূর্ত। দেড় বছরের মাথায় কৃশানুর মা হলাম। কৃশানুকে বাড়িতে কৃশ বলে ডাকতাম। ঘটা করে তার অন্নপ্রাশন করলাম। কৃশ ছিল আমার আঁচলধরা। কৃশকে দেখলে মা-বাবাকে মনে পড়ত। আড়াই, তিন বছর বয়স হবার পরে কৃশ প্রায়ই মামাবাড়ির কথা জিজ্ঞেস করত। আমার পিতৃপরিচয় জানার আগ্রহ কনাদের বিধবা মা, ভাইবোন, আত্মীয়বন্ধুদের কম ছিল না। সঞ্জয় দত্ত, মীরা দত্তর নাম, মধ্যমগ্রামে বাড়ির ঠিকানা, ইচ্ছে করলে সবাইকে বলতে পারতাম। ভয়ে বলিনি। মা-বাবার কেউ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়ে থাকলে আর একজনকে মুখ দেখাব কী করে? দুজনের কেউ বেঁচে না থাকলে? প্রশ্নটা ভেবে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত হাত-পা। ভাবতাম দরকার কী? মালবিকা দত্ত, নূপুর সেনগুপ্তর চেয়ে সুপ্রিয়া লাহিড়ি অনেক বেশি বাস্তব আর সত্য। মা-বাবার মেয়ের চেয়ে স্ত্রী, মা হিসেবে আমার পরিচয়, কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসলে মানুষের পরিচয় হলো, নানাভাবে জড়িত তার একগুচ্ছ সম্পর্ক। সারাজীবন সম্পর্কের চেহারা একরকম থাকে না। ক্রমাগত বদলে যায়। আজ

যে মেয়ে, কাল সে স্ত্রী, পরশু মা। মালবিকা দত্তকে ছাপিয়ে গেছে স্বামী, ছেলে নিয়ে সুপ্রিয়ার সংসার। সেখানে আমি গৃহিণী। সংসার আগলে রাখা মূল কাজ। মামাবাড়ি নিয়ে জানার আগ্রহ কুশের তবু কাটত না। আমাদের আত্মীয়বন্ধুরা, পিতৃপরিচয় নিয়ে কৌতূহল দেখাত। আবোলতাবোল জবাব দিতাম। ডিব্রুগড় থেকে একশো মাইল দূরে পাণ্ডববর্জিত এক চা-বাগানে মামা-মামির সংসারে বড় হয়েছি, এমন এক গল্প চালু করে দিয়েছিলাম। কেউ বিশ্বাস করত, কেউ সন্দেহের চোখে তাকাত। মা-বাবা বেঁচে থাকতে অনাথ বলে পরিচয় দিতে কষ্ট হতো। বাইরের লোককে যা বোঝাতে পারতাম, কুশকে পারতাম না। আসামের কাল্পনিক চা বাগানে আমার মামা-মামিকে দেখার বায়না করত। কোনও এক ছুটিতে সেখানে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুশকে ঠাণ্ডা করতাম। তবে শর্তানুযায়ী, কনাদ একবারও আমার পিতৃপরিচয় জানতে চায়নি। কুশের চারবছর বয়স হতে দার্জিলিং-এর এক মিশনারি স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম। ছাত্রাবাসের দরজায় পৌঁছে আমাকে জড়িয়ে ধরে কুশ কান্নাকাটি করেছিল। জল ছিল আমার চোখেও। তবু তাকে ছাত্রাবাসে রেখে আসতে হয়। কনাদও চাইছিল। শিলিগুড়ি এসে যে উৎসাহ নিয়ে কনাদ কারখানা তৈরি করেছিল, ব্যবসা সেরকম জমল না। গুয়াহাটি থেকে পাওয়া দুটো বড় বরাত-এর একটা বাতিল হয়ে গেল। কেটে ছেঁটে আর একটার আয়তন দাঁড়াল এক-চতুর্থাংশ। কারখানা চালানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। বহুজাতিক কর্পোরেট সেক্টর হুড়মুড় করে দেশের বাজারে ঢুকে পড়েছিল। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি কনাদের ছিল না। কারখানা বসাতে অনেক টাকা ঋণ হয়ে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, তেরো নম্বর ব্যবসা নিয়ে কনাদ হাবুডুবু খাচ্ছে। ব্যবসাতে আমাকে একজন সত্ত্বাধিকারিণী করেছিল কনাদ। দুজনের নামে ব্যাঙ্কে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। লকারও নেওয়া হয়েছিল দু'জনের নামে। তবে আমার ব্যক্তিগত বাহাত্তর হাজার টাকা জমা পড়েছিল আমার একার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। গয়নার বাক্স, দরকারি কাগজপত্র কনাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়ে লকারে রেখে এসেছিলাম। টাকাকড়ি নিয়ে আমাদের মধ্যে ছিটেফোঁটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। তবে আমার পিতৃপরিচয় নিয়ে কথা উঠলে কনাদ অস্বস্তিতে পড়ত। সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল। দু'জনের মধ্যে কখনও খিটিমিটি লাগলে ভাবতাম, সব সংসারে এরকম হয়। ব্যবসায় লোকসান দিয়ে কনাদের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠছে, গোড়ায় বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম, সর্বস্ব নিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ব্যাঙ্কের বাহাত্তর হাজার টাকা থেকে সত্তর হাজার তাকে দিলাম। ছ' মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কনাদ। কথা রাখতে পারল না। ছ'মাস ঘুরে এক বছর হলো। টাকা সম্পর্কে কনাদ উচ্চবাচ্য করল না। আমি তাগাদা করিনি। আমি টের পেয়েছিলাম, ব্যবসায় ভরাডুবি হতে দেরি নেই। সাত লাখ টাকা ঋণের জন্যে পাগলের মতো ব্যাঙ্কের দরজায় দরজায় কনাদ ঘুরছিল। আর্থিক সহায়ক সংস্থাগুলোতে যাচ্ছিল। এক মাসের মধ্যে দু' তিনবার কলকাতা গেল টাকার আয়োজন করতে পারেনি। তার মুখ দেখে বোঝা যেত। শেষ পর্যন্ত সুদখোর মহাজনের কাছে হাত পাততে হলো। শেষে আমাকে লগ্নি করতে চাইল। মহাভারতের সময় থেকে এ কাণ্ড হচ্ছে। হয়তো তার আগেও এ প্রথা ছিল। আজও আছে। আমি রাজি হইনি। কনাদের ব্যবসাতে পুঁজি হতে চাইনি। এক সন্ধের ঘটনা মনে আছে। স্কচ হুইস্কি, খাবারদাবার ব্যবস্থা করেছিল কনাদ। ড্রইংরুমে চোখের ইসারায় আমাকে পানসঙ্গিনী হতে বলেছিল। আমি হইনি। রামবাগানের যে নূপুর সেনগুপ্ত হুইস্কি, জিন, ভোডকা খেত, সে মারা গিয়েছিল। মনেপ্রাণে সুপ্রিয়া লাহিড়ি হয়ে কীভাবে মৃত নূপুরের কাছে ফিরে

যাব? তা সম্ভব ছিল না। তবে রাত এগারোটা পর্যন্ত মুখরোচক নানা অনুপান, এগপকোড়া, পাঁপড়মুড়ে আলুভাজা, পাঁপর ভাজা বানিয়ে দিয়েছিলাম। শিলিগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্রের এক নম্বর ব্রোকার, উমাপ্রসাদ ছিল টাকার কুমির। সাতলাখ টাকা ঋণের বঁড়শিতে কনাদকে ঝুলিয়ে রেখে আমাদের মাটিগড়ার বাড়িতে সে যাতায়াত শুরু করল। শিলিগুড়ি শহরের বাইরে মাটিগড়া। এলাকাটা সবুজ আর নির্জন। বসবাস করার পক্ষে আদর্শ। আমার ভাল লাগত। স্কচের বোতল নিয়ে এক সন্ধেতে উমাপ্রসাদ যখন এল, কনাদ বাড়ি ফেরেনি। খাতির করে ড্রইংরুমে তাকে বসিয়েছিলাম। পাঁচ, সাত মিনিট বসে উমাপ্রসাদ বলেছিল, শুকনো মুখে কতক্ষণ বসে থাকব?

চা খাবেন?

আমার প্রশ্নে উমাপ্রসাদ বলেছিল, ঠাণ্ডা জল আর বরফ দিন।

উমাপ্রসাদের সাহস দেখে হতবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম, কনাদ না আসা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। জবাব শুনে উমাপ্রসাদের ফর্সা মুখ মুহূর্তের জন্যে লাল হয়ে গিয়েছিল। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি পালাই, পরে দেখা হবে।

রাত এগারোটায় মত্ত অবস্থায় কনাদ বাড়ি ফিরেছিল। প্রথমে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তার বাড়ি থেকে আমি কোন অধিকারে উমাপ্রসাদকে তাড়িয়ে দিয়েছি!

স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাইরের পুরুষ অতিথিকে বাড়ির ড্রইংরুমে বসিয়ে কোনও গৃহিণী যে মদ খেতে অনুমতি দিতে পারেনা, এই সহজ কথাটা কনাদকে বোঝাতে পারছিলাম না। বোঝার অবস্থা তার ছিল না। কথা না বাড়িয়ে শুতে চলে গিয়েছিলাম। কনাদকে বাঁচাতে সর্বস্ব দিতে তৈরি ছিলাম। সবচেয়ে বেশি দরকার, উমাপ্রসাদের খপ্পর থেকে তাকে বার করে আনা। লকার থেকে গয়নার বাক্স নিয়ে তাকে দিতে চেয়েছিলাম। গয়না থেকেই কম করে দু'লাখ টাকা হবে। বাকি টাকার জন্যে দরকার হলে বারো বছর পর মধ্যমগ্রামে গিয়ে মা-বাবার কাছে হাত পাতব। সন্ধের আগে কনাদ বাড়ি ফিরতে পরিকল্পনার অর্ধেকটা তাকে বলেছিলাম। মধ্যমগ্রাম অংশ গোপন করেছিলাম। আমার কথা শুনে এক মুহূর্ত চুপ থেকে কনাদ বলেছিল, দু'লাখ টাকা না হয় জোগাড় হলো, বাকি পাঁচ লাখ আসবে কোথা থেকে?

আত্মপরিচয় প্রকাশ করার কথা যখন ভাবছি, কনাদ বলল, তুমি একটু সাহায্য করলে টাকা পেতে অসুবিধে হবে না। কনাদকে সাহায্য করতে একপায়ে খাড়া ছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কী সাহায্য? সামান্য ইতস্তত করে কনাদ বলল, উমাপ্রসাদকে তুমি একটু অন্যভাবে আপ্যায়ন করলে, মানে বুঝতেই পারছ।

কী বলছ তুমি?

আমার আর্তকণ্ঠ কনাদ গ্রাহ্য করল না। বলল, তোমাকে খাটিয়ে কেজরিওয়াল কতো টাকা কামিয়েছে, তুমি জান? জান না। আমি জানি। বড় বড় কোম্পানি ডিরেক্টরদের বন্ধু সাজিয়ে রামবাগানের ফ্ল্যাটে নিয়ে যেত। তাদের সঙ্গে তোমাকে শোয়াত।

সুপ্রিয়া লাহিড়ির কাছ থেকে তুমি কি তাই চাও?

মাত্র একবারের জন্যে।

তা হয় না।

হয়। উমাপ্রসাদ ভীষণভাবে তোমাকে চাইছে।

কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম। বুক চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কনাদ লাহিড়ির স্ত্রী, কুশের মা, আমি দাঁড়াবো কোথায়? স্মৃতি থেকে মালবিকা দত্ত প্রায় মুছে গেছে। ধুলো ঝাড়ার মতো

নূপুর সেনগুপ্তকে ঝেড়ে ফেলেছি। সুপ্রিয়া লাহিড়ি ছাড়া আর কোনও পরিচয় আমার নেই। সংসারে সুপ্রিয়া লাহিড়ি সেজে, আমাকে কি নূপুর সেনগুপ্তর পেশায় ফিরে যেতে হবে? তাহলে সুপ্রিয়া হলাম কেন? কেজরিওয়ালের কসাইখানায় নূপুর সেজে থাকতে পারতাম। আমার মনে হচ্ছিল, কনাদ মজা করছে। বাজিয়ে দেখছে আমাকে।

না, তা নয়। গম্ভীর মুখে কনাদ যা বলছিল, সেখানে বিন্দুমাত্র মজা ছিল না। কনাদ বলল, একটু বেশি বয়সে টের পাচ্ছি, ভাল ছাত্র, কখনও ভাল ব্যবসায়ী হতে পারে না। কেজরিওয়ালের মতো হওয়া উচিত ছিল।

আমি বললাম, সাতদিন সময় দাও। সাতলাখ টাকা পুরো না পারলেও পাঁচ, ছ'লাখ জোগাড় করে দেব।

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কনাদ। জিজ্ঞেস করলো,

কীভাবে?

লকারে দু'লাখ টাকার গয়না আছে। বাকি পাঁচ লাখ কোনও আপনজনের কাছে চাইব।

সে কে?

টাকা পেলে বলব।

স্তব্ধ হয়ে কিছু সময় বসে থেকে কনাদ বলল, তিনমাস আগে লকারের সব গয়না বন্ধক দিয়েছি।

কথাটা শুনে মাথায় বজ্রাঘাত হলো। গয়নার শোকে নয়, আতঙ্কে। আমি কনাদ লাহিড়ির স্ত্রী, সংসারে গৃহিণী, তার অসুবিধে আগাগোড়া বুঝতে পারতাম। সেখানে খাদ ছিল না। সত্তর হাজার টাকা এককথায় দিয়েছি। ভুলেও ফেরত চাইনি। গয়নার বাক্স আমি এনে দিতাম তাকে। ব্যাঙ্কে গিয়ে কালই লকার থেকে নিয়ে আসতাম। কনাদ সুযোগ দিল না। অমিতাভকে মনে পড়েছিল। মনে পড়েছিল তার মিথ্যাচার। অনুভব করলাম, অতলস্পর্শী খাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যাব।

কনাদ বলল, ছ'মাসের মধ্যে সব গয়না ফেরত পাবে।

আমি একটা কথা বললাম না। সময় চলে যাচ্ছিল। কনাদ বলল, সাতটায় উমাপ্রসাদ আসবে। প্লিজ, আমাকে ডুবিও না।

তুমি যা বলছ, আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কনাদ বলল, কেজরিওয়ালের মতো জবরদস্তি আমিও করতে পারি।

আমি হাসলাম। কেজরিওয়ালের দুর্দশার কাহিনী বললাম না। সাতটার আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। একতলা বাড়ি। পিছনে শোবার ঘর। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। সন্ধে সাতটায় উমাপ্রসাদ এসেছিল। তাদের কথা, হাসিঠাট্টা, কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম। রাত এগারোটার পরে চলে গিয়েছিল উমাপ্রসাদ। ড্রইংরুমে আমার অনুপস্থিতিতে সে বিরক্ত হয়েছে, বুঝতে পারছিলাম। অনেক রাতে শোবার ঘরের বন্ধ দরজায় কনাদ ধাক্কা দিয়েছিল। নিজের বিছানায় ঘুমোতে এসেছিল। আমি দরজা খুলিনি। খোলার কারণ ছিল না। বন্ধ দরজার বাইরে তাসের প্রাসাদের মতো ছত্রখান হয়ে পড়েছিল ছ'বছর ধরে আমার হাতে গড়া সংসার।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে, সেই অভিশপ্ত রাতে সুপ্রিয়া লাহিড়ির মৃত্যু হলো। দার্জিলিং মেলের কামরায় এখন যে শুয়ে আছে, সে নামপরিচয়হীন এক স্ত্রীলোক। সে চলেছে চতুর্থ পরিচয়ের

খোঁজে। জানলার বাইরে তাকালাম। ভোর হচ্ছে। আবছা আলো জেগেছে আকাশে। বাঙ্ক থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা। মালপত্র নিয়ে কয়েকজন যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। সামনের স্টেশনে নামবে। স্টেশনটা যে বোলপুর, ট্রেন ঢুকতে দেখতে পেলাম। পূব আকাশে সূর্য উঠছে। মাতৃগর্ভ থেকে যে ভাবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেভাবে দিগন্তের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে শিশু সূর্যের রক্তাভ মাথা, মুখ গলা, শরীর, আকাশভূমিতে এসে গেল পূর্ণাঙ্গ শিশু। সূর্যের এমন আত্মপ্রকাশ আগে দেখিনি। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। ট্রেন ধরার জন্যে সামনের কামরার দিকে এগিয়ে চলেছে এক দম্পতি। তাদের সঙ্গে কুশের বয়সী এক শিশু। মায়ের হাত ধরে আছে সে। ব্যস্তবাগীশ বাবা তাড়াতাড়ি হাঁটছে। মা হাঁটছে ছেলের পায়ে পা মিলিয়ে। মায়ের মুখে মিঠে হাসি। ছেলেকে বোঝাতে চায়, তোকে ছেড়ে ট্রেনে উঠব না।

মায়ের স্পর্শে ছেলের মুখে ফুটে উঠেছে প্রসন্ন আভা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের গোলাপি আলো প্ল্যাটফর্মে এসে পড়েছে। কামরায় ছেলেকে নিয়ে মা উঠলো। মায়ের মুঠোয় ছেলের হাত। আমি অনুভব করলাম, আমি কুশের মা, কুশের আদরের মামণি, এই আমার চতুর্থ পরিচয়। তখনই মনে হলো, না, কুশের মা হিসেবে আমার আলাদা পরিচয় নেই। আমি কনাদ লাহিড়ির স্ত্রী, সেই সূত্রে কুশের মা। সুপ্রিয়া লাহিড়ির পরিচয় সম্বল করে কুশ যেমন পাঁচজনের সামনে আত্মপরিচয় দিতে পারবে না, আমিও তেমনি শুধু মা পরিচয়ে, সমাজে দাঁড়ানোর জায়গা পাবো না। সুপ্রিয়া লাহিড়ি হিসেবে কুশের মাতৃত্ব একা দাবি করতে পারবো না। কারো মা হতে গেলে একজন পুরুষের স্ত্রী হওয়া চাই। আগে স্ত্রী তারপর মা। কণাদ লাহিড়ির এ ঝামেলা নেই। কুশের বাবা হিসেবে সে অনায়াসে নিজেকে জাহির করতে পারে। তার কাছে কুশের মায়ের নাম কেউ জানতে চাইবে না। চাইলে, সত্যি মিথ্যে একটা নাম সে বলে দিতে পারে। সেই নামের মেয়েটার পিতৃপরিচয় জানতে অল্প লোক আগ্রহ দেখাবে। সদুত্তর দেওয়া না দেওয়া কণাদ লাহিড়ির ইচ্ছে। সুপ্রিয়া লাহিড়ির পক্ষে তা সম্ভব নয়। কণাদ লাহিড়িকে বাদ দিয়ে আমার মা-পরিচয় ধোপে টিকবে না। স্বয়ংসম্পূর্ণ জননী এখানে হওয়া যায় না। স্বৈরিনী, দেহোপজীবিনী বলতে অনেকের মুখে আটকায় না। শুধু কুশের মা পরিচয়ে বাঁচার অধিকার আমার নেই। কুশও সে অধিকার আমাকে দেবে কিনা সন্দেহ।

বাইরে ফাঁকা মাঠ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভোরের আলো ঢুকছে কামরার ভেতরে। কণাদ লাহিড়ির সংসার ছেড়ে নিজের জন্যে আস্ত একটা মানুষের পরিচয় খুঁজতে বেরিয়ে এসেছি। আত্মপরিচয় খুঁজতে কতোদূর যেতে হবে, জানি না। ভোরের আলোয় ভিজে উঠছে আমার শরীর। প্ল্যাটফর্মের ওপর, স্টেশনের নাম বোলপুর লেখা পাথরের বড়ো স্ল্যাব্‌টার দিকে তাকিয়ে কাকলিকে মনে পড়ল। চার বছর আগে কলকাতা থেকে একবার শিলিগুড়ি ফেরার পথে কাকলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার পাশে ছিল কণাদ, কোলে কুশ। অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল কাকলি। কুশের ওপর তার নজর আটকে গিয়েছিল। আমার খবর সে কতোটা জানে, বুঝতে না পেরে আমার বুক টিপটিপ করছিল। স্কুলে আমার সহপাঠিনী ছিল সে। ভালো ছাত্রী ছিল। পড়াশোনায় প্রতিদ্বন্দ্বিনী হলেও আমার বন্ধু ছিল। আমি ফার্স্ট হতাম, কাকলি সেকেন্ড। মাধ্যমিক পর্যন্ত এই ফলাফলের নড়চড় হয়নি। আমাদের বাড়িতে দু'তিনবার সে এসেছে। আমিও বারাসতে তাদের বাড়িতে গেছি। উঁচু পদে চাকরি করতো কাকলির বাবা। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। কাকলির মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে, তার বাবা কলকাতায় বদলি হয়ে

যায়। শেষ খবর পেয়েছিলাম, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে কাকলি উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছে।

প্রায় পনেরো বছর পরে ট্রেনের কামরায় কাকলিকে দেখে চমকে গেলেও মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। স্কুল ছাড়ার পরে যার সঙ্গে দেখা হয়নি, আমার খবর রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কানাঘুষোয় কিছু শুনে থাকলেও সবটা জানে না। কাকলির কোলে টকটকে লাল রং, মাথাভর্তি চুল, ডল পুতুলের মতো শিশুটা আমার নজর কেড়েছিল। কুশের সমান বয়স হলেও দু'বছরের বাচ্চার চঞ্চলতা তার শরীরে ছিল না। হাল্‌কা নীল চোখ দুটো স্বাভাবিক নয়। শূন্য দৃষ্টি। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেও কিছু দেখছে না। আমার মনে হয়েছিল, বাচ্চার কোথাও খুঁত আছে। আমার কোল থেকে নেমে পড়তে কুশ যখন ধস্তাধস্তি করছে, কাকলির বাচ্চা নির্জীব পুতুলের মতোই মায়ের কোলে শুয়েছিল। কাকলির সঙ্গে বয়স্কা মহিলা যে তার মা, তৃপ্তি সিংহ, চিনতে পেরেছিলাম। পনেরো বছরে তিনি যেন সময়ের চেয়ে একটু বেশি বুড়ি হয়ে গিয়েছিলেন। সত্তর ভাগ সাদা হয়ে গিয়েছিল মাথার চুল। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কাকলির মায়ের অকাল বার্ধক্যের কারণ বুঝতে দেরি হয়নি। কাকলি কোথায় যাচ্ছে, কয়েক মিনিটে জেনে নিয়েছিলাম। স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে পনেরো বছর পরে দেখা হতে বাঁধভাঙা জলোচ্ছ্বাসের মতো কাকলি বকে যাচ্ছিল। এলোমেলো বকছিল না। গুছিয়ে কথা বলছিল। কথাতে বাঁধুনি ছিল, স্পষ্টতা ছিল। আমি সাবধানে কথা বললেও কাকলি ছিল খোলামেলা। নিজের জীবনের কোনো খবর সে চেপে যায়নি। রাত সাড়ে দশটায় বোলপুরে নামার আগে সে যা বলেছিল, তা এরকম।

তার বাবা পরিমল সিংহ শান্তিনিকেতনে সখ করে একটা বাড়ি কিনেছিল। জায়গাটার নাম রতনপল্লী। বাড়ির ঠিকানাও কাকলি বলেছিল। স্ত্রীর নামের সঙ্গে জুড়ে পরিমল সিংহ বাড়ির নাম রেখেছিল 'পরিতৃপ্তি'। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে বাকি জীবন সেখানে কাটানোর ইচ্ছে ছিল পরিমলের। অবসর নেওয়ার পাঁচ বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে পরিমলকে চলে যেতে হয়। তিনমাস আগের ঘটনা এটা। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমেরিকা থেকে কাকলি তড়িঘড়ি মেয়ে জিনিয়াকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সে গবেষণা করছিল। গবেষণার কাজ শেষ হওয়ার আগেই এই দুর্ঘটনা। মেয়ে জিনিয়ার বয়স যে চার, দেখে বোঝার উপায় নেই। জন্ম থেকে সেরিব্রাল পালসি, জড়বুদ্ধি। বসতে পর্যন্ত শেখেনি। কথা বলতে পারে না। তাকে দেখার কেউ নেই।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোর কর্তা কোথায়?

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কাকলি বলেছিল, নেই, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

ধক করে উঠেছিল আমার বুক। কাকলি বলেছিল, এটা আমার দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদ। পাত্র পছন্দ করে প্রথম বিয়েটা মা বাবা দিয়েছিল। হীরের টুকরো ছেলে। আমিও কিছু কয়লার ডেলা নই। তবু সেই বিয়ে দু'বছরের বেশি টিকলো না। ভাগ্য ভালো, তখন কোনো ইস্যু হয়নি। দ্বিতীয় বিয়ের পরে জিনিয়া এসেছে। জিনিয়ার বাবা স্প্যানিশ, নাম ফার্দিনান্দ। বাচ্চা হওয়ার আগে সে উধাও হয়ে যায়, এখনও তার হদিশ করতে পারিনি। ল্যাটিন আমেরিকান স্প্যানিশ ফার্দিনান্দ। তার বাড়ি ব্রেজিলে। তাকে খুঁজে আমি বার করবোই। মা, আর জিনিয়াকে রতনপল্লীর বাড়িতে রেখে আগামী হপ্তায় আমি আমেরিকা ফিরে যাচ্ছি। দু'মাস ধরে রতনপল্লীর বাড়ি সাজিয়েছি। জিনিয়াকে দেখাশোনা করার জন্যে আয়া জোগাড় করেছি। আমেরিকা থেকে মাসে যা টাকা পাঠাবো, আয়ার মাইনে, জিনিয়ার ভরণপোষণ, তা দিয়ে হয়ে

যাবে। বাবার পেনশনের টাকা মা পেলেও, আমার ধারণা, আমার টাকাতে মায়ের সংসারও চলে যাবে।

গলা নামিয়ে কাকলি বলল, মাকে সেকথা বলিনি। মা দারুণ অভিমানী। কোন কথার কী মানে করবে, বলা মুশকিল।

আমি বলেছিলাম, বাচ্চাকে নিজের কাছে রাখলে পারতিস।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কাকলি বলেছিল, গবেষণা শেষ করে জিনিয়াকে নিয়ে যাবো। আরো বছরখানেক লাগবে।

সামান্য ভেবে বলেছিল, আমেরিকার পাট তুলে দিয়ে পাকাপাকি এখানে চলে আসার চিন্তাও মাথায় আছে। কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজ পেলে ফিরতে অসুবিধে নেই। চিঠি লেখালিখি করছি। দেখা যাক, কি হয়!

বোলপুর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছোলো রাত এগারোটায়। কামরা থেকে নামার আগে কাকলি ফিসফিস করে বলেছিল, সুখে আছিস তুই, দেখে বুঝতে পারছি। হিংসে হচ্ছে।

কথাটা বলে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ভীষণ ভালো লাগছে। পারলে. রতনপল্লীতে আমাদের বাড়িতে একবার আসিস। মা তো থাকবেই। বাড়ির নাম, পরিতৃপ্তি। পরিমলের 'পরি' আর মা 'তৃপ্তি', ভোলার উপায় নেই।

বোলপুর স্টেশনে পাঁচ মিনিট দাঁড়ালো দার্জিলিং মেল। ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। তারপর জড়বুদ্ধি জিনিয়াকে ভিজে কাপড়ের মতো কাঁধে ফেলে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মালপত্র নিয়ে সামনে ছিল কুলি।

চার বছর পরে শিশিরে ভেজা ভোরের বোলপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে আমার মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে থাকল। কাকলিব ডাক শুনতে পেলাম। কাকলি বলেছিল, রতনপল্লীতে তাদের বাড়িতে যেতে। বাড়ির নাম, পরিতৃপ্তি।

ভাবার সময় ছিল না। ট্রেন ছাড়ার প্রথম বাঁশি বেজে যেতে খানিকটা নেশাচ্ছন্নের মতো মাঝারি সাইজের সুটকেসটা হাতে নিয়ে আমি কামরা থেকে নেমে পড়লাম। দু'একজন সহযাত্রী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। নিচু গলায় কিছু বলল কেউ। কোনোদিকে আমার খেয়াল ছিল না। কোনো মন্তব্য কানে ঢুকল না। আমার মনে হচ্ছিল, সরাসরি কলকাতা যাওয়ার চেয়ে বোলপুরে কয়েকদিন থেকে যাওয়া ভালো। খারাপ হওয়ার মতো আমার কিছু নেই। বোলপুরের একটা ঠিকানা, রতনপল্লীর 'পরিতৃপ্তি' নামে বাড়িটা না চিনলেও আমি জানি। কাকলি, এই মুহূর্তে সেখানে না থাকলেও তার মা তৃপ্তি সিংহ থাকবে। কাকলির মেয়ে জিনিয়াও সম্ভবত সেখানে আছে। কেউ না থাকলে কোনো একটা হোটেলে দু'রাত কাটিয়ে কলকাতায় ফিরবো। কোথাও পৌঁছোনোর তাড়া নেই আমার। আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে বসে নেই। স্টেশনের বাইরে একটা সাইকেল রিক্শয় উঠে রতনপল্লীর ঠিকানা বললাম। রিকশাচালক দ্বিতীয়বার ঠিকানা জিজ্ঞেস করল না। তিনচাকা গাড়িটা হাঁসেব মতো উড়ে চলল। রাস্তায় রিক্শর লাইন। বেশিরভাগ সওয়ারি যে দার্জিলিং মেল থেকে নেমেছে, রিক্শয় মোটঘাটের বোঝা দেখে ধরা যায়। রাস্তার দু'ধারে অল্প কিছু দোকান খুলেছে। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিশিরে ভেজা মাটির গন্ধ পেলাম। আমি ভাবছিলাম, রতনপল্লির বাড়িতে তালা লাগানো থাকলে আমি কোথায় যাবো? হোটেলে না ঢুকে উপায় নেই। সেখানে খাতায় নাম, ঠিকানা লিখতে হবে। কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাবো, হোটেলের রিসেপশনে জানাতে

হয়। কি নাম লিখবো, কোন ঠিকানা জানাবো? আমার নতুন পরিচয় আজ থেকে নিজেকে বানাতে হবে। কী হতে পারে আমার নতুন নাম? মালবিকা, নুপুর, সুপ্রিয়া নামগুলো যারা দিয়েছিল, তাদের কেউ আজ আমার পাশে নেই। আমাকেই করতে হবে নিজের নামাকরণ। করবো। মাথার মধ্যে কতো নাম যে কিলবিল করছে, হিসেব নেই। রতনপল্লীর বাড়ির দরজা খোলা থাকলে এখনই নতুন নামের দরকার নেই। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা, দু'দিনও সময় পাওয়া যেতে পারে। রিকশাচালক বাঁদিকের একটা রাস্তায় ঢুকে বলল, রতনপল্লি। একটু এগিয়ে আপনার সেই বাড়ি।

বাড়িটার নাম বলতে গিয়ে, কিছু ভেবে সে চুপ করে গেল। নিঝুম রতনপল্লি। মাথায় সুতি কাপড়ের টুপি পরে। বয়স্ক একজন মানুষ প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছে। সাইকেল রিকশা দেখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে গেল। খানিকটা এগিয়ে একতলা যে বাড়ির সামনে রিকশা দাঁড়ালো, তার সদর দরজার ডানদিকে দেওয়ালে 'পরিতৃপ্তি' লেখা পাথরের ফলকটা জ্বলজ্বল করছে। দু'পাল্লা কাঠের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কাঠের দরজার বাইরে লোহার কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটেও তালা লাগানো রয়েছে। দুটো দরজা পরপর বন্ধ দেখে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠলেও গ্রিল লাগানো বারান্দায় স্টিলের হ্যাঙ্গারে ছোট মাপের দুটো ফ্রক শুকোতে দেখে ভরসা পেলাম। বাড়িতে মানুষ আছে। ফ্রক্‌জোড়া জিনিয়ার। হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, কাকালরি সঙ্গে দেখা হবে। আমেরিকা থেকে মেয়েকে দেখতে কাকলি হযতো দেশে এসেছে। সে এখন এ বাড়িতে আছে। রিকশাচালককে ভাড়া মিটিয়ে বন্ধ সদর দরজাব সামনে দাঁড়ালাম। কোলাপসিবল্‌ গেটের পেছনে কাঠের দরজার ফ্রেমে ডোরবেলের খয়েরি বোতাম। বোতাম টিপলাম। একবারই টিপলাম। ভেতরে মোলায়েম বাজনা শোনা গেল। বাড়ির ভেতরে চাপা গলায় কেউ কথা বলল। চটির আওয়াজ শুনলাম। কাঠের সদর দরজার একটা পাল্লা খুলে ঘুমজড়ানো যে মুখটা দেখা গেল, রিক্‌শ থেকে সেটাই প্রথমে দেখতে চেয়েছিলাম। বন্ধ কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের পেছনে কাকলি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে উবে গেছে তার দু'চোখের ঘুম। কাঠের দুটো পাল্লা খুলে কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল, মালবিকা, তুই?

হাতের চাবির গোছা থেকে একটা বেছে নিয়ে গেটের তালা খুলে আমাকে বলল, আয়। কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের বেড়া টেনে সরিয়ে দিল। সুটকেস নিয়ে আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। সদরের চাতাল ছেড়ে বাঁদিকে ঘুরে দেখলাম, মাঝবয়সি এক মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখিয়ে কাকলি বলল, সবিতা। জিনিয়াকে দেখাশোনা করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাসিমা কোথায়?

নেই।

আমার মুখে অবাক ভাব লক্ষ করে কাকলি বলল, বাবা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে কলকাতায় এসে, ট্রেনে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আবার দেখা হলো মা মারা যাওয়ার পরে। দু'মাস হলো মা চলে গেছে। মায়ের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পাঁচ দিন পরে আমি এখানে এসেছি। মায়ের শেষকাজ আত্মীয়স্বজন করেছিল। আমেরিকা থেকে টেলিফোনে আমি তাই বলেছিলাম।

কাকলির শোয়ার ঘরে খাটে বসে, তার খবরাখবর শুনছিলাম। দু'কাপ চা বানিয়ে সবিতা ঘরে দিয়ে গেল। সবিতা চলে যেতে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কাকলি জিজ্ঞেস করল, তোর কি খবর? বাড়ির সকলে কেমন আছে?

আমি স্থির চোখে তাকালাম কাকলির দিকে। আমার চোখে চোখ রেখে কাকলি কিছু বুঝে বলল, এখন থাক। পরে শুনবো। জিনিয়া বোধহয় ঘুম থেকে উঠেছে। তার কাছে একবার যাই। তুই বরং হাত মুখ ধুয়ে নে। চল তোকে চানঘর দেখিয়ে দিই।

আমি বললাম, জিনিয়াকে দেখে, তারপর যা করার করবো।

আমার কথা শুনে কাকলি খুশি হলো। হাসি মুখে তাকালো আমার দিকে। কাকলির সঙ্গে জিনিয়ার ঘরে গিয়ে তাকে দেখলাম। চার বছর আগে, চার বছর বয়সি যে জড়বুদ্ধি শিশুকে দেখেছিলাম, চারবছর পরে সে বিশেষ বদলায়নি। চার বছরের সেই জিনিয়া, আট বছরেও ডল-পুতুলের মতো রয়েছে। কাটির মতো সরু হাত পা, তুলনায় মাথাটা বড়ো, দুচোখে শূন্য দৃষ্টি। বালিশে ঠেস দিয়ে তাকে বসিয়ে দিয়েছিল সবিতা। আমার পাশে নিজের মাকে দেখেও তার চোখে কোনো অভিব্যক্তি জাগলো না। কাকলি শোনাচ্ছিল জিনিয়ার নিরাময়েব বিবরণ। কতো তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে উঠছে সে। 'মা' বলতে পারে। মনে আনন্দ হলে 'মা' বলে ডাকে। এরকম আরো কথা।

আমি শুনছিলাম। কাকলির জন্যে যতো কষ্ট হচ্ছিল তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছিলাম জিনিয়াকে দেখে। আট বছবেব মেয়েটা, মেধার বিচারে আট মাসের শিশুর চেয়ে পেছিয়ে রয়েছে। কোনোদিন যে জিনিয়া স্বাভাবিক হবে, আমার মনে হলো না। মুখে কিছু বললাম না। মেয়ের শারীরিক উন্নতি নিয়ে কাকলির মতামত শুনে অবাক হয়েছিলাম। কাকলির মতো আমেরিকাবাসিনী উচ্চশিক্ষিতা মা, কীভাবে নিজের জড়বুদ্ধি মেয়েকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখছে, বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হলো, অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে সে কোনো স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নটা অবাস্তব জেনেও দেখছে। না দেখলেও দেখার ভান করছে। কেন করছে, আমি বুঝতে পারলাম না। বোঝার ইচ্ছে আমার ছিল না। জীবনের বত্রিশটা বছর পার করে যে মেয়ে নিজের পরিচয় খুঁজে পায়নি, অন্যের ঝামেলায় কেন সে নাক গলাবে?

কাকলির সমস্যা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম। কাকলির বিকলাঙ্গ জড়বুদ্ধি মেয়ে কতোটা সেরে উঠেছে, এ নিয়ে আমি কেন ভাববো? নিজের ঘায়ে আমি অস্থির। আমাকে বাঁচতে হবে। চানঘরে গিয়ে স্নান সেরে পোশাক বদলে কাকলির ঘরে ফিরলাম। আমাকে বিশ্রাম করতে বলে কাকলি বাজার করতে গেল। কাকলির বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে কখন ঘুমে দু'চোখ বুজে গেছে, খেয়াল নেই। দুপুরে কাকলি খেতে ডাকতে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। পাশাপাশি বসে দু'জন খেলাম। তখনো কাকলি আমাকে কোনো প্রশ্ন করল না।

প্রায় চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে আমার শরীরের ক্লান্তি চলে গেছে। হালকা লাগছে মাথাটা। হেঁসেলের কাজে যতোটা পারি কাকলিকে সাহায্য করলাম। কাজ শেষ করে মাঝদুপুরে কাকলির সঙ্গে ছাতে গেলাম। হেমন্তের রোদে ঝলমল করছে একতলা বাড়ির ছাত। বাড়ির পশ্চিম দিকে ছাতিম গাছ ফুলে ভরে আছে। বাতাসে ছাতিম ফুলের গন্ধ। মাদুর পেতে মুখোমুখি দু'জন বসলাম। ছাতের চারপাশে উঁচিয়ে থাকা কয়েকটা লোহার শিক দেখিয়ে কাকলি বলল, বাবার ইচ্ছে ছিল, এখানে থাকা শুরু করে দোতলা তুলবে। সেভাবে বাড়ির ভিত তৈরি করেছিল।

ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কাকলি বলল, বাবা বোধহয় আমার জন্যে ভেবে ভেবে মারা গেল। মা-ও হয়তো তাই। তাদের একমাত্র মেয়ের জন্যে তাদের পছন্দের বরটা যে হিজড়ে, তারা জানতো না। জানা সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম

কজন ছাত্র, তার মা, বাবা, সকলে একসঙ্গে মিলে যে প্রতারণা করতে পারে, আমার মা, বাবা জানতো না। তারা কল্পনা করতে পারেনি। প্রথম বিয়ে ছ'মাসের মধ্যে বাতিল হয়ে যেতে আমি কমন ক্ষেপে গেলাম। আমার অহমিকায় ঘা লেগেছিল। দারুণ রকম অপমানিত হয়েছিলাম। যেন তেন প্রকারে একটা বর ধরতে চাইছিলাম। আমেরিকার কলম্বিয়ায় স্প্যানিশভাষীরা সংখ্যায় বেশি। সুপুরুষ এক স্প্যানিশ ছেলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয় হলো। তার নাম ফার্দিনান্দ। ফার্দিনান্দ জানালো সে ব্যবসায়ী। আমি বিশ্বাস করলাম। বার কয়েক দেখা থেকে প্রেম হলো, পেটে বাচ্চা এলো, তারপর বিয়ে। বিয়েতে ফার্দিনান্দকে রাজি করাতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। বাচ্চা চায়নি সে। জিনিয়ার জন্মের কয়েকদিন আগে ব্যবসার কাজে ইটালি গিয়ে আর ফিরল না। খোঁজাখুঁজি শুরু করে আমি জানলাম, চাকরির সূত্রে দু'বছরের ভিসাতে সে আমেরিকায় ঢুকেছিল। ভিসার মেয়াদ শেষ হতে আমেবিকা ছেড়ে চলে গেছে। তার আসল ঠিকানা স্পেন, ব্রাজিল অথবা গুয়েতেমালা, যে কোনো দেশ হতে পাবে। তার বন্ধু, পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, তাকে ভালোরকম কেউই চিনত না। তার সঙ্গে তাদের নিছক পরিচয় ছিল। মুখে না বলেও তারা বোঝাতে চেয়েছিল, অজ্ঞাতকুলশীল ফার্দিনান্দ, জোচ্চোর হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

একটানা কথা বলে চুপ করল কাকলি। দুপুরের রোদ এসে পড়েছে মাদুরে। আমার বেশ আরাম লাগছিল। কাকলি বলল, আর কিছু শুনতে চাস?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কাকলি বলল, আমার জীবনের ঘটনা শুনলে, তোকেও যে তোর হাঁড়ির খবর বলতে হবে, এমন নয়। গল্প করে সময় কাটানোর জন্যে আমি কথা বলছি।

আমি বললাম, আমার কাহিনী তোর থেকে আলাদা। তুই শুনলে, ভয় পাবি। অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারিস।

মুচকি হেসে কাকলি বলল, আমেরিকায় দশ বছর থাকলে অবাক হওয়ার মতো সব ঘটনা জানা হয়ে যায়। চিরকালের মতো লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, মন থেকে ভ্যানিশ্ হয়ে যায়।

এক সেকেন্ড থেমে কাকলি বলল, কোনো কিছুতে এখন চমকাইনা।

কাকলির মুখের দিকে তাকিয়ে টের পেলাম, তার মনে কোনো প্যাঁচ নেই। সে মিথ্যে বলছে না। আমি শোনালাম তাকে আমার জীবনকাহিনী। কেটে ছেঁটে বললেও কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। চতুর্থ পরিচয়ের খোঁজে, কণাদ লাহিড়ির সংসার ছেড়ে চলে আসার অধ্যায়ে পৌঁছোতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামল। মাদুরের ওপর থেকে রোদ সরে গেছে। ছাতে কোথাও রোদ নেই। ছাতিম গাছের মাথায় জমাট বেঁধে রয়েছে শেষ বিকেলের আলো। পৃথিবীতে ছায়া বাড়ার সঙ্গে ছাতিম ফুলের গন্ধ ঘন হচ্ছে। ছাতিম গাছের দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি। আমার মুখের ওপর চোখ রেখে বসে রয়েছে কাকলি। আমার বিবরণ শুনে সে পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে গেছে। নানা রকম পাখি, রাত নামার আগে শেষবারের মতো ডাকাডাকি করছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে নিজের জায়গা থেকে সামান্য এগিয়ে, আমার গা ঘেঁষে বসে কাকলি বলল, তোকে বলতে লজ্জা নেই, আমি আবার প্রেমে পড়েছি।

অবাক করার মতো খবর না হলেও কাকলির কথা শুনে তার মুখের দিকে তাকালাম। কাকলি বলল, এবার যাকে ভালোবেসেছি, তার নাম অ্যান্ড্রু, সে ইংরেজ, লন্ডনে থাকে, চাকরি করে। বয়স, প্রায় পঞ্চাশ তার বৌ ছেলে মেয়ে সংসার আছে। কিন্তু আমার জন্যে সে পাগল।

আমাকে বিয়ে করার জন্যে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাকে ডিভোর্সে রাজি করিয়েছে। লন্ড কেনসিংটন গার্ডেন্সের বাড়ি আর পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিচ্ছে স্ত্রীকে। তাছাড়া মাসে তা দেবে দু'হাজার পাউন্ড। আমাকে বিয়ের পরে জিনিয়ার চিকিৎসার ভার নেবে অ্যান্ড্রু। লন্ডনে বারবেক্ কলেজে আমার জন্যে একটা টিউটরের চাকরি, অ্যান্ড্রু জোগাড় করেছে। টিউটরে চেয়ে উঁচু পদের চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অবশ্য আমার আছে। চাকরি বড়ো কথা নয়। আমি এখন আমেরিকার সিটিজেন্। আমেরিকান পাশপোর্ট পেয়েছি। পৃথিবীর যে কোনো দে থাকতে পারি, চাকরি করতে পারি। তবে আমার মতে ভারতীয়দের বাস করার সবচেয়ে ভাল জায়গা ইংল্যান্ড। দেশের বাইরে শুধু ইংল্যান্ডে থাকা যায়। অ্যান্ড্রুর সঙ্গে পরিচয়ের পরে নতু করে টের পাচ্ছি, বর হিসেবে ইংরেজ পুরুষ সেরা।

কবে বিয়ে করছিস?

আমি প্রশ্ন করতে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কাকলি বলল, বিয়েটা সম্ভবত হবে না

কেন?

অসুস্থ জিনিয়ার বোঝা অ্যান্ড্রুর ঘাড়ে চাপাতে চাই না।

জিনিয়া তো সেরে উঠছে।

সকালে কাকলি কথাটা বলেছিল। তার জের টেনে কয়েক ঘণ্টা পরে আমি একই কথ বলতে কাকলি বলল, সবিতাকে শোনাতে জিনিয়ার সেরে ওঠার গল্প, আমি মাঝে মাঝে বলি না বললে, সবিতা পালাবে, যখন তখন মাইনে বাড়াতে চাপ দেবে। থাকা খাওয়া ছাড়া মাসে দেড় হাজার টাকা পায়। তবু সে খুশি নয়। আড়াই হাজার টাকা মাইনে চায়। তাই দিতে হবে আমার উপায় নেই। তবু আমার ইংল্যান্ডে যাওয়া হবে না।

কেন?

সবিতার ওপর জিনিয়াকে রেখে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারি না।

আমি আর কথা বললাম না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরতে থাকল। ছাতের দরজার কাছে গিয়ে সবিতাকে দু'কাপ চা করে দিতে বলল কাকলি। আকাশে আলো কমে গেছে। রাত নামছে পৃথিবীতে। মাদুরের ওপর আমার গা ঘেঁষে কাকলি আবার বসল। আমি বললাম, তুই বিলেতে ফিরে যা, বিয়ে কর অ্যান্ড্রুকে। জিনিয়াকে আমি সামলাবো।

আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে কাকলি বিড়বিড় করল, কী বলছিস তুই?

বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে।

কেন?

আমার বোঝা তুই কেন বইবি?

আমি চুপ করে থাকলাম। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। দু'কাপ চা রেখে সবিতা চলে যেতে কাকলিকে বললাম, বোঝা নয়। জিনিয়া আমার মেয়ে। তাকে আমি দত্তক নেবো। শর্ত একটাই, কাগজে কলমে তোকে চুক্তি করে জিনিয়াকে আমার হাতে তুলে দিতে হবে।

জিনিয়ার জন্যে মাসে কতো খরচ হয়, তুই জানিস?

না।

ধারণা করতে পারিস?

না।

পাঁচ হাজার টাকার কম নয়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কাকলি বলল, পাঁচ হাজার, শুধু জিনিয়ার খরচ। তারপর আছে সবিতার মাইনে, সংসার খরচ, সব মিলে মাসে বারো হাজার টাকার কম নয়। চালাতে পারবি?

আমি বললাম—না।

ঠোঁট টিপে হেসে কাকলি বলল, তুই 'না' বলবি জেনেও হিসেবটা তোকে শোনালাম।

কেন শোনালি?

অসুস্থ মেয়েকে দত্তক নেওয়া যে কতো কঠিন, সেটা জানিয়ে দিলাম।

কেন?

আমার দু কাঁধের ওপর দু'হাত রেখে কাকলি বলল, তুই একদম আগের মতো থেকে গেলি। সব কথাতে 'কেন' জিজ্ঞেস করা তোকে ছাড়লো না।

আমি হাসলাম। কাকলি বলল, তোর প্রস্তাব নিয়ে আমি ভাবছি। আমারও কিছু শর্ত আছে।

কিরকম?

লেখাপড়া করে জিনিয়াকে তখনই তোর হাতে তুলে দেবো, যদি জিনিয়ার সঙ্গে আরো কিছু জিনিস নিতে তুই রাজি থাকিস।

যেমন?

সবরকম খরচ বাবদ মাসে পনেবো হাজার টাকা নিতে হবে। শান্তিনিকেতনের এই বাড়ি জিনিয়াব নামে করে দেবো। জরুরি দরকারের জন্যে জিনিয়া আর তোর নামে ব্যাঙ্কে এক লাখ টাকার ফিক্স্ড্ ডিপোজিট্ থাকবে। বাড়ি, টাকা নিয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তোর থাকবে। জিনিয়ার কোনো ব্যাপারে আমি নাক গলাবো না।

পাকা আইনজীবীর মতো কাকলি তার শর্তগুলো বলে যাওযার পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার হাতে জিনিয়াকে তুই তুলে দিবি। তার নাম কি?

সামান্য থতমত খেয়ে কাকলি বলল, মালবিকা দত্ত নামে যার সঙ্গে স্কুলে পড়তাম, তার হাতে জিনিয়ার ভার দেবো। চুক্তি করবো তার সঙ্গে।

মালবিকা দত্ত বেঁচে নেই।

আমার কথা শুনে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কাকলি বলল, তুই কি চাইছিস?

নতুন নামে আমি জীবন শুরু করতে চাই। সেটা হবে আমার চতুর্থ পরিচয়।

আমার পিঠের ওপর হাত রেখে কাকলি বলল, তুই যেভাবে বলবি, তাই হবে।

কাকলির হাতের ওপর আমি হাত রাখলাম। গাছপালার মাথা থেকে পাতলা অন্ধকার মাটির দিকে নেমে আসছে। একটা কবে তারা জেগে উঠছে আকাশে। কাকলি বলল, কালই একজন চেনা আইনজীবীর কাছে যাবো। তোর নতুন নামে চুক্তিপত্র বানাতে বলবো। নামটা ভেবে রাখিস।

ফাঁকা অন্ধকার ছাতে আমরা দুই বন্ধু চুপ করে বসে আছি। কাকলি জিজ্ঞেস করল, তোর কি মনে হয়, অ্যান্ড্রুকে বিয়ে করে আমি সুখি হবো?

কথা না বলে আমি হাতের ছোঁয়ায় আশ্বস্ত করলাম কাকলিকে। কাকলি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, জিনিয়াকে যদি কখনো দেখতে ইচ্ছে হয়, দেখতে দিবি তো?

কাকলির কথা থামাতে তার ঠোঁটের ওপর আলতো করে হাতের পাতা রেখে বললাম,

জিনিয়া তোর-ই মেয়ে। যখন খুশি দেখতে আসবি। জিনিয়াকে তুই ফেরত চাইলেও আমি 'না' বলবো না।

ছাতের ওপর রাতের অন্ধকার জমছে। রতনপল্লির রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট থাকলে এতোক্ষণে সেগুলো জ্বলে ওঠার কথা। নিশ্চয়ই জ্বলেছে। তা না হলে রাস্তার দিক থেকে ছিটেফোঁটা আলো ছাতে আসছে কীভাবে? কাকলি বলল, তাহলে, ওই কথা রইলো।

কোন কথা?

কাল কলকাতায় উকিলের বাড়ি গিয়ে যেভাবে বললাম, সেভাবে দলিল বানিয়ে নেবো।

এক মুহূর্ত থেমে কাকলি বলল, উকিল সদানন্দ গুপ্ত, বাবার বন্ধু। সবচেয়ে ভালো পরামর্শই আমাদের দেবেন।

কথা শেষ করে কাকলি বলল, চল্ নিচে যাই। হিম পড়ছে।

মাদুর গুটিয়ে কাকলি ছাতের ঘরে রাখার পরে দু'জনে একসঙ্গে নিচে এলাম। কাকলি ঢুকলো জিনিয়ার ঘরে। বালিশে হেলান দিয়ে তাকে বসিয়ে রেখেছে সবিতা। পুতুলের মতো সে বসে আছে। দু'চোখ খোলা। আমরা ঘরে ঢুকলেও সে তাকালো না। আমার সোনামণি আমার জিনিয়ারানি এবং আরো নানা আদরের কথা বলে, হাত মুখ নেড়ে তার নজর আকর্ষণ করতে চাইছে কাকলি। তার দিকে শেষ পর্যন্ত জিনিয়া তাকালেও, সে তাকানোতে আনন্দ শোক, রাগ, অভিমান, ভালোবাসা নেই। পাথরের দুটো চোখ মুখোমুখি একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছে। জিনিয়ার মাথায়, কপালে চুমু খেয়ে কাকলি যখন ঘর থেকে বেরলো, তার দু'চোখে জল। হাতের পাতায় তার চোখের জল মোছা, আমার নজর এড়ালো না। কাকলির পিঠে আমি হাত রাখলাম।

চতুর্থ পরিচয়, কী তোমার নাম

রাতের খাওয়া ন'টায় সেরে তারপর এক, দেড় ঘণ্টা কাকলির সঙ্গে গল্প করে, তার বাড়ির গেস্টরুমে পরিষ্কার সাদা চাদর পাতা নরম বিছানায় শুয়েও আমার ঘুম আসছে না। খাওয়ার পরে গল্প করার মাঝখানে, জিনিয়া সম্পর্কে কাকলি যে কথাটা বলেছিল, তা শুনে আমার বুক কেঁপে গেছে। কাঁপুনি কমলেও একেবারে ছেড়ে যায়নি। কাকলি বলেছিল, দেশ বিদেশের অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জিনিয়াকে দেখেছে। তার চিকিৎসা করেছে। প্রথমে সুস্থ করে দেওয়ার কথা বললেও কয়েকবার যাতায়াত করার পরে জানিয়েছে, এ ধরনের শিশু, আঠারো, কুড়ি বছরের বেশি বাঁচে না।

স্বাভাবিক গলায় কাকলি কথা বললেও আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছিল। বে-ফাঁস কথাটা বলে কাকলি টের পেয়েছিল, ভুল করে ফেলেছে। তবু সে কথা ঘোরাতে চেষ্টা করল না। বলল, ডাক্তাররা বলার পরে রোগটা নিয়ে কিছু বইপত্র দেখেছি। ইন্টারনেটে খোঁজ করেছি। সেরিব্রাল পালসি নিয়ে এখনো শুধু দুটো নাম পেয়েছি, যাদের একজন পঁচিশ, অন্যজন সাড়ে তেইশ বছর বেঁচেছিল। সত্তরভাগ মারা গেছে, বারো থেকে পনেরো বছর বয়সে।

কাকলির বিছানায় বসে তার কথা আমি শুনছিলাম। ন'টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে শান্তিনিকেতন। রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল সাইকেল রিকশার ভেঁপু। কাকলি বলল, আমি যতোটা জানি, তোকে জানিয়ে দিতে চাই।

আমি বললাম তাহলে উকিলের বাড়ি যাওয়া, দলিল লেখানো, এতোসব কি দরকার?

দরকার আছে। খাতাপত্রের হিসেব দেখে জীবন চলে না। আমি যা জানি, বলা ভালো, ডাক্তাররা যা জানে, তার চেয়ে জীবন অনেক বড়ো। জিনিয়া অনেক, অনেক বছর বেঁচে থাকবে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কাকলি বলল, তারপর যদি কিছু ঘটে, আমরা সামলাবো।

আমি কথা বাড়ালাম না। বুঝতে পারছিলাম, আমার ওপর এক বিশাল দায়িত্ব চেপে বসেছে। অসুস্থ জিনিয়াকে শুধু নীরোগ করা নয়। তাকে পঁচিশ বছরের বেশি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পারবো কি? বিছানায় শোয়ার পর থেকে প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে মাথায় আসছে। পারতেই হবে। সেটাই হবে আমার চতুর্থ আত্মপরিচয়। তার আগে চাই নতুন একটা নাম। কাকলির সঙ্গে কাল আইনজীবীর কাছে পৌঁছোনোর আগে নামটা ভেবে রাখতে হবে। কী হতে পারে সেই নাম? কাল সকালে ভাববো।

জীবনে চতুর্থবার, নিজের মতো করে বাঁচার আগে এই রাতটা আমি ভালো করে ঘুমোতে চাই। অসুস্থ এক শিশুকে অনেক বছর বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাকে। আমার নিজের সন্তান, কুশের সমান আয়ু আর তার মতো স্বাস্থ্য, জিনিয়াকে দিতে না পারলে আমার চতুর্থ পরিচয় বৃথা হয়ে যাবে। তা হতে দেবো না। পিতৃপরিচয়হীন, জড়বুদ্ধি জিনিয়া, বাঁচিয়ে দেবে আমাকে।

ভেতরটা শান্ত হয়ে আসতে আমি দু'চোখ বুজলাম।

হজমশক্তি

স্বদেশের কিছু হজম হচ্ছে না। অথচ এক সময়ে রীতিমতো পেটুক ছিল সে। প্রচুর খেতে পারত, এবং যা খেত হজম হয়ে যেত। পেটের গোলমাল, বদহজম কখনও ছিল না তার। গত, তিন, সাড়ে তিন বছরে সেই স্বদেশ অম্বল, চোঁয়াঢেকুর, পেটের অসুখে আধখানা হয়ে গেছে। ডাক্তার, ওষুধ কাজ করেনি। এক্সরে, বেরিয়াম-এক্সরে, সোনোগ্রাফ করেও পেটে কিছু পাওয়া যায়নি। কলকাতার নামী, দামি ডাক্তাররা তার চিকিৎসায় ফেল মেরে গেছে। হাল ছেড়ে দিয়ে তারা বলেছে, এ আপনার ক্রনিক ব্যামো। প্রাণে মারবে না, তবে জ্বালাবে। আধমরা করে রাখবে সারাজীবন। ধরাকাটে থাকবেন।

চিকিৎসার জন্যে জলের মতো টাকা খরচ হয়েছে তার। নিরাময় হয়নি। ভুগতে হবে জেনে রোগের সঙ্গে আপস করেছে সে। মেনে নিয়েছে রোগকে। বাধ্য হয়েই মেনেছে। কিছু করার ছিল না তার। মুখে না বললেও ভারতীর ধারণা তার স্বামীকে রোগ নয়, রোগের বাতিকে ধরেছে। এ হলো বয়স বাড়ার লক্ষণ। স্বদেশের পেশাও এ বাতিকের জন্যে কিছুটা দায়ি। কলেজে পড়ায় স্বদেশ। বছরে ছ-মাস ছুটি। একজন সবল, সুস্থ বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ বছরের পুরুষ মানুষ বাড়িতে ছ-মাস শুয়ে থাকতে বাধ্য হলে, রোগের বাতিক ধরতেই পারে তাকে। বালিকা বয়সে, বাড়িতেও এ ঘটনা দেখেছে ভারতী। তার বাবা ননীগোপাল ঘোষও ছিল কলেজের মাস্টার। মধ্যচল্লিশে ননীগোপালকেও ধরেছিল এ বাতিক। তবে কাবু করতে পারেনি। ছ-মাস, এক বছরে ধাক্কা সামলে নিয়েছিল ননীগোপাল। স্বামীকে চাঙ্গা করতে বাবার কাহিনী বারবার শুনিয়েছে ভারতী। ফল হয়নি। তবু এখনও সুযোগ পেলে শোনায়। স্বদেশ শোনে। মাঝে মাঝে চটে গিয়ে বলে, ননীগোপালবাবুর রোগটা ছিল বাতিক, আমারটা খাঁটি।

তর্ক করে না ভারতী। গুম হয়ে বিরক্তি গিলে নেয়। ভারতীর যখন কুড়ি, বিয়ে হয়েছিল তার। স্বদেশ তখন সাতাশ, আটাশের যুবক। দেখে মনে হত, আরও কম। চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। ফর্সা রঙ, একমাথা ঘন কালো চুল, ছিপছিপে শরীর, রীতিমতো সুপুরুষ ছিল সে। রাস্তায় স্বামীর সঙ্গে হাঁটতে দেমাকে ফুলে উঠত ভারতীর বুক। তবে চিরকালই স্বদেশ স্বল্পভাষী, গম্ভীর। বিয়ের পনের বছর পরেও তাকে স্পষ্ট বুঝতে পারে না ভারতী। কথা কম বললেও তেজি, তাজা, প্রাণোচ্ছল ছিল স্বদেশ। খেতে ভালবাসত। ভালমন্দ রেঁধে তাকে খাইয়ে আরাম পেত ভারতী। ছুটির দিনে আজও সে পাঁচরকম রাঁধে। স্বদেশ খায় না। ছেলে, মেয়ে খায়।

কাঁচকলা, পেঁপে দিয়ে শিঙি মাছের হলুদ ঝোল, আধগলা ভাত টেবিলে নিয়ে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছে ভারতী। স্নান সেরে পোশাক পরছে স্বদেশ। খেয়েদেয়ে এখনই বেরতে হবে তাকে। দু'কামরার ফ্ল্যাট। মাঝখানে চৌকো দালানে পার্টিশন লাগিয়ে বসার ঘর, খাবার ব্যবস্থা। বার বছরের ববি, দশের রুমি, তাদের ঘরে বসে লেখাপড়া করছে। একই সঙ্গে চাপা গলায় চলছে তাদের ঝগড়া, খুনসুটি। ছেলে, মেয়ের কথা স্বদেশ, ভারতী, দুজনেরই কানে যাচ্ছে। স্কুল, কলেজে গরমের ছুটি চলছে। ভারতীর তাই কোনও তাড়া নেই। তবে স্বদেশ আজ সকাল সকাল বেরবে শুনে, তার জন্যে ন'টার মধ্যে ভাত, মাছের ঝোল রেঁধে ভারতী তৈরি। রান্না না ছাই! এটুকু বানাতে আধঘন্টার বেশি সময় লাগেনি তার।

সামান্য ভাত, মাছের ঝোল ফেলাছড়া করে খেয়ে উঠে পড়ল স্বদেশ। দু-টুকরো মাছের একটাও ছুঁল না। ভারতী চাপাচাপি করতে স্বদেশ বলল, ডায়মন্ডহারবার থেকে গঙ্গা পেরিয়ে আরও তিন মাইল ভেতরে যেতে হবে। কম দূর নয়। অম্বল টম্বল হলে বিপদে পড়ে যাব।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল ভারতী। তিন বছরে বুড়োটে মেরে গেছে লোকটা। অর্ধেক চুল উঠে মাথার সামনে টাক পড়েছে। কালো হয়ে গেছে গায়ের রঙ। চার বছর আগের বুশশার্ট ঢলঢল করছে শরীরে। বেলা সওয়া ন-টা। বাইরে শেষ বৈশাখের চড়া রোদ। এ মরশুমে কালবোশেখির ঝড়, বৃষ্টি না হওয়ায় আগুনের হল্কা বইছে বাতাসে। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে পাজামা, পাঞ্জাবি, জলের জ্যারিকেন নিয়ে বাড়ি থেকে স্বদেশ বেরবার আগে তার সামনে ববি, রুমি এসে দাঁড়াল। ছেলে মেয়ের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে স্বদেশ প্রশ্ন করল, ঝগড়া মিটেছে?

ভাইবোনে চোখাচোখি হলো। ফিক করে হেসে ফেলল রুমি। ববি এ বছর ক্লাস সেভেনে আর রুমি ক্লাস ফাইভে উঠেছে। দুজনেব কেউই লেখাপড়ায় খারাপ নয়। ক্লাসে প্রথম পাঁচজনের মধ্যে থাকে। ভারতীর অভিযোগ, স্বদেশ একটু নজর দিলে লেখাপড়ায় আরও ভাল করত দুজন। কথাটা ভুল নয়। ছেলেমেয়েকে পড়াতে সময় পায় না স্বদেশ। কলেজে পড়িয়ে বাড়ি ফিরে আবার মাস্টারি করতে ইচ্ছে হয় না তার। তাছাড়া শরীর এমন বেজুত হলে কোনও কাজে উৎসাহ আসে? আসে না। ফলে বাড়িতে থাকলেও ববি, রুমিকে পড়াতে আগ্রহ বোধ করে না সে। কয়েকবছর আগেও রীতিমতো তৈরি হয়ে কলেজের ক্লাসে ঢুকত স্বদেশ। বিস্তর লেখাপড়া করত বাড়িতে। সে পাট এখন উঠে গেছে। অসুস্থ দুর্বল শরীরে পেরে ওঠে না।

এই রোদে, সাত সকালে বাড়ি থেকে বেরবারও আজ ইচ্ছে ছিল না তার। কিন্তু কালীপদ রক্ষিতের শুকনো মুখ মনে পড়তেই আলসেমি ঝেড়ে স্বদেশ বলল, যাচ্ছি।

আজ ফিরবে তো?

ভারতীর প্রশ্নে স্বদেশ বলল, কাজ চুকে গেলে ফিরব। না হলে কাল সন্ধ্যের মধ্যে এসে যাব। রাতে থাকব সুবোধ তলাপাত্রর বাড়িতে।

ধর্মতলা থেকে ডায়ন্ডহারবারের বাসে উঠে স্বদেশ টের পেল গলার কাছে জ্বালা করছে। জানলার পাশে বসার জায়গা পেয়েছে সে। গলা জ্বালার পরেই উঠবে টক ঢেঁকুর। মাছ, ভাত, পেঁপে, কাঁচকলা পাকস্থলী থেকে দলা পাকিয়ে চলে আসবে টাগরায়, কণ্ঠনালীতে। বাস, ট্রামে জানলার পাশে তাই বসতে চায় সে। গলায় জ্বালা অনুভব করেই টপাটপ হজমের দুটো ট্যাবলেট চিবিয়ে খেয়ে নিল। গত তিন বছরে কত ট্যাবলেট যে খেয়েছে, হিসেব নেই। ট্যাবলেটে এখন কাজও হয় না। তবু খায়। খেয়ে স্বস্তি বোধ করে। ঝাঁঝাঁ রোদে পুড়ে যাচ্ছে পৃথিবী। সকাল দশটায় এ দশা হলে মাঝদুপুরে কী দাঁড়াবে ভেবে আতঙ্ক বোধ করল স্বদেশ। গুমটি ছেড়ে রাস্তায় নামল বাস। ডায়মন্ডহারবার পৌঁছতে সাড়ে বারটা বেজে যাবে। তারপর গঙ্গা পেরিয়ে চকশুকদেবপুর গ্রামে যেতে নৌকোয় আধঘন্টা থেকে এক ঘন্টা লাগে। সবই নির্ভর করছে জোয়ার-ভাটার মর্জির ওপর। কালীপদ রক্ষিতের হাতে পেনশনের টাকা এতদিনে পৌঁছে যাওয়া উচিত। টাকাটা সত্যি পৌঁছল কিনা, খোঁজ নিতে যাচ্ছে স্বদেশ। গত দেড়, দু-মাস কালীপদর কোনও খবর নেই। দু-তিনটে পোস্টকার্ড লিখে জবাব পায়নি স্বদেশ। কালীপদর আচরণে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। ভেবেছে, এই নীরবতার মানে হলো, পেনশনের টাকা বুড়ো পেয়ে গেছে। আর দরকার নেই স্বদেশকে চিঠি লেখার। পেনশন আদায় করতে গত

সাড়ে তিন বছর দৌড়ঝাঁপ, করে তার শরীর যে আধখানা হয়ে গেছে, পাকাপাকি ব্যামো বেঁধেছে পেটে, একথা কাকে বলবে সে? বলতে গেলে নিজেকে জাহির করা হয়। স্বদেশ তা কববে না। কেন করবে?

কালীপদ রক্ষিতের কাছে সে নিজেও ঋণী। ডায়মন্ডহারবার স্কুলে তার মাস্টারমশাই ছিল কালীপদ। তিন বছর সেখানে পড়েছিল স্বদেশ। স্কুলফাইনাল পাস করল ডায়মন্ডহারবার স্কুল থেকে। ক্লাস টেনের পুরোটা, তাকে বাড়িতে হপ্তায় তিনদিন পড়িয়েছে কালীপদ। কালীপদর জন্যেই ফাইনাল পরীক্ষায় অঙ্কে আটাশি পেয়েছিল সে। কালকাতার কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে তার বাবা ডায়মন্ডহারবার থেকে বদলি হলো আরামবাগে। ডায়মন্ডহারবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে গেল। কলেজে ছুটি পড়লে আরামবাগ যেত। তবে কালীপদর সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল তার। এম এ পাস-এর খবর চিঠি লিখে সে জানিয়েছিল কালীপদকে। তারপর কীভাবে যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল, স্বদেশ জানে না। বিয়ে করার সময়ে তার আবার মনে পড়েছিল কালীপদর কথা। কালীপদর নামে লাল কালিতে বিয়ের আমন্ত্রণপত্রও লেখা হয়েছিল। বৌভাতের পরে স্বদেশ আবিষ্কার করল, সে চিঠি ডাকে দেওয়া হয়নি। লজ্জা পেয়েছিল সে। কিছু করার ছিল না তখন। তবে কালীপদকে ভোলেনি স্বদেশ। নিষ্ঠাবান, আদর্শ শিক্ষকের কথা উঠলেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠত কালীপদর মুখ। ডায়মন্ডহারবারের পুরনো পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে কালীপদ স্যারের খোঁজ খবর নিত। সেরকম দেখাও ন-মাসে, ছ-মাসে ঘটত কদাচিৎ। তবে লোকমুখে শুনেছিল, তার খুঁটিনাটি প্রায় সব খবর কালীপদ রাখে। সে যে অধ্যাপক হয়েছে, বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ের বাবা, কালীপদ জানত।

বছর সাত, আট আগে কলেজে এক ছাত্র তাকে প্রশ্ন করেছিল, স্যার, কালীপদ রক্ষিতকে চেনেন?

ছেলেটির প্রশ্নে হকচকিয়ে গিয়ে স্বদেশ পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি করে চিনলে তাঁকে।

আমি ডায়মন্ডহারবার স্কুলের ছাত্র।

ছেলেটির মুখের দিকে সস্নেহে তাকিয়েছিল স্বদেশ। তার মনে হয়েছিল অনেক বছর পরে ছোটভাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে। স্টাফরুমে ছাত্রটিকে ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে গল্পগুজব করেছিল। ছেলেটির নাম, অভিজিৎ মণ্ডল। সিরাকোলে তার বাড়ি। অভিজিৎ বলেছিল, আপনার কথা বলতে কালীপদবাবু অজ্ঞান। স্কুলের ছাত্রদের কেউ ইক্‌নমিক্‌স-এ এম এ পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে কালীপদবাবু বলতেন, স্বদেশ সরকারের মতো ছাত্র না হলে অর্থনীতি প'ড়ে লাভ নেই।

আরও অনেক কথা অভিজিৎ বলেছিল সেদিন। কালীপদ যে এভাবে তাকে ইষ্টমন্ত্রের মতো মনে রেখেছে, ভাবতে পারেনি স্বদেশ। বিষাদে মেশা কৃতজ্ঞতায় টনটন করছিল তার বুক। অপরাধবোধে সে কুঁকড়ে গিয়েছিল।

অভিজিৎ বলেছিল, আর বেশিদিন চাকরি নেই কালীপদবাবুর। দু-তিন বছরের মধ্যে রিটায়ার করবেন।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে সে যোগ করেছিল, কালীপদ স্যারের ভাগ্যটাই খারাপ। একমাত্র ছেলে ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা করল। মেয়েটার এখনও বিয়ে হয়নি।

খবর শুনে স্বদেশের শিরদাঁড়ায় বয়ে গেল হিমেল স্রোত। কালীপদর সঙ্গে দেখা করার গোপন ইচ্ছেটা গিলে নিল সে। দুঃখে পেষাই হওয়া মাস্টারমশাই-এর মুখোমুখি বিশ, বাইশ

বছর বাদে দাঁড়াবার সাহস তার বুক থেকে উবে গিয়েছিল। ঘটনা এমন হলো যে, কলেজে অভিজিৎকে এড়াতে চাইত স্বদেশ। কালীপদর সব খবর যে রাখে, তাকে দেখেও অপরাধবোধ জাগতে পারে। অভিজিৎ খুঁচিয়ে তুলত তার অপরাধবোধ।

খিদিরপুরের জটে পাঁচ, সাত মিনিট আটকে থেকে ছাড়া পেল বাস। সামনে আর কোথাও আটকাবার আশঙ্কা নেই। তারাতলায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে বাস থামবে আমতলাহাটে। তেড়ে রোদ উঠছে। এই তাপেও বাস বোঝাই লোক। যারা বসে আছ, তাদের চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক যাত্রীর সংখ্যা বেশি। দরদর করে ঘামছে বেশিরভাগ যাত্রী। গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে ফোঁসফোঁস করে। বাসের ভেতরে, বাইরে সমান তাপ। ঘামের নোনা বাষ্প, ঘামে ভেজা জামার গন্ধে বাসের ভেতরটা গুমোট, ভারী হয়ে আছে। দু'পাশের খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকলেও মানুষের পাঁচিলে আটকে যাচ্ছে। বাসের ভেতরে, চলাচল করতে পারছে না। জানলার পাশে বসায় বেঁচে গেছে স্বদেশ। প্যাসেজের দিকে সিটে বসলে তার ঘাড়ে, কাঁধে, মাথায় ঠেস দিয়ে থাকত দু- চারজন যাত্রী। ইচ্ছে করে নয়, চাপে বেঁকে চুরে দাঁড়াতে বাধ্য হতো তারা। আজও দাঁড়িয়েছে স্বদেশের গলার জ্বালা অনেক কমেছে। একটা ঢেঁকুরও এখনও পর্যন্ত না ওঠায় খুব অবাক হচ্ছে সে। তিন বছরের পুরনো ব্যামোটা সেরে গেল নাকি? সেরে গিয়ে নতুন কী এল? চেনা রোগের জায়গায় আরও মারাত্মক, অচেনা কোনও ব্যাধি হলেই মুশকিল। নিশ্চয় তা নয়। এ মুহূর্তে সেরকম কোনও লক্ষণ টের পাচ্ছে না সে। বরং কালীপদর আচরণে তার মনে অখুশির যে মেঘ জমেছিল, সরে যাচ্ছে। পেনশনের টাকা হাতে এসে না থাকলে এ মুহূর্তে কালীপদর পারিবারিক দুর্দশা যে সীমাহীন, স্বদেশ জানে। কালীপদর সংসারে হয়ত হাঁড়ি চড়ছে না আধপেটা খেয়ে অথবা না খেয়ে আছে তিন, চারজন মানুষ। তারমধ্যে দুটো বাচ্চা। কালীপদর দুই নাতি, তার মেয়ের ছেলে। বৌ আব দুই সন্তানকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে কালীপদর অপোগণ্ড জামাই চাকরির খোঁজে বছর দুই আগে সেই যে গেল, আর ফেরেনি। এত অভাব, কষ্টেও কালীপদর আত্মসম্মানবোধ এখনও টনটনে, প্রখর। তিন, চারবার নগদ কিছু টাকা স্বদেশ দিতে চাইলেও কালীপদ নেয়নি। বলেছিল, পেনশনের টাকাটা ব্যবস্থা করে দাও, তাহলেই হবে।

ধার হিসেবে টাকাটা কালীপদকে গছাতে চেষ্টা করেছিল স্বদেশ। বলেছিল, পেনশনের বকেয়া টাকা পাবেন অনেক। তখন শোধ করে দেবেন।

নাহ্, স্বদেশ এ অনুরোধ ক'রো না, কালীপদ বলেছিল, পেনশন-এর টাকা যে জীবদ্দশাতেই পাব, আদৌ পাব কিনা, সন্দেহ।

নিশ্চয় পাবেন, হকের টাকা।

হক!

- শব্দটা উচ্চারণ করে ম্লান হেসেছিল কালীপদ। হাহাকারের মতো ছিল সে হাসি। কালীপদ বোঝাতে চেয়েছিল, তার অভিধানে হক শব্দটা নেই।

কলেজের ক্লাস শেষ করে সেদিন ফেরার পথে বালিগঞ্জ বাস গুমটির সামনে পঁচিশ বছর পরে কালীপদর সঙ্গে স্বদেশের হঠাৎ দেখা হয়েছিল। সিকি শতাব্দী পরে ছাত্রকে দেখে শিক্ষকের চেনার কথা নয়। মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কালীপদ চিনতে পারেনি স্বদেশকে। চিনেছিল স্বদেশ। ভরদুপুরে ভাঙাচোরা একটা মানুষকে হনহন করে স্টেশনের দিকে হেঁটে যেতে দেখে আচমকা সে ডেকে ফেলেছিল, স্যার!

তার গলার স্বর শুনেই চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কালীপদ। ডাকটা হয়ত চেনা মনে হয়েছিল

তার। কালীপদর সামনে দাঁড়িয়ে, হাসিমুখে স্বদেশ প্রশ্ন করেছিল, চিনতে পারছেন?

কিটকিটে ময়লা সাদা ধুতি, পপলিনের নীল হাফ শার্ট, মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা তিন চারদিনের না কামানো দাড়িগোঁফ, পায়ে টায়ারের চটি, ফ্যাকাশে হলদে চোখের জমি, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল কালীপদ। স্বদেশ পরিচয় দিতেও কোনও উত্তেজনা, আবেগ দেখাল না কালীপদ। অসুস্থ, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাকে। কালীপদর একটা হাত ধরে স্বদেশ বলেছিল, চলুন, কোথাও বসে একটু চা খাই।

আমাকে যে ট্রেন ধরতে হবে, বিড়বিড় করে বলেছিল কালীপদ।

পরের ট্রেনে যাবেন। গাড়িতে তুলে দেব আপনাকে। কালীপদ আর আপত্তি করেনি। বাসগুমটি ছেড়ে অল্প এগিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে কালীপদকে নিয়ে বসেছিল স্বদেশ।

কী খাবেন?

স্বদেশেব প্রশ্নে কালীপদ বলেছিল, চা।

রেস্টুরেন্টে ঢুকে তখন শুধু এক কাপ চা নিয়ে বসার কথা ভাবতে পারত না স্বদেশ। মাটন কষা, মোগলাই পরোটা, নিদেনপক্ষে চপ, কাটলেট খেত। তারপর চা। স্বদেশের অনুরোধে চায়ের সঙ্গে দু-পিস টোস্ট নিতে বাধ্য হয়েছিল কালীপদ।

মাটন কষা, মোগলাই পরোটা খাওয়ার ফাঁকে টুকটাক প্রশ্ন করে স্বদেশ জেনেছিল কালীপদর খবর। স্কুল থেকে রিটায়ার করে পেনশনের তাগাদায় গত তিনবছরে বালিগঞ্জে জেলা শিক্ষাবোর্ডের অফিসে পঞ্চাশবার যাতায়াত করেছে কালীপদ। তিন বছরে একবারও কালীপদর সঙ্গে কেন এ রাস্তায় দেখা হয়নি, ভেবে আশ্চর্য হলো স্বদেশ। এ তার কলেজের পাড়া। হপ্তায় চার, পাঁচদিন কলেজে আসে সে। সংসারের অভাব, দারিদ্র্যের কথা মুখে না বললেও, কালীপদর চেহারা, পোশাক, কিছু টুকরো কথা থেকে স্বদেশের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। চাপা অনুশোচনা ঢাকতে স্বদেশ প্রশ্ন করেছিল, আপনাদের স্কুলবোর্ডের দপ্তর থেকে এত কাছে আমার কলেজ, একবার দেখা তো করতে পারতেন।

আবার ম্লান হেসে কালীপদ বলেছিল, বিব্রত করতে চাইনি তোমাকে।

কী বলছেন আপনি?

স্বদেশের গলায় অভিমান বাজতে সসঙ্কোচে কালীপদ বলেছিল, অন্যায় কিছু বলে থাকলে মাপ চাইছি।

তখনই ঝোঁকের বশে স্বদেশ বলেছিল, আপনার পেনশনের হুকুম বার করার দায়িত্ব নিলাম আমি। কলকাতায় আর আসতে হবে না আপনাকে। প্রাক্তন এক প্রিয় ছাত্রের মুখে এ আশ্বাস শুনে ছলছল করে উঠেছিল কালীপদর চোখ। মুহূর্তের দুর্বলতায় বলেছিল, বাঁচালে আমাকে।

মুখ ফসকে কথাটা বলেই লজ্জায় গুটিয়ে গিয়ে কালীপদ আবার বলল, অনেক সময় নষ্ট হবে তোমার। হয়রানি হবে।

আপনি একদম ভাববেন না।

বরাভয় দেবার ভঙ্গিতে কালীপদকে বলেছিল স্বদেশ। তারপর পকেট থেকে দশটা দশ টাকার নোটে একশ টাকা সে গুঁজে দিতে চেয়েছিল কালীপদর হাতে। হাত গুটিয়ে নিয়ে কালীপদ বলেছিল, পেনশনের টাকাটা ব্যবস্থা করে দাও। তাহলেই হবে।

স্বদেশের হাতের টাকা হাতে থেকে গেল। বেকুবের মতো ঢোক গিলেছিল সে। কালীপদর পেনশনের দায়িত্ব নেবার সময়ে একটা, ছক, স্বদেশ মাথায় সাজিয়ে নিয়েছিল। তার কয়েকজন

বন্ধু, সহপাঠী এখন সরকারি শিক্ষাদপ্তরের কর্তাব্যক্তি। মন্ত্রী, নেতাদেরও দু-চারজনকে সে চেনে। অবসরপ্রাপ্ত, দরিদ্র, বৃদ্ধ মাস্টারমশাই-এর পেনশন-এর হুকুম তাদের ধরে তাড়াতাড়ি বার করা যাবে। রিটায়ার করার পরে তিনবছর হয়ে গেছে। আর কত দেরি হবে? সুতরাং প্রবল আত্মবিশ্বাসে কালীপদর দায় ঘাড়ে নিয়েছিল সে। তারপর প্রায় সাড়ে তিনবছর চলে গেছে কালীপদ আর কলকাতায় আসেনি। পেনশনের হুকুমনামা পাবার আশায়, স্নেহাস্পদ প্রাক্তন ছাত্রের ওপর নির্ভর করে গঙ্গার ধারে চকশুকদেববপুরে বসে আছে। পেটের রোগে গত তিনবছরে স্বদেশের শরীর আধখানা, ঝলসে গেছে গায়ের রঙ, চুল উঠে মাথায় বড়সড় টাক তবু এখনও কালীপদর পেনশনের সুরাহা করতে পারেনি সে। বলা ভুল হলো। দু-মাস আগে শেষ খবরে স্বদেশ জেনেছে যে কালীপদর পেনশনের হুকুমনামা ডাকে পাঠানো হয়েছে শিক্ষাদপ্তরের এক বন্ধু অফিসার খবরটা স্বদেশকে দিয়ে বলেছিল, ভদ্রলোক অর্ডার পেলেন কিনা খোঁজ নাও। না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

পরপর দুটো চিঠি লিখে কালীপদর জবাব না পেয়ে অবাক হয়েছে স্বদেশ। চিঠি পেলে সাত, দশ দিনে জবাব দেয় কালীপদ। গত তিন বছরে এ প্রথা কখনও ভাঙেনি সে। তাই কালীপদর নীরবতায় প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতার গন্ধ পেয়ে ক্ষুণ্ণ হলেও চাপা উদ্বেগে ভুগছে স্বদেশ বয়স্ক মানুষটার কোনও আপদ বিপদ হলো নাকি? হতেই পারে। এত সঙ্কট, অভাব, অনটনে সেরকম কিছু না হওয়াই এক বিস্ময়!

আমতলাহাটে বাস থামতে স্বদেশ টের পেল তেষ্টায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলা। পিচ রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে বাস। বাঁপাশের রাস্তা সোজা গেছে বারুইপুর। ডানদিকের রাস্তা বাখরাহাট ছুঁয়ে দু'ভাগে মিলেছে রায়পুর আর বজবজে। ডায়মন্ডহারবার রোডের এ জায়গাটা খুব সরু। বাস, সাইকেল-রিকশ, মানুষের ভিড়ে দম আটকানো পরিবেশ। ফ্যাকাশে ধুলোয় ভরে আছে চারপাশ। মিষ্টির দোকানে ভনভন করছে খদ্দের আর মাছি। একটা ডাবওলাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেই দুরদুর করছে স্বদেশের বুক। সবুজ, কচি ডাব দেখে লোভে পড়ে গিয়েছিল সে। তেষ্টা বেড়ে গিয়েছিল দশগুণ। ডাবের জলও যে হজম হয় না, মনে পড়ে গেছে তার। কিন্তু এই ভিড় ঠেলে বাস থেকে নেমে জল খেতে যাওয়া অসম্ভব। রাস্তার দোকান থেকে জল খাওয়াও মোটেই নিরাপদ নয়।

জানলার তলায় দাঁড়িয়ে ধারালো কাটারিতে দ্রুত ডাব কাটছে মাথায় গামছা জড়ানো এক মানুষ। মুখ কাটা ডাব হাত বাড়িয়ে তুলে নিল স্বদেশ। পানসে গরম জল এক ঢোক খেয়ে বাকিটা খাওয়া ঠিক হবে কিনা সে ভাবছে।

ডাবওলা তাকিয়ে আছে।

কত দাম?

প্রশ্ন করল স্বদেশ। দু'টো টাকা দিল ডাবওলাকে। এক ঢোঁকে তেষ্টা মেটে না। ঢকঢক করে ডাব শেষ করে ফাঁকা খোল জানলার বাইরে ফেলে রুমালে হাত, মুখ মুছল স্বদেশ। স্টার্ট নিয়ে গড়াতে শুরু করেছে বাস। ক্ষীণ একটা ঢেকুর তুলল সে। নিরীহ ঢেকুর। সবরকম ঢেকুরের জাত গত তিন বছরে চেনা হয়ে গেছে তার।

২

কালীপদকে সেদিন ট্রেনে তুলে দিয়ে একহপ্তা পরে ডায়মন্ডহারবারে গিয়েছিল স্বদেশ। ঠিক ডায়মন্ডহারবারে নয়, গঙ্গা পেরিয়ে প্রথমবার গিয়েছিল চকশুকদেবপুরে কালীপদর বাড়িতে। কালীপদর বাড়িঘর, সংসারের হতশ্রী চেহারা দেখে ভয় পেয়েছিল। স্বদেশ যে সত্যি আসবে ভাবতে পারেনি কালীপদ। কীভাবে তাকে খাতির, যত্ন করবে, ভেবে অস্থির হয়েছিল বয়স্ক মানুষটি। কিছু মিষ্টি, ফল কালীপদর জন্যে কিনেছিল স্বদেশ। একটু বেশিই কিনেছিল। ফল, মিষ্টি এনে তার মনে হয়েছিল, এগুলোর বদলে চাল, ডাল, তেল, নুন আনা উচিত ছিল। তখন ভরদুপুর। নিস্তব্ধ চকশুকদেবপুর। হেমন্তের গঙ্গা থেকে উঠে আসছে শীতল বাতাস। সাতদিন আগে রেস্টুরেন্টে বসে কালীপদর কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র নিয়েছিল স্বদেশ। পেনশন সংক্রান্ত সে কাগজগুলো, বেশিরভাগ চিঠিচাপাটি, কালীপদকে ফেরত দিয়ে বলেছিল, যাই স্যার।

ঘরে কিছু নেই জেনেও তাকে খেয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছিল কালীপদ। স্বদেশ বসেনি। তার মধ্যেই পরিচয় হয়েছিল কালীপদর মেয়ে সীতার সঙ্গে। বছর দুই-তিনের এক বাচ্চা কোলে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সীতা। কিছুদিন আগেও তার শরীরে, মুখে যে যথেষ্ট লাবণ্য ছিল, এক নজরে টের পেয়েছে স্বদেশ। কত বয়স সীতার? হিসেব করে হদিস পায়নি। পাবার কথা নয়। সে যখন কালীপদর ছাত্র ছিল, তখনও সীতা জন্মায়নি। কালীপদর তিন-চার বছরের একটি ছেলের কথাই শুনেছিল স্বদেশ। সীতা যে পঁচিশের বেশি নয়, বুঝতে তার ভুল হয়নি। সীতার শ্বশুরবাড়ি কুঁকড়োয়। স্বামী প্রহ্লাদ, স্কুল ফাইনাল পাস, চাকরি করে দুর্গানগরে। কী চাকরি, জানতে চায়নি স্বদেশ। প্রহ্লাদ সম্পর্কে কালীপদর কথা বলার অনিচ্ছা সে টের পেয়েছিল। বাড়তি কথা শোনার সময়ও ছিল না তার।

ডায়মন্ডহারবারে ফেরার তাড়া ছিল। সেখানে সুবোধ তলাপাত্রের বাড়িতে রাতে তার থাকার কথা। সরকারি সেচদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ, তার কলেজের সহপাঠী, বন্ধু। ছাত্রজীবনে সুবোধ ছিল ঘোর পিউরিটান, নীতিবাগীশ। সিগারেট পর্যন্ত খেত না। স্বদেশ ফুঁকত চারমিনার। সিগারেটের ধোঁয়া, গন্ধ অসহ্য ঠেকত সুবোধের। সুবোধের বউ, নামী আর্টর্নির কন্যা, তনুশ্রী হাসিখুসি, মিশুকে মেয়ে। সুবোধের বিয়েতে বরযাত্রী ছিল স্বদেশ। ভাবানীপুরে তনুশ্রীদের প্রাসাদের মতো বাড়িতে বিয়ের জাঁকজমক দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তার। এই ধনীর দুহিতাকে সুবোধের মতো নিরীহ, সৎ ছেলের বউ ভাবতে অস্বস্তিবোধ করেছিল। বদলির চাকরি সুবোধের। ফলে তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযাগ রাখা সম্ভব ছিল না। তখন সদ্য বদলি হয়ে ডায়মন্ডহারবারে এসেছিল সে। কাজে, অকাজে কলকাতায় এসে এক দু'বার স্বদেশের বাড়িতেও ঢুঁ মেরেছে সুবোধ। সপরিবারে স্বদেশকে ডায়মন্ডহারবারে যেতে অনুরোধ করেছে। ইচ্ছে থাকলেও যাবার সময় পায়নি স্বদেশ। তাছাড়া যে কোনও কারণেই হোক, তার মনে হয়েছিল, সুবোধ আর আগের মতো নেই। নিরীহ, নীতিবাগীশ সুবোধ অনেক বদলে গেছে। গল্প, আড্ডায় ছাড়া ছাড়া ভাব। সুবোধ যেন অনেক দূরের মানুষ! তবু ডায়মন্ডহারবারে এসে সুবোধের বাড়ি না গেলে অন্যায় হবে। তার আসার খবর ঠিক জেনে যাবে সুবোধ। তার বাড়িতে স্বদেশ না আসায় আহত হবে। হতেই পারে। ছাত্র বয়সের গলাগলি বন্ধুত্ব বড়ো অভিমানী। বয়স বাড়লেও থেকে যায় সেই ছেলেমানুষী অভিমান! পুরনো বন্ধুদের কেউ কেউ, বিশেষ করে তেজেশ, অনিরুদ্ধ কলকাতা থেকে পনের দিন, এক মাস অন্তর হুটহাট সুবোধের বাড়িতে

চলে আসে। বাগানঘেরা বড় সরকারি কোয়ার্টারে থাকে সুবোধ। কোয়ার্টারের বারান্দায় ডেকচায়ারে বসে সাগর পর্যন্ত বহমান গঙ্গার জলস্রোত দেখা যায়। তেজেশের মুখে এ বর্ণনা শুনেছিল স্বদেশ। দু'তিনবার বৌ কেয়াকেও ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে গেছে তেজেশ। অনিরুদ্ধরও যাতায়াত আছে সেখানে। সুবোধের কোয়ার্টার, সংসার, দেখার তাগিদ তাই স্বদেশেরও কম নয়। সুবোধ, তনুশ্রীর একমাত্র ছেলে দশ বছরের সায়ন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে।

কালীপদবাবুর বাড়ি থেকে স্বদেশ বেরবার আগে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অচেনা মানুষটি কালীপদর সমবয়সী। দু'এক বছর কমও হতে পারে। তাকে দেখে কালীপদ বলল, আসুন যতীনবাবু, আসুন।

এক পলক স্বদেশকে দেখে কালীপদকে যতীন প্রশ্ন করল, ইনি বোধহয় অধ্যাপক স্বদেশ সরকার, আপনার সেই কৃতী ছাত্র?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

যতীন হঠাৎ দু'হাতে খপ করে স্বদেশের একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলল, স্বদেশবাবু, আমার একটা উপকার করতেই হবে আপনাকে। সরাসরি আপনার শিক্ষক নই আমি। আপনি পাস করে বেরিয়ে যাবার চার-পাঁচ বছর পরে ডায়মন্ডহাববার স্কুলে হেডমাস্টার হয়ে ছিলাম আমি। স্কুলের গভর্নিং বডির নানা অন্যায্য আব্দার মাথা পেতে মেনে না নিতে পারায় আমার স্কুলে ঢোকা বন্ধ করে দিল তারা। এ প্রায় দু'বছর আগের ঘটনা। আইন, আদালত করেছি। এখনও মামলা চলছে। ছ'মাস হলো, অবসর নেবার বয়স হয়ে গেছে আমার। মাইনে পাইনি দু'বছর। তার ওপর পেনশন আটকে গেছে। কোর্টকাছারির খরচা জোগাতে বাঁধা দিতে হয়েছে ভিটেবাড়ি।

ঠকঠক করে কাঁপছে যতীন। তার দু'হাতে ধরা স্বদেশের ডান হাতের পাতা ভিজে উঠেছে ঘামে। যতীন বিড়বিড় করল, গভর্নিং বডির নেতাদের প্রতি কথায় 'জো হুকুম' না বলে চাকরি গেল। পথে বসতে চলেছি আমি। আপনি বাঁচান।

পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তনে নির্বোধ হয়ে গেছে স্বদেশ। কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। কালীপদ চুপ। যতীন বলল, স্কুল চালাতে অনেক সময় কড়া হতে হয়েছে আমাকে। প্রশাসনে সব সময়ে তো দয়ালু থাকা যায় না। কিন্তু কখনও বেআইনি কিছু করিনি। ক্ষতি করিনি কারও।

এক মুহূর্ত থেমে যতীন বলল, কালীপদবাবু সাক্ষী। তাঁর পেনশনের কাগজপত্র এক মাসে তৈরি করে দিয়েছে স্কুলের অফিস। আমার চাপেই করেছে। বলুন কালীপদবাবু, বলুন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

কলীপদ সায় দিলেও খেয়াল করল না যতীন। সে বলল, স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পেতে এখন বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ হাজার টাকা ঘুষ লাগছে। আট, দশ বছর চালু হয়েছে এ নিয়ম। ঘুষের টাকা কারা নিচ্ছে, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। এ সবের প্রতিবাদ করেছিলাম আমি। ছাত্র ভর্তিতে ঘুষ, পরীক্ষা পাসের জন্যে ঘুষ, হচ্ছেটা কী? বাষট্টি বছরের জীবনে এত অবিচার, অন্যায়, জোচ্চুরি আগে দেখিনি আমি।

যতীনের কথার মধ্যে এক অশুভ সম্ভাবনায় কেঁপে উঠল স্বদেশের বুক। তিন, চারদিন আগে তার শ্যালক, ভারতীর ছোট ভাই মৃন্ময়, পার্কসার্কাসের একটা স্কুলে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছিল। মৃন্ময় এম এস সি, বি এড। অঙ্কে ওস্তাদ। চাকরি পাবার সব যোগ্যতা তার আছে।

তবু বেকার মৃন্ময় ফ্যাফ্যা করে ঘুরছে দুবছর। এ অবস্থার মধ্যেই একটা বিয়ে করে বসে আছে। ছেলেও হয়েছে। সংসার চালাচ্ছে টিউশনির টাকায়। কতদিন পারবে, সন্দেহ। ছেলে-মেয়েদের গৃহশিক্ষক রাখতে স্কুল, কলেজের মাস্টার ছাড়া অভিভাবকরা এখন কাউকে বিশ্বাস করে না। স্কুল, কলেজের মাস্টারকে প্রাইভেট টিউটর পেলে অনেক সুবিধে। সেখানকার পরীক্ষায় অন্তত ছেলেমেয়ে ঠেকে যাবে না। এ হলো পাকা মাথার হিসেব। এ হিসেব, মনস্তত্ত্ব দুঁদে মাস্টাররাও জেনে গেছে। তাই গলাকাটা দক্ষিণা চায় তারা। পাঁচ, সাতজন ছাত্রকে ব্যাচে পড়ায়। স্কুল, কলেজে যারা জড়িত নয়, ছাত্র পায় না তারা। পেলেও সে ছাত্র বেশিদিন টেকে না। সুযোগ পেলেই স্কুল মাস্টারের কোচিং ক্লাসে ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। সুতরাং মৃন্ময়ের ভবিষ্যৎ যে পলকা সুতোয় ঝুলছে, স্বদেশ জানে। পার্কসার্কাস স্কুলে মৃন্ময়কে ঢোকাতে স্বদেশও তাই অল্পবিস্তর চেষ্টা করেছিল। কলেজের চাকরির আগে ওই স্কুলে সাত আট মাস পড়িয়েছিল সে। সদ্য এম এ পাস করা তরুণ, ভাল রেজাল্ট, সপ্রতিভ স্বদেশকে স্কুলের সহকর্মী, ছাত্ররা পছন্দ করত। রীতিমতো স্নেহ করত হেডমাস্টার শ্যামসুন্দরবাবু। মৃন্ময়ের চাকরির তদ্বির করতে শ্যামসুন্দরের কাছে গিয়েছিল স্বদেশ। অনেক বছর পরে তাকে দেখে খুশি হয়েছিল শ্যামসুন্দর। বেয়ারা মাধবকে চা আনতে বলেছিল দু'কাপ। পাঁচ সাত মিনিট গল্পগুজবের পর মৃন্ময়ের চাকরির কথা স্বদেশ পাড়তে গম্ভীর হয়ে গেল শ্যামসুন্দর। মুখ থেকে মিলিয়ে গেল সরস, সহাস্য ভাব। শ্যামসুন্দর বলল, দেখ স্বদেশ, একটা পার্টি করি আমি। পার্টি দপ্তর থেকে চার পাঁচ জনেব নাম পাঠানো হয়েছে আমাকে। প্রার্থী হিসেবে তারাও অযোগ্য নয়। সুতরাং।

শ্যামসুন্দরের চাঁচাছোলা জবাবে অপমানে, লজ্জায় শুকিয়ে গিয়েছিল স্বদেশের মুখ। তার মুখ দেখে শ্যামসুন্দরের বোধহয় করুণা হলো। চাপা গলায় শ্যামসুন্দর বলল, শুধু যোগ্যতায় চাকরি হয় না আজকাল। যোগ্যতার সঙ্গে চাই শক্ত খুঁটি। এলাকা কমিটির সেক্রেটারি, এক-দু'জন নেতাকে গিয়ে ধরো। চেনাজানা আছে কেউ?

এ প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ, না, কিছু বলতে হয়। কিন্তু আওয়াজ বেরল না স্বদেশের গলা থেকে। কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে, প্রায় ফিসফিস করে শ্যামসুন্দর জানতে চাইল, অভিনেত্রী সুচিত্রা মজুমদারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আছে তোমার?

এক সেকেন্ড স্বদেশকে দেখে শ্যামসুন্দর বলল, হাঁ করে থেক না, জবাব দাও। তখনও স্বদেশকে চুপ করে থাকতে দেখে শ্যামসুন্দর বলেছিল, শিক্ষা সেলের জগদীশ সেনকে সুচিত্রা মজুমদার যদি একবার বলে দেয়!

কথা না বাড়িয়ে শ্যামসুন্দরের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল স্বদেশ। সব কিছু ধোঁয়াটে ঠেকছিল তার। কানে বাজছিল, শ্যামসুন্দরের কথা, শুধু যোগ্যতায় চাকরি হয় না, আরও কিছু দরকার। বিখ্যাত অভিনেত্রী সুচিত্রা মজুমদার, শিক্ষা সেলের জদগীশ সেনের সঙ্গে পার্ক সার্কাস স্কুলের মাস্টারি পাবার কার্যকারণ মেলাতে পারেনি স্বদেশ। চকশুকদেবপুরের বিতাড়িত হেডমাস্টার যতীনের কথায় কুয়াশা যেন কিছুটা কেটে গিয়েছিল। স্কুলে চাকরি পেতে যোগ্যতার সঙ্গে চাই বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ হাজার টাকা। সুন্দরী অভিনেত্রীর আশীর্বাদ। তাকে নৌকোয় তুলতে সেদিন কালীপদর সঙ্গে যতীনও ঘাট পর্যন্ত এসেছিল। নৌকোয় স্বদেশ ওঠার আগে যতীন বলেছিল, কালীপদবাবুর অশেষ ভাগ্য আপনার মতো একজন ছাত্র পেয়েছিলেন। আমার কথাটাও মনে রাখবেন।

ঘাড় নেড়ে প্রতিশ্রুতি দিলও স্বদেশ জানত, যতীনের জন্যে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভ নয়। সমাজসেবক, জননেতার দায়িত্ব পালনের সুযোগ, সময় তার নেই। সেরকম কিছু হতে চায় না সে। নেহাত দমকা আবেগে এককালের মাস্টারমশাইয়ের পেনশন আদায়ের দায়ি নিয়ে ফেলেছে। কতদূর কী করতে পারবে, জানে না। তবে চেষ্টার কসুর করবে না।

৩

সিরাকোলে বাস থেকে দু'জন নেমে গেল। উঠল না কেউ। দাউদাউ আগুনের ডেলা মতো সূর্য ঝুলছে মাঝআকাশে। বাসের ভেতরটা লোহা গলানোর চুল্লির চেয়ে বেশি গনগনে তপ্ত। লোহার চেয়ে মানুষ সম্ভবত কঠিন বলে গলছে না। বাসের পাশ দিয়ে খটর খটর কে চলে গেল একটা গরুর গাড়ি। হাড় জিরজিরে বলদ দুটোর আধখানা জিভ বেরিয়ে এসেছে লালা ঝরছে জিভ থেকে। বোবা দুটো জীব যে কোনও মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়বে মাটিতে আধ মিনিট দাঁড়িয়ে ছেড়ে দিল বাস। আমতলার পর থেকে বাসের গতি বেড়েছে। সিরাকোলের পর বাস দাঁড়াবে সরষেহাটে।

খোলা জানলা দিয়ে বাতাসের লেলিহান জিভ স্বদেশের চামড়া ভেদ করে রক্ত পর্যন্ত চে নিচ্ছে। জানলার কাচ নামালে একটু আরাম হতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। জানলা বন্ধ করে যারা দাঁড়িয়ে আছে, হল্লা জুড়ে দেবে। ঝাঁপিয়ে পড়বে স্বদেশের ওপর। সুতরাং লু হাওয়া চাবুকের অবিরাম মার খাওয়া ছাড়া উপায় নেই তার। ডায়মন্ডহারবারে নেমে ফেরিঘাট থেকে নৌকো ধরে চকশুকদেবপুরে সোজা চলে যাবে। গত তিন বছরে ছ'সাত বার কালীপদর বা গেছে। সহজ ভেবে যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়েছিল, প্রতিটি দিন, হপ্তা, মাস, বছর ঘুরে যাবা পরেও কাজের সিকিভাগ না হওয়ায় আতঙ্ক, হতাশা তছনছ করেছিল তাকে। একটার পর এক ফ্যাকড়া তুলছিল সংশ্লিষ্ট দপ্তর। কালীপদ রক্ষিতের বার্থ সার্টিফিকেট, নিয়োগপত্র, আদে পঁয়ত্রিশ বছর কালীপদ শিক্ষকতা করেছে কিনা, জেলা ট্রেজারির ক্লিয়ারেন্স, মহকুমা শাসকে সার্টিফিকেট, স্কুল পরিচালনা কমিটির প্রস্তাব, পঁয়ত্রিশ বছরে তেরবার বেতনক্রম সংশোধনে ফলে কখন কত টাকা কলীপদর মাসমাইনে ছিল, প্রভিডেন্ড ফান্ড বা স্কুল তহবিল থেকে নেও ঋণ, আগামের হিসেব, এবং এরকম আরও অসংখ্য প্রশ্নের জবাব সংগ্রহে জেরবার হতে স্বদেশ। তার মনে হলো, অন্ধকার, অফুরন্ত এক গোলোকধাঁধায় হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দ বন্ধ হয়ে আসছে তার। কোথাও পৌঁছতে পারছে না। পরিস্থিতি যত জটিল, ভয়ঙ্কর হচ্ছি তত বাড়ছিল তার জেদ। শেষ না দেখে সে ছাড়বে না। কালীপদর সংসার কীভাবে চলে প্রশ্ন করার সাহস পেত না। দু'তিনবার নগদ টাকা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে চাল ডাল তেল নু কিনে কালীপদর বাড়িতে হাজির হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনের জিনিসগুলো নিতেও কালীপ নারাজ। সীতাকে দেখিয়ে স্বদেশ বলত, আমার বোন আর তার ছেলের জন্যে এনেছি। দয় করে আপনি মাথা ঘামাবেন না।

প্রহ্লাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলাপ হয়েছিল স্বদেশের। বাউন্ডুলে বলতে যা বোঝায়, প্রহ্লা তাই। দুর্গানগরে একটা বাসনের দোকানে সামান্য চাকরি করত সে। গাঁজা খেত। আরও না নেশা ছিল তার। দ্বিতীয় ছেলেটা হবার পরে দোকানের ক্যাশ ভেঙেছিল। কুঁকড়োয় তা বাড়িতে যখন পুলিশ হানা দিল, তখন সে চকশুকদেবপুরে। সেখানেও পুলিশ আসার আশঙ্কা

করি খোঁজার নাম করে গা ঢাকা দিয়েছিল। তখন সীতার কোলে ছ'মাসের দ্বিতীয় ছেলে। হ্লাদের খোঁজে চকশুকদেবপুরে পুলিশ আসেনি। তবু আজ দু'বছর প্রহ্লাদ নিখোঁজ। ছ'মাসের ছেলে এখন আড়াই বছরের। ভারি মিষ্টি হয়েছে বাচ্চাটা।

সরষেহাটের দিকে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে বাস। বাতাসের একটানা ঝাপটায় স্বদেশের মুখ, ঘাড় সেঁকে গেছে। কষ্ট হচ্ছে না আর। পেনশনের হুকুম এবং টাকা কালীপদ পেয়েছে কিনা জেনেই ডায়মন্ডহারবারে ফিরে আসবে সে। সুবোধের বাড়িতে রাতে থাকার কথা ভারতীকে বলে এলেও, তা নিছক কথা। সুবোধের কোয়ার্টারে ওঠার ইচ্ছে তার নেই। কালীপদর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে ডায়মন্ডহারবারে ফিরতে পারলে, কলকাতার বাস ধরবে। সুবোধের বাড়ি আজ তার কাছে অচেনা বিদেশ। গত তিন বছরে তিন রাত সেখানে কাটিয়ে এ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। সুবোধের বাড়িতে রাতে না থাকতে হলে বেঁচে যায় সে।

তিন বছর আগে কালীপদর বাড়িতে প্রথমবার আসার পর ডায়মন্ডহারবারে ফেরার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছিল স্বদেশ। হওয়ারই কথা। কলেজের বন্ধু সুবোধের বাড়িতে এক রাত থাকার খুব ইচ্ছে ছিল তার। ছাত্রবয়সের বন্ধুরা, পুরনো প্রিয় গানের কলির মতো কৈশোর, যৌবন ফিরিয়ে দেয়। কতকাল সুবোধের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা, ফাটাফাটি তর্ক হয়নি! অথচ ছাত্রজীবনে এসবই ছিল নিত্যদিনের রুটিন। সুবোধ, তেজেশ, অরিন্দমের সঙ্গে একদিন দেখা না হলে মনে হতো মাটি হয়ে গেল সব। জীবন ব্যর্থ! তাই কালীপদর কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করেই চকশুকদেবপুর থেকে ডায়মন্ডহারবারে চলে এসেছিল সে। সদ্য পরিচিত হেডমাস্টার যতীনও ঠারেঠোরে তাকে আটকাতে চেয়েছিল। যতীনকে পাশে পেয়ে সাহসী হয়েছিল কালীপদ। স্বদেশের খাওয়ার অসুবিধে হবে না। রাতে থেকে যাবার জন্যে তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল কালীপদ। স্বদেশ থাকেনি। বন্ধু সুবোধ, ফেলে আসা দিন, স্মৃতিমদির নেশার মতো টানছিল তাকে। বিকেল ফুরোবার আগেই সে পৌঁছে গিয়েছিল ডায়মন্ডহারবার। গঙ্গার জলে তখন সূর্যাস্তের বর্ণালি, রঙ বদলের খেলা। দিনান্তের এমন মায়াবী শোভা অনেকদিন স্বদেশ দেখেনি। শেষ দেখেছিল সিকি শতাব্দী আগে। ডায়মন্ডহারবার স্কুলে পড়ার সময়ে প্রায় রোজ বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়াত সে। তার বাবার সরকারি বাসস্থানও ছিল গঙ্গার কোল ঘেঁসে। গঙ্গার বুকে সূর্যের ওঠা, ডোবা দেখে দেখে একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল তার। সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের রোমাঞ্চ সরে গিয়েছিল তার চোখ থেকে। কালীপদর বাড়ি থেকে ডায়মন্ডহারবারে পৌঁছে পরিত্যক্ত লাইটপোস্টের দিকে অভিভূতের মতো এগিয়ে গিয়েছিল স্বদেশ। স্মৃতি, স্বপ্নে ভারাতুর শৈশবে পৌঁছতে চেয়েছিল। রাস্তার পাশে ভাতের হোটেলে তাজা ইলিশ মাছ ভাজার সুবাস লোলুপ করল তাকে। হোটেলে ঢুকে দু'চার পিস গরম ইলিশভাজা খাবার লোভ সামলাতে পারল না। তখনই তার নজরে পড়ল পর্যটন বিভাগের সুসজ্জিত, বিলাসবহুল লজ থেকে অনিরুদ্ধ, কেয়া বেরচ্ছে। স্বদেশ আশা করেছিল, দুজনের পেছনে থাকবে তেজেশ। স্ত্রী আছে, তেজেশ নেই, হতে পারে না। কিন্তু কোথায় তেজেশ? লজের সামনে রাস্তা থেকে একটা সাইকেল রিকশয় কেয়া, অনিরুদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। রিকশর মাথার ছাতা টেনে দিল অনিরুদ্ধ। চনমনে, ভয়ার্ত চোখে অপরাধীর মতো চারপাশে তাকাচ্ছিল তারা। সব দেখেও কিছুই দেখছিল না। স্বদেশের ওপর নজর পড়তেও তাকে চিনতে পারল না অনিরুদ্ধ। তাদের চোখ এড়াতে হোগলার ছাউনি দেওয়া একটা হোটেলে ঢুকে পড়েছিল

স্বদেশ। হোটেলে ঢুকলে কিছু খেতে হয়। দু'টো ভাজা ইলিশ খেয়েছিল স্বদেশ। টাটকা ইলিশে পেটির স্বাদ, গন্ধ আলাদা! কাঁটা বেছে তেল, মাছ, ডিম আলাদা করে ধীরে ধীরে খেয়েছি তৃপ্তির শেষ ছিল না! অথচ তার গলায় বিঁধেছিল একটা ধারালো কাঁটা। টুরিস্ট লজ থে অনিরুদ্ধর সঙ্গে তেজেশের বউ কেয়াকে দেখার ছবি হজম করতে পারছিল না সে। হঠাৎ ত মনে হলো, তেজেশ, কেয়া, অনিরুদ্ধ দল বেঁধে সুবোধের কাছে বেড়াতে এসেছে। সুবোধে সঙ্গে গল্পে মশগুল তেজেশকে তুলতে না পেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে অনিরুদ্ধ, কেয় লজে ঢুকে কোল্ড্ ড্রিঙ্কস খেয়ে সুবোধের বাড়িতে ফিরছে দুজন। কিন্তু অনিরুদ্ধর হা ব্রিফ্‌কেস, কেয়ার কাঁধে কিট্‌স্‌ব্যাগ কেন? সুবোধের বাড়িতে বোঝা রেখে আসতে কি ভু গেল ওরা? হতে পারে। এরকম খুচরো ভুল হামেশা ঘটে। অবাক হবার কিছু নেই। কুটি গেঁয়ো লোকের মতো নিজের প্রাচীন সংস্কারে লজ্জা পেল স্বদেশ। ইলিশ মাছভাজার দ মিটিয়ে একটা সাইকেল রিকশ ধরে সুবোধের বাড়ি পৌঁছেছিল সে। বাড়ি চিনে রিকশওল নিয়ে গিয়েছিল তাকে। পরিত্যক্ত লাইটপোস্ট, গঙ্গায় সূর্যাস্ত দেখার কথা ভুলে গিয়েছিল বাগানঘেরা ছিমছাম সুন্দর সুবোধের একতলা বাড়িটা চুপচাপ, নিঝুম। বন্ধুদের সপরিব আড্ডা, হল্লার সামান্য শব্দ নেই। বন্ধ লোহার গেট খুলে কোয়ার্টারের চৌহদ্দিতে ঢুকল স্বদে দিন শেষ হয়ে আসছে। গাছপালার লম্বা ধূসর ছায়া পড়েছে মাটিতে। একঝলক ঠাণ্ডা হওয় জল, মাঠ, ঘাসলতার গন্ধ পেল স্বদেশ। ঝিমঝিম করছিল তার মাথা। সেই চেনা গন্ধ! পাঁ বছর পরে নাকে ঢুকল তার। গত দু'যুগে এ গন্ধ কোথাও পায়নি। আলোড়িত হচ্ছিল বু চোখ বেঁধে বিশ্বসংসার ঘুরতে ঘুরতে শুধু এই গন্ধে সে বলে দেবে, ডায়মন্ডহারবার এসে গে

বন্ধ সদর দরজার বেল টিপতে দরজা খুলেছিল সুবোধের বৌ তনুশ্রী। অবাক হয়ে দেখল স্বদেশকে। বিশ্বাস করতে পারছিল না স্বদেশ এসেছে। সুবোধের বন্ধুদের মধ্যে স্বদেশ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে তনুশ্রী। হাসিমুখে স্বদেশ বলেছিল, এসে গেলাম।

একা?

স্বদেশ বলেছিল, প্রথমবার একা দেখে গেলাম। সবাইকে নিয়ে পরে একদিন আসব এক মুহূর্ত থেমে স্বদেশ বলল, এখন থেকে কতবার যে এখানে আসতে হবে জানি ন

কেন?

বলব।

স্বদেশ ভাবছিল, তার গলা শুনে সামনের ঘর থেকে তেজেশ্, কেয়া, অনিরুদ্ধ কেউ একজ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এল না। ভেতরে দুসারি অন্ধকার, নিস্তব্ধ ঘর। কেউ আছে, মনে হ না। বসার ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে তনুশ্রী বলল, আপনার বন্ধু অফিস ঘরে আছে। চলু

এক চিলতে দালান পেরিয়ে তনুশ্রীর সঙ্গে ডানদিকের একটা ঘরে গেল স্বদেশ। শৌখি ডিভানে আধশোয়া সুবোধ সিগারেট টানছে। ডিভানের পাশে আছে একটা টেবিল, দুটো চেয়া লোহার র‍্যাকে রয়েছে অনেক ফাইল। স্বদেশ ঘরে ঢুকতে ধড়ফড় করে উঠে বসল সুবো প্রায় এক বছর পরে দেখা হলো দু'জনের। বেশ মোটা হয়েছে সুবোধ। স্বদেশ বসল ডিভা তার পাশে।

কী খাবেন, চা, না কফি?

তনুশ্রীর প্রশ্নে স্বদেশ বলল, চা।

ব্যালকনিতে বসছি আমরা।

তনুশ্রীকে বলল সুবোধ। সুবোধ, তনুশ্রীর সুখের সংসার। স্বচ্ছলও বটে। কুড়িটা ডান্‌হিলের ঝকে প্যাকেট, দেশলাই বাক্স হাতে নিয়ে সুবোধ বলল, চল্, বারান্দায় বসি।

সুবোধের সঙ্গে বারান্দার এসে দাঁড়াল সে। দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম খোলা বিশাল বারান্দা। জাইক করা মেঝে। বেতের ছ'টা চেয়ার, গোল টেবিল রেখেও বারান্দার আধখানা ফাঁকা য়ছে। কুশন্ ঢাকা বেতের একটা দোলনা ঝুলছে ফাঁকা জায়গাটায়। বারান্দার গা ঘেঁষে ফুলের গান। গোলাপ, বেল, রজনীগন্ধার সঙ্গে রয়েছে টবে ডালিয়া, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা। বাগানের শেই গঙ্গা। সূর্য ডুবছে। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল স্বদেশ। জল, আলোয় গঙ্গা, আকাশ াকার। আশপাশের গাছগাছালিতে ডাকাডাকি করছে হরেক জাতের পাখি। দিন শেষের বছা আলোয় সরব হয়ে উঠেছে সব গাছ। তনুশ্রীর সঙ্গে বারান্দায় এল চোদ্দ, পনের বছরের টি ছেলে। তার হাতে স্টিলের ট্রে। ঝকঝকে ট্রে-তে সাজানো টিপট্ কাপ ডিশ, তিনটে টে বিস্কুট, পোটাটো চিপ্‌স, ডালমুট্। দশ মিনিটে তিনটে ডান্‌হিল সুবোধ শেষ করতে স্বদেশ াল, ব্যাপার কী তোর?

সুবোধ তাকাল।

এত সিগারেট খাচ্ছিস কেন?

মন খারাপ।

মানে?

চিন্তায় আছি।

সুবোধের জবাব শুনে অবাক হলো স্বদেশ। নীতিবাগীশ যে সুবোধ সিগারেট ছুঁতো না, খারাপের উপশমে তাকে এন্তার সিগারেট ফুঁকতে দেখলে অবাক হবারই কথা। তার ওপর ং সাইজ্ বিদেশি ডান্‌হিল! দামি বোন চায়নার চায়ের কাপ স্বদেশের হাতে দিয়ে তনুশ্রী ় করল, কী খাবেন রাতে? মাছ, না মুরগি, অথবা দুটোই?

হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি পরা ছেলেটাকে দেখিয়ে তনুশ্রী বলল, আমাদের যদুর রান্না খেলে তাক গে যাবে আপনার।

প্রশংসা শুনে নাবালক যদুর মুখে হাসি ফুটেছে। তনুশ্রী বলল, প্রথম যখন এল, একদম কাট। শিখিয়ে পড়িয়ে গত এক বছরে পাকা রাঁধুনি বানিয়েছি যদুকে। কী রে যদু বল?

কর্ত্রীর কথায় সায় দিল যদু। চায়ের কাপে চুমুক দেবার আগে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে লা প্যাকেট স্বদেশের সামনে ধরল সুবোধ। পেছনে সোনালি ব্যান্ডেজ-বাঁধা লম্বা সিগারেটের মাকের সুঘ্রাণ নাকে গেলেও শার্টের বুকপকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট বার করে বিলে রাখল স্বদেশ। বলল, আর কিছুতে মৌতাত হয় না।

প্যাকেট দেখে মুচকি হেসে সুবোধ বলল, ভদ্রলোকের এক কথা। এখনও চারু চালিয়ে চ্ছিস! বেশ!

সিগারেট ধরিয়ে চায়ে চুমুক দিল সুবোধ। পোটাটো চিপ্‌স্ চিবোচ্ছে স্বদেশ। যদুকে তনুশ্রী ল, মাংসের কোর্মা, মাছের তেলঝাল, দুই হবে। মাংস, মাছ ধুয়ে, বেছে, মশলা তৈরি করে কবি আমাকে।

রান্নার মেনু বলে স্বদেশের দিকে তাকিয়ে হাসল তনুশ্রী। যদুকে সুবোধ বলল, ড্রয়ার খুলে গারেটের একটা প্যাকেট দিয়ে যা।

এক মিনিটের মধ্যে ডান্‌হিলের নতুন প্যাকেট এসে গেল টেবিলে। কুড়িটা সিগারেটের

চারকোনা পাতলা বাক্স। গা সিরসির করছিল স্বদেশের। সুবোধের দুশ্চিন্তার কারণ জান
কৌতূহল হচ্ছিল। তবু প্রশ্ন করল না। তনুশ্রীর আচরণে ছিটেফোঁটা উদ্বেগ নেই। স্বামীর স
বেধড়ক ডান্‌হিল ফোঁকায় সে বিচলিত নয়। নিজের মজায় মেতে আছে, কথা বলছে।

চা শেষ করে টেবিলের ওপর খালি কাপ নামিয়ে রাখল সুবোধ। সিগারেটে তিন-চার
টান মেরে বলল, খুব চাপে আছি।

কথাটা বলে এক লহমায় সে দেখে নিল স্বদেশের মুখ। স্বদেশ তাকিয়ে আছে। সিগারে
জ্বলন্ত টুকরো ছাইদানে গুঁজে সুবোধ বলল, রায়দীঘির বাঁধে একটা সামান্য ফাটল দেখা গে
মামুলি মেরামতের কাজ। ঠিকেদার, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার চাইছে, গোটা বাঁধ ক্ষতিগ্র
ভেঙে পড়ার মুখে, লিখে দিই আমি। কী যে করি?

নতুন সিগারেটে আগুন ছোঁয়াল সুবোধ। চারমিনার ধরিয়ে সুখটান দিল স্বদেশ। ধোঁ
ছাড়ল গলগল করে। তখনই বেজে উঠল কলিং বেল। কলিং বেলে ডক্টর জিভাগো ছবির সু
চেয়ার ছেড়ে সদরের দিকে গেল তনুশ্রী। দরজা খোলার সঙ্গেই শুরু হলো দুই নারীক
কলকাকলি। তনুশ্রীর গলা চিনতে পারল স্বদেশ। অন্যজন যে কে, হদিস পেল না। সুবো
বাড়িতে ঢোকার পর থেকে অশান্তি জমছিল স্বদেশের মনে। তার অনুমান মেলেনি। কে
তেজেশ, অনিরুদ্ধ কেউ আসেনি এখানে। তার মানে, সে যা সন্দেহ করেছিল, সেটাই সতি
সরকারি টুরিস্ট লজে সারাদিন অনিরুদ্ধর সঙ্গে কাটিয়ে তেজেশের বউ কেয়া তখন বা
ফিরছিল। ঠিক তাই। আর কিছু হতেই পারে না! কিন্তু কী হলো তাতে? এ ঘটনায় কী প্র
হলো? ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, সুনীতি, দুর্নীতি বিচারে এ ঘটনার কোনও তাৎপর্য নে
তাহলে? ভাজা ইলিশের লম্বা ঢেঁকুর উঠতে চমকে গেল স্বদেশ। এরকম টাটকা ইলিশভা
পাঁচ সাত পিস্ খেয়ে আগে কখনও ঢেঁকুর তোলেনি সে। ভেজাল তেলে মাছ ভেজেছিল নাকি
কিন্তু ইলিশ ভাজতে কতটুকুই বা তেল লাগে? মাছের তেলে মাছ ভাজা প্রবাদের জনক (
ইলিশ।

চিপস্, চানাচুর, চা, ফুলের বাগান, গঙ্গা, সূর্যাস্ত, সরব গাছপালার নিবিড় সান্নিধ্যেও সহ
হতে পারছিল না সে। সুবোধ, তনুশ্রীর সঙ্গে কথা, গল্পের মধ্যে অস্বস্তির চোরা স্রোত বইছি
তার মনে। ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। চারমিনারে মৌজ করে টানার মুহূর্তে কলিং বেলে
বাজনা চমকে দিয়েছে তাকে।

তনুশ্রীর সঙ্গে বারান্দায় কেয়া এসে দাঁড়াতে ভূত দেখল স্বদেশ। সূর্য ডুবে গিয়েছি
বারান্দার আলো এখনও জ্বালা হয়নি। শেষ বিকেলে কনে দেখা আলোর পরে রাতের শুরু
কিছুক্ষণ ভূতুড়ে অন্ধকার থাকে পৃথিবীতে। এ হলো ভূত দেখা অন্ধকার। মানুষকে তখন ভূতে
মতো দেখায়। আবছা অন্ধকারে মুখের অভিব্যক্তি দেখা না গেলেও ভূত চেনা যায়। স্বদেশ
দেখে বিস্মিত কেয়া বলল, স্বদেশদা, আপনি?

কিছু বলতে পারল না স্বদেশ।

হাসার চেষ্টা করল।

ভারতী, ছেলেমেয়ে কোথায়?

কেয়ার দিকে তাকিয়ে স্বদেশ বলল, বাড়িতে।

তারপর প্রশ্ন করল, তেজেশ কোথায়?

সান্দাকফু গেছে। ট্রেক্ করবে। আমাকেও যেতে বলেছিল। আমি বললাম, অসম্ভব।

আমার কম্ম নয়।

বারান্দার আলো জ্বেলে দিল তনুশ্রী। বেতের চেয়ারে শরীর ছেড়ে বসে পড়েছিল কেয়া। কাঁধ থেকে মেঝেতে নামিয়ে রেখেছিল কিট্‌সব্যাগ। শাড়ি, চুল, শরীর সাজানো গোছানো থাকলেও তার মুখে, চোখে ঘন ক্লান্তি জড়িয়ে ছিল। তনুশ্রী প্রশ্ন করল, বাসে এলে?

হ্যাঁ।

দেখেই বুঝেছি।

কীভাবে বুঝলে?

কেয়ার প্রশ্নের ব্যগ্রতা তনুশ্রীর কানে গেল না। সহজ গলায় সে বলল, বোঝা যায়। মুখে ফুটে ওঠে বাস জার্নির ধকল। দু'চোখ বসে যায়। খুব ক্লান্ত লাগছে তোমাকে। স্নান কর।

তনুশ্রীর কথার মধ্যে সুবোধ বলল, এতটা রাস্তা ঠেঙিয়ে বেচারি এল। আগে চা দাও এক কাপ।

সুবোধের কথায় বিগলিত কেয়া বলল, আঁপনি রিয়েলি ফ্যাসিনেটিং!

চোখ পাকিয়ে নকল রাগে তনুশ্রী বলল, আমার বরের ওপর নজর দিও না।

কয়েক মিনিটে চা নিয়ে এলো যদু। মিঠে হাসি ছড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কেয়া বলল, হাঁপিয়ে উঠেছিলাম কলকাতায়। তেজেশ পাহাড়ে। ছেলে দুটো গেছে মামার বাড়ি। ফ্ল্যাটে আমি একা। আজ দুপুরে হঠাৎ খুব নিঃসঙ্গ লাগল। ব্যস্, তখনই ঠিক করলাম, চলো ডায়মন্ডহারবার! শেষ দুপুরে বাসে উঠে আধঘন্টা আগে এখানে পৌছলাম। পৌছতে সময় লাগল এক ঘন্টা বেশি। ড্রাইভারের অবশ্য দোষ ছিল না। বাসের সামনের একটা চাকা রাস্তায় পাংচার হয়ে গেলে ড্রাইভার কী করবে? ফুটো চাকা খুলে নতুন একটা লাগাতে চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগে গেল। বাসে অকথ্য ভিড়, অসহ্য গরম। চাকা মেবামতের সময় কিছু প্যাসেঞ্জার রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছিল। বাস ঠিকমতো এলে আরও আগে পৌছে যেতাম।

কী সরল, ভঙ্গিতে অনর্গল মিথ্যে বলে চলেছে কেয়া! কেয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে স্বদেশের কষ্ট হচ্ছিল। জোরালো আলোর ঠিক সামনে বসে ভয় পাচ্ছিল সে। তার কপাল, মুখের প্রত্যেকটা ভাঁজ, কুঞ্চন, দেখছিল কেয়া। সন্দিগ্ধ কেয়া প্রশ্ন করল, আপনি কখন এসেছেন?

দুপুরে। সাড়ে বারোটায়।

জবাব দিতে গলা কেঁপে গেল তার। কপাল টিপে বসে আছে সুবোধ। বাঁ হাতের দু'আঙুলে পুড়ছে রাজা সাইজ সিগারেট, ডান্‌হিল। আরও কিছু শোনার জন্যে স্বদেশের দিকে তাকিয়ে আছে কেয়া। তার বুকের ওপর ছটোপাটি করছে পনি টেল বাঁধা ঘন কালো, খাটো চুল। স্বদেশ বলল, বাস থেকে নেমে গঙ্গা পেরিয়ে গিয়েছিলাম চকশুকদেবপুর। আমার এক মাস্টারমশাই, কালীপদ রক্ষিত, থাকেন সেখানে। স্কুলে পড়েছিলাম তাঁর কাছে। পেনশনের আশায় বুড়ো মানুষটা তিন বছর ঘুরছেন। কিছুদিন আগে গড়িয়াহাটের কাছে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। পঁচিশ বছর পরে উদ্‌ভ্রান্ত মাস্টারমশাইকে রাস্তায় দেখে খুব কষ্ট হয়েছিল। তাঁর পেনশন আদায় করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছি আমি। কালীপদবাবুর বাড়িতে কিছুক্ষণ থেকে তারপর এখানে এলাম।

স্বদেশ শেষ করার আগে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে কেয়া বলল, স্নান করবো।.

কেয়াকে নিয়ে তনুশ্রী বারান্দা থেকে চলে যাবার পরেও গুম হয়ে থাকল সুবোধ।

কী করবি ভাবছিস?

স্বদেশের প্রশ্নে সুবোধ বলল, কী ব্যাপারে?

বাঁধের রিপোর্ট লেখা।

কী করা যায়?

সুবোধের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে স্বদেশ জিজ্ঞেস করল, মন খারাপ সারাতে রোজ ক'প্যাকেট ডান্‌হিল লাগে তোর?

কপাল থেকে হাত সরিয়ে স্বদেশের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সুবোধ। তারপর বিড়বিড় করল, শালা, অমায়িক খচ্চর!

স্বদেশের চোখে চোখ রেখে সুবোধ প্রশ্ন করল, তোরা ষড় করে এসেছিস নাকি?

মানে?

কেযা, তুই।

স্বদেশের মুখ থেকে নজর সরিয়ে চাপা গলায় সুবোধ প্রশ্ন করল, রাতে একসঙ্গে থাকার মতলব আছে?

কেয়াকে জিজ্ঞেস করিস।

স্বদেশ বুঝেছিল, সুবোধের প্রশ্নটা শুধু খোঁচা, নয়। তার এবং কেয়ার পিঠোপিঠি আসার যোগাসাজশ খুঁজছে সুবোধ।

৪

রোদে গলে কাদা হয়ে আছে পিচের রাস্তা। বাসের চাকার তলা থেকে পটপট শব্দ আসছে। রাস্তার পিঠের চামড়া তুলে নিচ্ছে দ্রুতগামী বাস। এই শেষ বৈশাখে এক, দুপশলা বৃষ্টি না হলে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি ফেটে হাঁ হয়ে যাবে দু'পাশের মাঠ, মাটি। ডাবের ঢেঁকুর দ্বিতীয়বার না ওঠায় স্বদেশের মনের প্রশান্তি বজায় আছে। গত তিন বছরে একাধিকবার ডায়মন্ডহারবারে আসতে হয়েছে তাকে। ঠিকঠাক হিসেব, সাতবার। এই সাতদফা যাতায়াতে সুবোধের বাড়িতে সাকুল্যে তিন রাত থাকতে বাধ্য হয়েছে। ইচ্ছে করেই সুবোধ, তনুশ্রীর আশ্রয় এড়িয়ে গেছে। সুবোধের বাড়ি প্রথম রাতের টুকরো ঘটনা, স্মৃতি আরামদায়ক, হলেও কেমন এক অস্বস্তি মিশে আছে সে স্মৃতিতে। সব মিলে সে রাতটা স্বদেশের সুখকর লাগেনি। সুবোধের বাড়িতে রাত কাটানোর পর থেকেই পেটের ব্যামোটা ধরেছিল তাকে। কখন, কীভাবে শরীরে ব্যাধিটা এল, টের পায়নি। পাওয়া সম্ভব ছিল না। সুবোধের বাড়ির পরিচ্ছন্নতা, কাচের বাসনপত্র, খাবারের মান, এককথায় তুলনাহীন। ছোঁয়াচে ব্যাধি সেখানে থাকার কথা নয়। সুবোধের অতি বড় শত্রুও এ অপবাদ রটাবে না। স্বদেশও রটায়নি। বছরখানেক ব্যারামে ভুগে, কেন এমন হলো, ভাবতে ভাবতে ঘটনার রশি ধরে উৎসে পৌঁছে গিয়েছিল। গরহজম, চোঁয়াঢেকুরের সূচনাপর্ব মনে পড়েছিল। সুবোধের বাড়ি থেকে এই সর্বনেশে ব্যাধি ধরেছে তাকে।

সেই সন্ধেতে জোর আড্ডা বসেছিল সুবোধের বারান্দায়। কেয়া, তনুশ্রী স্নান সেরে, শাড়ি বদলে রীতিমতো সেজেগুজে বারান্দায় হাজির হতে কলঘরে ঢুকেছিল স্বদেশ। পরিপাটি স্নানের পর, প্যান্ট, শার্ট ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরে সে ফিরে এল বারান্দায়। তবে আগেই স্নানশেষ

হয়েছিল সুবোধের। গঙ্গায় তখন জোয়ার। ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়ায় জুড়িয়ে গেল স্বদেশের ভিজে শরীর। বাতাসে ফুলের গন্ধ পেয়ে লম্বা শ্বাস টানল সে। বারান্দায় ফিরে সিগারেট ধরিয়েছিল সুবোধ। তার দু'আঙুলে জ্বলন্ত আধখানা সিগারেট দেখতে পেল স্বদেশ।

চেয়ারে স্বদেশ বসতে সুবোধ প্রশ্ন করল, একটু ড্রিঙ্ক্‌স্ নিবি?

ঘুমে জড়িয়ে আসছিল স্বদেশের দুচোখ। সে কিছু জবাব দেবার আগেই বেজে উঠল দরজার বেল। ডক্টর জিভাগো ছায়াছবির বিখ্যাত টাইটেল মিউজিক। পুরনো পাতা মাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ নায়ক। পাতা ভাঙার শব্দ, সুরের তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। দরজা খুলে একজন অচেনা লোককে নিয়ে এল যদু। বছর পঞ্চাশ বয়স, মজবুত শরীর, মানুষটার মুখে নিরীহত্ব থাকলেও ধূর্ত চোখ। তাকে দেখে ঝেঁঝে উঠে সুবোধ বলল, ব্যাপার কী? কাজ বাগিয়ে ফুটে গেলেন?

লোকটার দু'চোখ মুহূর্তের জন্যে চিকচিক্ করে উঠলেও বিনয়ে বিগলিত মুখ। সে বলল, আর বলবেন না স্যার! মহা ফাঁপরে পড়ে গেছি। আপনার বাড়ি থেকে ফিরে দেখি মেয়ের ব্যথা উঠেছে। প্রচন্ড ব্যথা। তাড়াহুড়ো করে নার্সিংহোমে দিলাম তাকে। পরদিন সকাল থেকে ব্যথা ছেড়ে গেল, একদম ভ্যানিশ। তারপর তিনদিন ব্যথা নেই। কাল বিকেলে সিজারিয়ান করল ডাক্তার। মেয়ের একটা মেয়ে হয়েছে। দশ হাজার টাকার ধাক্কা! দেখুন তো কী গেরো!

খিলখিল করে হেসে তনুশ্রী বলল, গেরো কোথায় কার্তিকবাবু, দাদু হলেন। নাতনি পেলেন।

কার্তিকের মুখে হাসি ফুটতে অনুযোগের সুরে তনুশ্রী বলল, খালি হাতে সুখবর?

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেও মুহূর্তে সামলে নিয়ে কার্তিক বলল, ছি ছি, বড় অন্যায় হয়েছে! এখনই আসছি।

প্রায় দৌড়ে সদরের দিকে চলে গেল কার্তিক। তনুশ্রী বলল, চা খেয়ে যান।

তার ডাকে সাড়া দিল না কার্তিক। সুবোধ বলল, অফিসে আসবেন কাল।

নিশ্চয়।

সদরের বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কার্তিক। আধঘন্টার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ টাকার রসগোল্লা, সন্দেশ সুবোধের বাড়িতে পৌঁছে গেল। মিষ্টি নিয়ে যে লোকটা এল, সে সুবোধের চেনা। তাকে সুবোধ প্রশ্ন করল, কার্তিকবাবু কোথায়?

গাড়িতে।

সুবোধ আর প্রশ্ন করল না। লোকটা চলে যাবার পর তনুশ্রী বলল, কার্তিকবাবু মানুষটা ভাল।

হুম, আওয়াজ করল সুবোধ।

কাট্‌গ্লাসের চারটে গ্লাসে ইতিমধ্যে সুবোধ ঢেলেছিল হুইস্কি আর জিন। তনুশ্রী, কেয়া জিন, লাইম খাচ্ছিল। সুবোধ, স্বদেশের গ্লাসে হুইস্কি। ছাত্রজীবনে দু-চারবার হুইস্কি স্বদেশ যে খায়নি, এমন নয়, তবে পনের বছর অ্যালকোহল স্পর্শ করেনি। মদ সম্পর্কে কোন কুসংস্কার নেই তার। না খাবার কারণ দুটো। তার শরীরে মদ সহ্য হয় না। মদের জন্যে খরচ করার মতো যথেষ্ট টাকা তার নেই। তাছাড়া সে পেটুক, ভোজনরসিক। এক বোতল বিয়ার বা দু-পেগ হুইস্কির দাম শুনে সে হিসেব করে, এ টাকায় কতগুলো সন্দেশ, রসগোল্লা, মোগলাই পরোটা, কাটলেট পাওয়া যায়! এক বোতল বিয়ার মানে একডজন রসগোল্লা, চারশ গ্রাম রাবড়ি! হিসেব কষে তৃষ্ণার বদলে তার ক্ষুধা প্রখর হয়।

প্রথম পেগ শেষ করে দু-নম্বর ঢেলে সুবোধ বলল, এটা নামী স্টাফ। স্কচের মধ্যে কুলীন।

স্বদেশের গ্লাসের দিকে নজর পড়তে বলল, এরকম মিনমিন করে খাচ্ছিস কেন তুই?

খাব, খাব, এত তাড়া কীসের? হেসে বলল স্বদেশ।

সন্দেশ, রসগোল্লার পরিমাণ দেখে তনুশ্রীর চোখ ছানাবড়া। সুবোধকে প্রশ্ন করল, কার্তিক সামন্ত কি কোন বড় কাজের ঠিকে পেয়েছে?

তনুশ্রীর প্রশ্নে মুচকি হেসে গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল সুবোধ। তিন-চারটে প্লেটে কাজুবাদাম, চানাচুর, মশলা-মটর, পোটাটো চিপ্‌স টেবিলের ওপর নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছিল যদু। সন্দেশের বাক্স স্বদেশের সামনে ধরে তনুশ্রী বলল, নিন।

একটা, না দুটো?

স্বদেশের প্রশ্ন শুনে হো-হো করে হেসে তনুশ্রী বলল, যতগুলো খুশি। তবে রান্না খাবার যেন নষ্ট না হয়!

দুটো সন্দেশ খেল স্বদেশ। তারপর দুটো রসগোল্লা। একটার বেশি সন্দেশ খেল না কেয়া। গ্লাসে ঠোঁট ছুঁয়ে শ্লথ ভঙ্গিতে জিন খাচ্ছে সে। তার তুলনায় তনুশ্রীর গতি বেশি। পুরো ঘটনাটা স্বদেশ ভাবার চেষ্টা করল। নাতনি পাবার বা দাদু হবার আহ্লাদে ডায়মন্ডহারবার মহকুমার ধনী ঠিকেদার কার্তিক সামন্ত সেচ-দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ তলাপাত্রকে পঞ্চাশ টাকার সন্দেশ, রসগোল্লা পাঠাল। কলকাতার এক স্বদেশ সরকাব সেই মিষ্টি খাচ্ছে। ঘটনার আজব প্রক্রিয়া, যোগাযোগে ধাঁধা লাগল তার। তখনই বলিষ্ঠ চেহারার সাতাশ-আটাশের এক যুবক বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সদর থেকেই সে হাঁক দিয়েছিল, দাদা আছেন নাকি?

সুবোধ সাড়া না দিয়ে তনুশ্রীকে বলেছিল, বিপুল এসেছে। চলে আসবে এখানে।

হলো ঠিক তাই। সুবোধ, তনুশ্রীর ওপর চোখ বুলিয়ে কেয়াকে নজর করে বিপুল প্রশ্ন করল, বৌদি যে, কখন এলেন? দাদা কোথায়?

অচেনা স্বদেশকে দেখে তার সঙ্গে কেয়া এসেছে ভেবে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল বিপুল।

সুবোধ বলল, আমার বন্ধু অধ্যাপক স্বদেশ সরকারের নাম বহুবার বলেছি তোমাকে। সেই মহাজন দয়া করে আজ পায়ের ধুলো দিয়েছেন এ-গরিবখানায়।

সুবোধ থামতে বিপুল বলল, আমার নাম বিপুল পালিত, ছাপোষা আবগারি কর্মচারী। ব্যস্‌।

আরও আছে, তনুশ্রী বলল।

কলারওলা ঘি-রঙের জালি-গেঞ্জি, ফেডেড্ সবুজ জিন্‌স্-এর ট্রাউজার, বিপুলকে কয়েক সেকেন্ডে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল স্বদেশ। সুঠাম ব্যায়াম-করা শরীরে পুরুষালি সৌন্দর্য। মুখে আপাতবুদ্ধির ছাপ থাকলেও চোখের দৃষ্টি ভোঁতা। বুদ্ধি কম, সরল, বোঝা যায়। একটা চেয়ার টেনে বাগানের কোণ ঘেঁসে বিপুল বসতে সুবোধ বলল, আবগারি ইন্সপেক্টর হয়েও মদ খায় না বিপুল।

আরও একটা পরিচয় আছে, সেটা বল।

তনুশ্রীর কথা শুনে তার দিকে তাকাল সুবোধ। তনুশ্রী বলল, বিপুল শুধু মদ নয়, ঘুষও খায় না।

মিটিমিটি হাসছে বিপুল।

হেসো না, খুন হয়ে যাবে।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুবোধ বলল বিপুলকে।

প্লেট থেকে একমুঠো কাজুবাদাম তুলে নিল বিপুল। এতক্ষণ একটা, আধখানা করে কাজু খাচ্ছিল চারজন। দামি খাবার যত বেশি সময় ধরে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যায়, তত ভাল। দুবারে দু-মুঠো তুলে কাজুর প্লেট বিপুল খালি করে দিলেও সুবোধ বা তনুশ্রী গায়ে মাখল না। কেয়া, স্বদেশে চোখাচোখি হলো একবার।

রসগোল্লার হাঁড়ি, সন্দেশের বাক্স খুলে উঁকি দিয়ে বিপুল বলল, আজ দেখছি এলাহি আয়োজন।

মিষ্টি খান, তনুশ্রী বলল।

কী দিয়ে শুরু করব?

যা খুশি।

চারটে রসগোল্লা, চারটে সন্দেশ খেয়ে ঢকঢক করে প্রায় এক বোতল ঠাণ্ডা জল শেষ করে ফেলল বিপুল। তনুশ্রী, কেয়ার গ্লাসে দ্বিতীয় পেগ জিন, লাইম ঢেলে স্বদেশকে সুবোধ প্রশ্ন করেছিল, এক পেগ নিয়ে রাত কাবার করবি নাকি?

সন্দেশ, রসগোল্লা ছেড়ে মদ খায় কেউ?

স্বদেশের কথায় সায় দিয়ে বিপুল বলেছিল, আমার আঁতের কথা বলেছেন দাদা।

একমুঠো চানাচুর মুড়ির মতো মুখে পুরে গাল ফুলিয়ে চিবোতে শুরু করল বিপুল।

হঠাৎ পুলক জেগেছিল কেয়ার মনে। বিপুলকে নিয়ে মজা করার জন্যে সে বলল, বিয়ে করা বউ কিন্তু ফেলে রাখতে নেই। ঘরে তুলছেন কবে?

প্রশ্ন শুনে দপ্ করে নিভে গেল বিপুল। অন্ধকার হলো তার মুখ। স্বদেশ বুঝল, বিপুলের কোন ব্যথার জায়গায় না জেনে খোঁচা মেরেছে কেয়া। কেয়াও টের পেয়েছে, অজান্তে গোলমাল পাকিয়েছে সে। এরকম হবার কথা নয়। বিপুলের সঙ্গে আগেও দু-তিনবার তার বিয়ে নিয়ে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করেছে কেয়া। তখন পাশে অবশ্য তেজেশ ছিল।

বিপুলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল সুবোধ। বিয়ের কথায় বিপুলের মতো হইচই করা, তাজা ছেলেকে মুষড়ে পড়তে দেখে অবাক হয়েছে সে। বেকুব কেয়া কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবে, বুঝতে পারছে না। স্থির চোখে বিপুলের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে তনুশ্রী প্রশ্ন করেছিল, মালবিকার কী খবর?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ম্লান হেসে বিপুল বলল, মালবিকার সঙ্গে আমার বিয়েটা হচ্ছে না।

সে কি?

হ্যাঁ, তাই।

তোমাদের বিয়ের রেজিস্ট্রি তো হয়ে গেছে।

তাতে কি?

কথা হারিয়ে জিনের গ্লাস শেষ করে ফেলল তনুশ্রী।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিপুল বলল, চারবছর আগে রেজিস্ট্রির সময়ে আমাদের দুজনের বয়সই কম ছিল। ছেলেমানুষ ছিলাম আমরা। অবস্থাও তখন ছিল অন্যরকম।

অবস্থা মানে?

সুবোধের প্রশ্নে বিপুল বলল, সে বছরেই আই এ এস পরীক্ষায় বসার কথা ছিল আমার বসলাম। কিন্তু শিকে ছিঁড়ল না। মালবিকার ধারণা ছিল আই এ এসটা আমি পাবই। খুব হতাশ

হয়েছিল সে। তারপর ঢুকে পড়লাম আবগারি ইন্সপেক্টরের এই চাকরিতে।

চাকরি করছ আড়াই বছর। দু'আড়াই মাস আগেও এখানে ঘুরে গেছে মালবিকা। তাহলে?

সুবোধের প্রশ্ন বিপুল শুনতে পেল না। টেবিলের ওপর একরাশ মিষ্টি, প্লেট ভর্তি চানাচুর, পোটাটো চিপ্‌স, মশলা-মটর, আদা, শসা কুচিয়ে রেখে গেছে যদু। খাবারে মন নেই বিপুলের। মন খারাপ সারাতে যে সুবোধ একটানা সিগারেট খাচ্ছিল, তার হাতে সিগারেট নেই। সুবোধের প্রশ্নের জবাব বিপুল দিল আট, দশ সেকেন্ড পরে। বিপুল বলল, অল ইন্ডিয়া সার্ভিসে আমি ধেড়াবার পর থেকেই বিগড়োতে শুরু করেছিল মালবিকা। এমন সব বিষয় নিয়ে ঝগড়া করত, যেগুলো কোন বিষয় নয়। মাঝে মাঝে আমার মেজাজও খারাপ হতো। তবু সম্পর্কটা বাঁচাতে চেয়েছিলাম। বাঁধন আলগা হচ্ছে জেনেও মালবিকা সরে যায়নি। কেন যায়নি? আমি ভেবেছিলাম ভালবাসা। পরে বুঝলাম, তা নয়। আমি চাকরি পাবার পরে নতুন প্রত্যাশা জেগেছিল তার মনে। সে ভেবেছিল, এ চাকরিতেই আই এ এস-এর সমান উন্নতি করব আমি। কিন্তু তা সম্ভব নয় বুঝে—

এত তাড়াতাড়ি কি করে বুঝল? ইন্সপেক্টর থেকে ডেপুটি কন্ট্রোলার, কন্ট্রোলার হবার নজির আছে।

সে রকম উন্নতি নয়।

তাহলে?

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বিপুল বলল, খুব তুচ্ছ ঘটনা থেকে শুরু হয়েছিল, মন কষাকষি, খিটিমিটি ঝগড়া। মুঠো ভরে বাদাম, চানাচুর খাই আমি। অসহ্য লাগত মালবিকার।

লাগতেই পারে।

আমি আই এ এস-এ ফেল করার আগে পর্যন্ত লাগত না। বরং আমার খাবার ওই ভঙ্গি এন্‌জয়্‌ করত মালবিকা। আই এ এস পেলে আজীবন করত।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সুবোধ বলল, তুমি খুব ছেলেমানুষ বিপুল। প্রেমিকার চেয়ে খাবার স্টাইলটা কি বেশি দামি? মুঠো ভরে বাদাম, চানাচুর না খেয়ে খুঁটে খুঁটে, একটা, দুটো করে তুলে মুখে ঢোকাতে অসুবিধে কী? দেখতেও ভাল লাগে। এস্‌থেটিক্স, রুচি বলে তো একটা কথা আছে। মেয়েরা আবার এসব ব্যাপারে খুব পিটপিটে, স্পর্শকাতর। বিশেষ করে স্বামীর সহবত নিয়ে সব স্ত্রীর নজর খুব কড়া।

বিপুলের মুখে লেগে ছিল শুকনো হাসি। গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুবোধ বলল, এতদিন বলিনি। কথা যখন উঠল, আজ বলছি। তোমার খাবার এই ধরন, আমারও পছন্দ নয়। আমার ধারণা তনুশ্রীও অপছন্দ করে। সবকিছু খাওয়ার স্বতন্ত্র কায়দা আছে। জলের মতো চোঁচো করে মদ খাওয়া যায় না। মুড়ি, চালভাজার মতো মুঠো ভরে ভুজিয়া খায় না কেউ। তবে সবটাই ব্যক্তিগত অভিরুচি।

আমি জানি, বিপুল বলল, আসলে ছেলেবেলা থেকে এভাবেই খেয়েছি। একডজন ভাইবোন ছিলাম আমরা। খাবার যা থাকত, সকলের পেট ভরার কথা নয়। তাড়াহুড়ো করে যে পারল, সে ভরে নিল, যে পারল না, উপোস করল।

গঙ্গার বুক থেকে ভেসে এল স্টিমারের ধ্বনি। জলের ছলাৎছল শব্দ। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বিপুল বলল, একটা ধামায় মুড়ি, মুড়কি, কোনদিন মুড়কির বদলে ছোলা, বাতাসা, চানাচুর ভরে সাত ভাইবোনকে রোজ সকালে জলখাবার দিত মা। চারভাই তিনবোন এক ধামায়, অন্য এক

ধামায় সবচেয়ে ছোট তিনভাই, এক বোন। বড় ছেলেমেয়েগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ছোটদের ওপর নজর রাখত মা। আমি ছিলাম বড়র দলে। মা চোখের আড়ালে গেলেই ধামার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম সাতজন। ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়তাম না। ঠাণ্ডা মাথায়, স্থির হয়ে বসে কত তাড়াতাড়ি মেশিনের মতো ধামা শেষ করা যায়, প্রতিযোগিতা চলত। চার ভায়ের সঙ্গে এঁটে উঠত না তিন বোন। বিশেষ করে মেজদি আর আমার পরের বোন রুমা ছিল খুব শান্ত। তারা রোগা হয়ে যেতে থাকল। দুজনেই এখন বিবাহিত, ছেলেমেয়ের মা। আজও তারা ক্ষীণজীবী।

তনুশ্রী বলল, যত বানানো গল্প তোমার!

একফোঁটা ভেজাল নেই।

এক মুহূর্ত থেমে বিপুল বলল, ছেলেবেলার অভ্যেস আজও যায়নি। মালবিকা চলে যাবার একমাত্র কারণ কিন্তু আমার এ অভ্যেস নয়। সে বুঝে গেছে চাকরিতে আমার ভবিষ্যৎ নেই।

তুমি বুঝিয়েছ?

সুবোধের মন্তব্য শুনে বিপুল বলল, নাহ্।

তাহলে?

আমার সঙ্গে চাকরির নানা খুঁটিনাটি আলোচনা করতে গিয়ে মালবিকা টের পেয়েছিল, লাখ লাখ টাকা আমার চারপাশে উড়ছে। ইচ্ছে করলে কিছুটা খাবলে নিতে পারি আমি। কিন্তু সে ইচ্ছে আমার নেই। মালবিকাকে অনুরোধ করেছিলাম, যা খুশি বলতে পারো আমাকে, ঘুষ নিতে বলো না।

সে বলল, স্টুপিড।

আরও খারাপ শব্দ, 'ইমপোটেন্ট' বলতেও তার জিভ কাঁপে নি।

হঠাৎ কমে গিয়েছিল বারান্দার আলো। পাথর হয়ে গেছে সুবোধ, তনুশ্রী। চোঁয়াঢেঁকুর তুলল স্বদেশ। জীবনে প্রথম চোঁয়াঢেঁকুর তুলে চিনতে পারেনি। অস্বস্তিতে কলঘরে গেল সে। তখনও বোঝে নি, তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সুখের দিন ফুরিয়ে গেল।

কলঘর থেকে ফিরে চেয়ারে বসে স্বদেশ দেখল, বিপুল চলে গেছে। সুবোধ বলল, ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শুনিয়ে সন্ধ্যেটা মাটি করে দিল।

জ্বলন্ত সিগারেট ছাইদানে রেখে গ্লাসে নতুন পেগ ঢালল সুবোধ। স্বদেশের পেটে অস্বস্তি, বুকে জ্বালা। ঘনঘন ঢেঁকুর উঠছে। সকালে ভাত পড়েনি পেটে। শেষ বিকেলে দু'টুকরো ইলিশমাছ ভাজা, তারপর সুবোধের বাড়িতে পোটাটো চিপস্, চানাচুর, সন্দেশ, রসগোল্লা খেয়ে তার খিদে কমেনি। বরং বেড়ে গিয়েছিল। গরমভাত, মুরগি, মাছ পেট ভরে খেয়ে একটা নিটোল ঘুমের স্বপ্ন দেখছিল সে। সব ভেস্তে গেল। গা গুলোচ্ছে তার। কেন এমন হলো? কালীপদবাবুর বাড়িতে দুপুরে জল খেয়েছিল দু'গ্লাস। অজপাড়াগাঁর এঁদো পুকুরের বিষাক্ত জল খেয়ে বোধহয় এই উপদ্রব, স্বদেশ ভেবেছিল।

কেয়া বলল, মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আরও একটু জিন খাও, চাঙ্গা হয়ে যাবে।

কথাটা বলে কেয়ার গ্লাস ভরে স্বদেশকে সুবোধ প্রশ্ন করল, খাচ্ছিস না কেন?

কোন ওষুধ-বিষুধ আছে?

স্বদেশের ভয়ার্ত গলা শুনে সুবোধ প্রশ্ন করল, কেন, কী হয়েছে তোর?

ঢেঁকুর উঠছে, বমি আসছে।

কী খেয়েছিস রাস্তায়?

দু'পিস ভাজা ইলিশ।

স্বদেশ অসুস্থ দেখে ব্যস্ত হলো সুবোধ। বারান্দা থেকে ভেতরে গিয়ে দু'তিন মিনিট পরে দুটো ট্যাবলেট এনে স্বদেশকে বলল, চিবিয়ে খা।

ট্যাবলেট দুটো মুখে পুরে দাঁতের চাপে গুঁড়ো করে ফেলল স্বদেশ। আবছা মিঠে স্বাদ। বোতল খুলে জল খেয়ে সে প্রশ্ন করল, কোথায় শোব?

অবাক তনুশ্রী প্রশ্ন করল, খাবেন না?

নাহ্, বমি হয়ে যাবে।

এত রান্না!

আমার ভাগের খাবার ফ্রিজে রেখে দাও। কাল খাব।

সুবোধ বলল, ইচ্ছে না থাকলে খেয়ে কাজ নেই।

বিছানায় স্বদেশকে পৌঁছে দিল সুবোধ। মশারি টাঙানো চমৎকার, নরম বিছানা। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছিল। দিনে গরমের পর ঠাণ্ডা হয়েছে চারপাশ। রাত প্রায় দশটা। পৃথিবী নীরব। সামান্য দূরে গঙ্গার ঢেউ, স্রোত, বহমান জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছে স্বদেশ। ওষুধ খেয়ে সুস্থ বোধ করছিল সে। বারান্দার আড্ডা যে ভাঙেনি মাঝে মাঝে হাসির শব্দে টের পাচ্ছিল। স্নানের পর বারান্দায় বসে ঘুমে বুজে যাচ্ছিল তার দু'চোখ। বিছানায় শুয়ে চোখে ঘুম নেই। ঘুম ছুটে গেছে। আধঘন্টা এপাশ ওপাশ করেও ঘুম এল না। অন্ধকার বিছানায় শুয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ল মৃন্ময়ের মুখ। বেচারি মৃন্ময়। পার্কসার্কাস স্কুলে চাকরি পাবে, এ আশায় বসে ছিল দেড়, দু'মাস। ভগ্নীপতি স্বদেশের ওপর অগাধ ভরসা মৃন্ময়ের। স্কুলের হেডমাস্টার শ্যামসুন্দরবাবুর কথাগুলো মৃন্ময়কে বলেনি স্বদেশ। অভিনেত্রী সুচিত্রা মজুমদারকে ধরার জন্যে এলাকার পার্টি নেতা, শিক্ষাসেলের জগদীশ সেন, চেষ্টা চালিয়েছিল গোপনে। ধরতে পারেনি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এলাকা কমিটির এক মেজো নেতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল স্বদেশের। নেতার নাম গদাধর কুণ্ডু। মানুষটা খারাপ নয়। স্বদেশকে আশ্বাস দিয়েছিল সে। ক্ষীণ আশা স্বদেশের মনেও জেগেছিল। ইন্টারভিউ দিয়ে মৃন্ময় যখন জানাল যে, গদাধর কুণ্ডুর ছেলেও চাকরি প্রার্থীদের একজন, বিছানা নিয়েছিল স্বদেশ। তখনই সে বুঝেছিল, মৃন্ময়ের চাকরির কোন আশা নেই।

৫

বাস এসে দাঁড়াল সরষে হাটে। বড় গঞ্জ এলাকা। ডায়মন্ডহারবার, ফলতা, রায়চকের তিনটে মূল সড়ক এসে মিশেছে সরষে হাটে। রাস্তার ধারে তরমুজের পাহাড়। গিজগিজ করছে মানুষ। গেঁয়ো মানুষের গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সমান। রোদ, বৃষ্টি, শিহরণ কিছুই লাগে না তার শরীরে।

হাইকোর্টে পরশু সাক্ষি দিতে যাবে স্বদেশ। গোলমাল পাকিয়েছে গোঁয়ার মৃন্ময়। এলাকা কমিটির নেতা গদাধর কুণ্ডুর ছেলে এবং সমগোত্রের আরও তিনজনের পার্কসার্কাস স্কুলে চাকরি হয়েছে শুনে মৃন্ময় ক্ষেপে গেল। বৌয়ের গয়না বেচে শিক্ষক নিয়োগে কারচুপির অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা করল সে। স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখার ইনজাংশন পেল।

স্কুল পরিচালকমণ্ডলীকে একমাসের মধ্যে আপিল করার অনুমতি দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ পাঠিয়েছিল আদালত। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষের আপিল মেনে নিয়ে সাধারণ

ছাত্রস্বার্থের কথা ভেবে চারজন নতুন শিক্ষক চাকরিতে বহাল হলো। তবে সবটাই শর্তসাপেক্ষ। নিয়োগ সংক্রান্ত কারচুপির মামলার রায়ের ওপর নির্ভর করছে তাদের চাকরির পরমায়ু। তিন বছরে কারচুপির মামলার শুনানি হয়েছে তিনবার। পরশু শুনানির তারিখে মূল সাক্ষি স্বদেশ। জামাইবাবুকে সাক্ষি মেনেছে মৃন্ময়। কোর্টকাছারি করে কিছু হবে না, মৃন্ময়কে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল স্বদেশ। মৃন্ময় বোঝেনি। ধনেপ্রাণে মারা পড়বে মৃন্ময়। কথাটা ভেবে আতঙ্কে গুড়গুড় করে উঠল স্বদেশের বুক। অস্বস্তি বুকে, না পেটে, সঠিক হদিসের জন্যে সিটের ওপর সোজা হয়ে বসেছে সে। তিন বছর আগে ডায়মন্ডহারবারে সুবোধের বাড়িতে অসুস্থ হবার ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়নি স্বদেশ। ভেবেছিল, সাময়িক, মামুলি এ গোলমাল। চব্বিশ ঘন্টায় মিটে যাবে। তা হলো না। অবস্থা খারাপ হতে থাকল প্রতিদিন। পেটের ভেতরের পরিপাক যন্ত্র যে ক্রমশ রদ্দি হয়ে যাচ্ছে, অনুমান করে ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে। ডাক্তার, ওষুধ, পেটের ছবি, শব্দচিত্র, খাবারে কঠোর সংযম, কিছুতে কাজ হলো না। শরীর ভাঙল, হুহু করে চুল উঠে খালি হয়ে গেল আধখানা মাথা।

কালীপদর পেনশনের জন্যে ছুটোছুটি, যোগাযোগ, তদ্বির করেও বিধ্বস্ত, ক্লান্ত হচ্ছিল স্বদেশ। কাজ খুব একটা এগোল না। অথচ দায়িত্ব নেবার সময় তার ধারণা ছিল, অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষকের পেনশনের ব্যবস্থা করা সামান্য ব্যাপার। পনের দিন, এক মাসে কালীপদর পেনশনের হুকুম বার করে দেবে সে। নিরীহ কালীপদ ঠিক জায়গায় পেনশনের বিষয়টা হাজির করতে না পারায় ঠেকে গেছে। হয়ত পদ্ধতিগত ভুল করে বসে আছে। বৃদ্ধ লোক, করতেই পারে। বয়স বাড়লে মানুষ আলুথালু, আলগা হয়ে যায়। তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও কমে আসে। ফলে তিনবছর অকারণ বোর্ড অফিসে ঘুরেছে কালীপদ। পেনশনের পাত্তা পায়নি। পাখির পালকের মতো হালকা ভেবে যে দায়িত্ব স্বদেশ নিয়েছিল, ছ'মাস নাকানি চোবানি খেয়ে সে বুঝল, তা হিমালয়ের চেয়ে ভারি। সময় যত দীর্ঘ হচ্ছিল, আতঙ্কিত হচ্ছিল সে। সকালের কাগজে প্রায়ই তার চোখে পড়তে লাগল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের আত্মহত্যা। পাঁচ সাত, দশ বছর পেনশনের জন্যে অপেক্ষা করে কেউ অভাবে, হতাশায়, গলায় দড়ি দিয়েছে, বিষ খেয়েছে কেউ। সব মৃত্যুর কারণ যে পেনশন এমন নয়, অসুস্থতা, একাকিত্ব ও আত্মহত্যায় বাধ্য করেছে অনেককে। এসব খবর, সরকারি সূত্র থেকে স্বীকার করা হলেও কালীপদ রক্ষিত যে কোনওদিন সংবাদ হয়ে যাবে, এ আতঙ্কে দুর্বলতর হতে থাকল স্বদেশের পাকস্থলী। ক্রমশ কমছে তার হজমশক্তি। তেল, ঝাল, মশলাবিহীন, আলাদা রান্নার আয়োজন করেও ভারতী সুস্থ করতে পারল না। তখনই মর্মান্তিক এক ঘটনা ঘটল পরিবারে। গলায় দড়ি দিল মৃন্ময়ের স্ত্রী শ্রীলেখা। আড়াই বছরের ছেলের কথা ভাবল না সে। মরার আগে একটা চিরকুটে শ্রীলেখা গোটা গোটা হরফে লিখেছিল, আমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী অভাব। স্বামী, ছেলের উপোস দেখতে পারছিলাম না আমি।

কিছুদিন খুব মনমরা হয়ে থাকল স্বদেশ। মৃন্ময়, ভারতীকে সান্ত্বনা দিল। এক বছরে বোর্ড অফিসে চার, পাঁচ বার ঘুরে স্বদেশ যখন দিশাহারা, কলেজ স্ট্রিটে তেজেশের সঙ্গে একদিন দেখা হলো তার। তাকে দেখে চমকে উঠে তেজেশ প্রশ্ন করেছিল, শরীর খারাপ?

গড়বড় করছে পেট।

ডাক্তার দেখিয়েছিস?

কথা চালাচালির মধ্যেই তেজেশকে স্বদেশ বলল, কালীপদর সমস্যার কথা। সব শুনে

তেজেশ বলল, কেয়া যেন এরকম কিছু বলেছিল একদিন। গুছিয়ে বলতে পারেনি, আভাস দিয়েছিল। সুবোধের বাড়িতে বোধহয় তোর মুখে ঘটনাটা শুনেছিল কেয়া।

যাবার আগে তেজেশ বলেছিল আমার বাড়িতে কাল বিকেল পাঁচটায় চলে আয়। এক মক্কেলের হদিস দেব। আমাদের আবাসনেই এগারো নম্বরে সে থাকে। শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের নেতা। হোমরা-চোমরা লোক। তার কথায় শিক্ষা সেলের নেতা জগদীশ সেন ওঠে, বসে। সাতদিনে পেনশন অর্ডার বেরিয়ে যাবে।

তেজেশের কথায় আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল স্বদেশ। পাশাপাশি তার বুকের মধ্যে কাঁদছিল এক নিঃশব্দ হাহাকার। কিছুদিন আগে এ লোকের সন্ধান পেলে শিক্ষা সেলের জগদীশকে ধরা অসম্ভব ছিল না। পার্কসার্কাস স্কুলে মৃন্ময়ের চাকরি, তাহলে হয়ে যেত। আড়াই বছরের ছেলে কোলে নিয়ে সুখে সংসার করত পঁচিশ বছরের শ্রীলেখা।

ভদ্রলোকের নাম কি?

ইউনিয়ন নেতার পরিচয় জানার জন্যে স্বদেশের ব্যগ্রতা দেখে মুচকি হেসে তেজেশ বলেছিল, কাল আমার বাড়ি আয়, তারপর বলব। তোর চেনা লোক। কাল রবিবার। বাড়ি থাকবে সে।

বোকার মতো তাকিয়ে থাকা স্বদেশকে তেজেশ বলল, সে নেতা কে হদিসের একটা সূত্র দিচ্ছি। এক নামী অভিনেত্রীর দাদা সে।

সূত্র শুনে স্বদেশের কাছে আরও দুর্বোধ্য হলো ধাঁধা। হাল ছেড়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করল অনিরুদ্ধর খবর কী?

প্রশ্ন করার কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য স্বদেশের ছিল না। তেজেশ, অনিরুদ্ধ একই আবাসনে থাকে। গলায়-গলায় তারা বন্ধু। স্বদেশেরও পুরনো বন্ধু অনিরুদ্ধ। নিছক সৌজন্যেই অনিরুদ্ধর খবর জানতে চেয়েছিল সে। কিন্তু অনিরুদ্ধর নাম শুনে শক্ত হলো তেজেশের চোয়াল, চাপা রাগে টানটান হলো শরীর, মুখ লাল, ফোঁস করে উঠল সে। দাঁত টিপে বলল, অনিরুদ্ধ একটা স্কাউন্ড্রেল, লম্পট। কেয়াকে সে, যাক। কাল তোকে সব বলব।

চব্বিশ ঘন্টা পরে বেলগাছিয়ায় তেজেশের বাড়িতে গেল স্বদেশ। চমৎকার সাজানো ফ্ল্যাট। ফুটফুটে দুটো ছেলে। বড় ছেলে গত বছর কলকাতায় এক নামী স্কুলে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছে। এ বছর সেখানেই টু-তে ঢুকেছে ছোট ছেলে। তেজেশ বলল, ছেলে ভর্তির জন্যে ধরাকরার দরকার হয়নি আমার। অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে নিজেদের মেরিটে তারা ভর্তি হয়েছে।

হাউসকোট পরা এলোচুল কেয়াকে খুকুখুকু দেখাচ্ছিল। সরল মুখে সে বলল, ডায়মন্ডহারবার থেকে ফিরে কোথায় ডুব মারলেন? অসুস্থ দেখেছিলাম আপনাকে। দুশ্চিন্তায় ছিলাম। একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল আপনার। গত মাসে তেজেশ, আমি ডায়মন্ডহারবারে সুবোধের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, পনের দিন আগে সেখানে গিয়েছিলেন আপনি।

মাস্টারমশাই-এর পেনশনের কেস নিয়ে ঝামেলায় আছি, স্বদেশ বলেছিল, শরীর খারাপ, সময় পাচ্ছি না।

শীতের বিকেল শেষ হয়ে ছায়া নামছে তখন। একদল কাক গলা চিরে চেঁচাচ্ছে। আবাসনের মাঠে খেলা শেষ করে ঘেমে নেয়ে বাড়ি ফিরল তেজেশের দুই ছেলে, টয় আর জয়।

হাত মুখ ধুয়ে সোয়েটার পরে নাও, ছেলেদের বলল কেয়া।

দুই শিশু অবাক চোখে দেখছে স্বদেশকে। তেজেশ বলল, স্বদেশকাকু।

টয় হাসল, জয় গম্ভীর। বড় ছেলে টয় চিনলেও জয় মনে করতে পারেনি স্বদেশকে।
কী খাবেন, চা, কফি?
কেয়াকে স্বদেশ বলল, কিছু নয়।
সে কি?
কাপড়ের ঝোলা থেকে একটা বোতল বার করে স্বদেশ বলল, ফুটনো জল নিয়ে ঘুরছি। ক্তারের হুকুম।
কথা বাড়াল না কেয়া। শিক্ষাকর্মী নেতার কাছে তেজেশের সঙ্গে তাড়াতাড়ি যেতে চায় দেশ। মুখ ফুটে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে তার। অনিরুদ্ধর বিরুদ্ধে তেজেশের ঘৃণার কারণ নতেও আগ্রহ বোধ করছে । কিন্তু সে মুখ খুলল না। এখন কিছু করা, বলা তেজেশের ছাধীন। তেজেশের ইচ্ছে, অনিচ্ছের সুতোয় বাধা স্বদেশ এখন পুতুল ছাড়া কিছু নয়।
কেয়া হঠাৎ প্রশ্ন করল, বিপুলকে মনে আছে আপনার?
খুব, স্বদেশ বলল, আবগারি ইনসপেক্টার।
খবর পেয়েছেন তার?
নাহ্। শেষবার সুবোধের বাড়িতে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। মুঠো মুঠো চানাচুর খাচ্ছিল।
বিপুল খুন হয়েছে।
খবর শুনে স্বদেশ অসাড় হয়ে গেল। চেয়ারে জুড়ে গেছে তার শরীর।
তেজেশ বলল, নিজের গোঁয়ার্তুমিতে মারা পড়ল ছেলেটা। কেউটের ল্যাজে পা দিয়েছিল। মাগলারদের খোঁচাখুঁচি করার কোনও দরকার ছিল না তার। মাসে কোটি কোটি টাকা যেখানে লনদেন হয়, রাঘববোয়ালরা যেখানে জড়িয়ে আছে, সেখানে একজন সাধারণ ইনসপেক্টর কী করবে? বিপুল বোকা, হঠকারিতা করেছিল সে।
স্বদেশ জানতে চাইল, কবে হলো এ দুর্ঘটনা?
কেয়া বলল, সুবোধের বাড়িতে আমরা যাবার ঠিক চার দিন আগে। বিপুলের বুড়ো বাবা, মা, ছোট এক ভাই এক দুপুরে সুবোধের বাড়িতে এসেছিল। আমরা তখন খেতে বসেছি। বুড়োবুড়ি কেঁদেই অস্থির। আবগারি দপ্তরে বিপুলের ছোটভাই-এর একটা চাকরি হয় কিনা, জানতে চেয়েছিল তারা।
ঝিঁঝি ডাকছে স্বদেশের কানের গুহায়। তার ফ্যাকাশে মুখ দেখে তেজেশ বলল, দেবনাথ দাশের ফ্ল্যাটে চলে যা তুই। সেই দেবনাথ! মনে আছে তোর?
নামটা চেনা লাগলেও মানুষটাকে খেয়াল করতে পারল না স্বদেশ। তার বিপন্নতা লক্ষ্য করে তেজেশ বলল, নিরঞ্জনের কাকা দেবনাথ।
মুহূর্তে স্বদেশের স্মৃতিতে স্পষ্ট হলো দেবনাথ দাশ। ইউনিভার্সিটির বন্ধু নিরঞ্জনের সঙ্গে তাদের তালতলার বাড়িতে বহুবার গেছে স্বদেশ। অন্য বন্ধুদেরও যাতায়াত ছিল সে বাড়িতে। নিরঞ্জন ছিল ইতিহাসের ছাত্র। তিনটে রূপসি বোন ছিল তার। বন্ধুদের যাতায়াতের সেটাও ছিল অন্যতম কারণ। বাবা, মা, দুই কাকা, কাকিমা, ভাইবোন নিয়ে ছিল নিরঞ্জনদের যৌথ সংসার। তালতলার বাড়িতেই নিরঞ্জনের মেজকাকা দেবনাথের সঙ্গে স্বদেশের আলাপ। নিরঞ্জনের বন্ধুদের পেলে সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে লম্বা, চওড়া বক্তৃতা ঝাড়ত দেবনাথ। একঘেয়ে বক্তৃতা শুনে প্রায়ই বিরক্ত হতো। নিরঞ্জনের বন্ধুরা, দেবনাথ কখন বাড়ি থাকবে অথবা থাকবে না, আগে জেনে নিয়ে তালতলায় যাওয়া শুরু করল। বাড়িতে দেবনাথ আছে জানলে

সদর দরজা থেকে পালাত। নিরঞ্জনের সমবয়সী এক সুন্দরী পিসিকে প্রায়ই সে বাড়িতে দে
যেত। সে সুন্দরীর নাম কী ছিল, মনে করতে চাইল স্বদেশ। একটু চেষ্টায় স্মরণ হলো, শর্মিষ্ঠা
হ্যাঁ শর্মিষ্ঠাই। সেই শর্মিষ্ঠা কি সেলুলয়েডে সুচিত্রা মজুমদার? হতেই পারে।

পরিচয় দিলেই তোকে চিনবে দেবনাথ, তেজেশ বলল।

তেজেশের কথাতে অবাক হয়ে স্বদেশ প্রশ্ন করল, তুই যাবি না?

নাহ্।

কেন?

আমাকে দেখলে কেঁচে যাবে তোর কেস্। দেবনাথ কিছু করবে না।

বসার ঘরের আলো জ্বেলে দিল কেয়া। দেবনাথের সঙ্গে স্বদেশের দেখা করার ইচ্ছে ম গিয়েছিল। স্বদেশের মুখ দেখে কিছু আঁচ করে তেজেশ বলল, বছরখানেক দেবনাথের স আমার যোগাযোগ নেই। আমি-ই রাখিনা। কারণ তার ভণ্ডামি। হঠাৎ বড় নেতা বনে গে পায়াভারি হয়ে গেছে তার। এখানকার আবাসিকরা সই করে গত বছর এক আর্জি পাঠিয়েছি সরকারের কাছে। ন্যায্য আর্জি। আবেদনে লেখা হয়েছিল, যে যেখানে আছে, সেই ফ্ল্যা বাজারদরে তাকে কিনতে দেওয়া হোক। ভাড়া বাবদ এতদিন যে যত টাকা দিয়েছে, ফ্ল্যাটে দাম থেকে সেই টাকা বাদ দেবার বিষয়টি সরকার যেন বিবেচনা করে। অন্যায় আবদার কি ছিল না সে প্রস্তাবে। আবেদনপত্রে দেবনাথের সই আনার দায়িত্ব ছিল আমার। গেলাম আমি আর্জি পড়ে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে দেবনাথ বলল, এ হলো ন্যক্কারজনক মধ্যবিত্ত সুবিধাবা সরকারি বাড়িতে থাকার সুযোগে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার ষড়যন্ত্র করছে কিছু লোক আরও কদর্য নানা কথা বলল। শুনে আমি তাজ্জব। পরে জানলাম, সল্টলেকে দু'বছর আ একটা জমি বাগিয়েছে দেবনাথ। তার বাড়ি উঠছে সেখানে। নিজে দাঁড়িয়ে বাড়ি বানাচ্ছে সে আমার এক বন্ধুকে একদিন দূর থেকে আসতে দেখে একটা ঝোপের মধ্যে দেবনাথ লুকি পড়েছিল।

ঝোলা থেকে বোতল বার করে এক ঢোক জল খেল স্বদেশ। চারমিনার ধরাল। তেজে বলল, দেবনাথের সঙ্গে লোফার অনিরুদ্ধর আঁতাত, খুব দহরম মহরম হয়েছে। দেবনাথে ল্যাজ ধরে জগদীশ সেন, সুচিত্রা মজুমদারের সঙ্গেও স্কাউন্ড্রেল গা ঘষাঘষি করছে।

তেজেশ থামতেই কেয়া বলল, পুরুষ মানুষগুলো কি হ্যাংলা! তু করে একবার ডাকলে মেয়েদের পায়ে পড়ে যায়!

না ডাকলেও পড়ে।

তেজেশের কথায় গম্ভীর হলো কেয়া। তেজেশ বলল, কেয়ার ওপর সুযোগ নি চেয়েছিল অনিরুদ্ধ। পারেনি। ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে।

কথা শেষ করে দুই ছেলে কাছেপিঠে আছে কিনা দেখল তেজেশ। কেউ নেই। পাশে ঘরে টিভি দেখছে টয়, জয়। স্বদেশকে তাড়া দিয়ে তেজেশ বলল, দেবনাথের কাছে যা। ম হয়, এ কাজটা করে দেবে। তবে মুখে আনিস না আমার নাম।

এক মুহূর্ত ভেবে তেজেশ বলল, অনিরুদ্ধকে নিয়ে যেতে পারিস দেবনাথের কাছে দেবনাথের আগের বিল্ডিং-এ দোতলায় অনিরুদ্ধ-র ফ্ল্যাট। সে ফ্ল্যাট তোর চেনা, পাশে গাড়িটাই দেবনাথের।

তেজেশের বাড়ি থেকে যখন স্বদেশ বের হলো, পৃথিবী অন্ধকার। স্বদেশের মাথা ভ

ম। কী করবে, কোথায় যাবে, আদৌ কিছু করার, কোথাও যাবার আছে কিনা, ভাবছে সে। বারের বিকেলে ঢাকুরিয়া থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত এসে দেবনাথের সঙ্গে দেখা না করে রে যাওয়া বোকামি।

আবাসনের সব আলো জ্বল উঠেছে। অনিরুদ্ধকে না পেলে কীভাবে দেবনাথের ফ্ল্যাটে ওয়া যাবে, সদর দরজা পর্যন্ত এসে স্বদেশকে বুঝিয়ে দিয়েছে তেজেশ। নির্জন পিচের রাস্তা। টা গাড়ি এ রাস্তায় যেতে পারে। বাগান, গাছগাছালি, বাচ্চাদের দোলনা, স্লিপ, মধ্যবিত্ত সুবিধের খামতি নেই। অনাবিল শান্তি আছে। অনিরুদ্ধকে ফ্ল্যাটে পেয়ে গেল স্বদেশ। তাকে খে ভাবান্তর হলো না অনিরুদ্ধর। ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল, কেমন আছিস?

পেটের ব্যামো দিয়ে শুরু করে কালীপদবাবুর সমস্যা অনিরুদ্ধকে জানাল স্বদেশ। গুম হয়ে বসে ছিল অনিরুদ্ধ। স্বদেশ আসায় খুশি হয়েছিল, অনিরুদ্ধর বৌ চৈতালি। মীকে চৈতালি বলল, দেবনাথবাবুর কাছে নিয়ে যাও স্বদেশদাকে।

কড়া চোখে চৈতালির দিকে অনিরুদ্ধ তাকাতে স্বদেশ বলেছিল, নিরঞ্জনের কাকা বনাথবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছে আছে আমার। এক সময়ে আমাকে খুব পছন্দ রতেন তিনি। স্নেহও ছিল। আসলে সেখানে যাবার প্ল্যান করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। কবার ঢুঁ দিয়ে গেলাম এখানে।

যা ভেবে স্বদেশ কথাটা বলেছিল, তাই হলো। গুটিয়ে গেল অনিরুদ্ধ। স্বদেশের সামনে তা দেখান বৃথা বুঝে সে বলল, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দেবনাথদা আজ বাড়িতেই আছেন। মি নিয়ে যাব তোকে।

নিরীহ গলায় স্বদেশ প্রশ্ন করল, তেজেশ, কেয়ার খবর কী? যাবি নাকি ওদের ফ্ল্যাটে?

ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠে অনিরুদ্ধ বলল, আমার সামনে ওদের নাম করবি
।

দপদপ করে জ্বলছে অনিরুদ্ধর দুচোখ। অবাক হয়ে স্বদেশ তাকিয়ে আছে দেখে অনিরুদ্ধ লল, ওদের নাম শুনলে আমার ভাষা ঠিক থাকে না। ব্ল্যাকমেইলার, ক্রুক।

চৈতালি চুপ। তেজেশ, কেয়ার নাম দ্বিতীয়বার স্বদেশ উচ্চারণ না করলেও পয়লা দানেই ক্ষ্য ফুঁড়েছে সে। শরীরে বেঁধা গুলির মত পাক খেতে খেতে সে দুটো নাম ক্রমশ বাড়িয়ে লছে ক্ষতের বিন্দু। বিন্দু বেড়ে হচ্ছে রক্তাক্ত বৃত্ত।

চা? কফি?

চৈতালির প্রশ্নে আবছা হেসে স্বদেশ বলল, কিছু নয়। বাইরে জল পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ। ক্তারের হুকুমে সঙ্গে ফুটোনো জল রাখি।

ঝোলা থেকে জলের বোতল বার করে চৈতালিকে দেখাল স্বদেশ। অবরুদ্ধ ঘৃণায় তখনও সছে অনিরুদ্ধ। চৈতালির দিকে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ বলল, এই কম্পাউন্ডের সকলকে ওরা ল বেড়ায় যে, ওদের দুই ছেলে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে, নিজেদের এলেমে স্কুলে ভর্তি য়েছে। ডাহা মিথ্যে! এক মুহূর্ত থেমে চৈতালিকে অনিরুদ্ধ বলল, পরশু অবিনাশবাবুর সঙ্গে খা। তোমার খুড়তুতো বোনের স্বামী, হিমাদ্রির কাকা, চিনতে পারছ?

চৈতালি ঘাড় নাড়তে অনিরুদ্ধ বলল, শ্যামবাজারের মোড়ে অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা য়েছিল। কথায় কথায় তিনি বললেন, তোমার বন্ধু তেজেশকে আদর্শবাদী, নীতিবান জানতুম। মার জানাতে ভুল ছিল। গুণাঙ্ক ভট্টাচার্যর মতো এক নোংরা পুলিস অফিসারের সঙ্গে তার

হৃদ্যতা অবাক করেছে আমাকে। পরে জানলুম রহস্য। দুই ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য গুণাঙ্ককে হাজার হাজার টাকার মদ খাইয়েছে তেজেশ। তেজেশ একা নয়, স্বামী, স্ত্রী দুজনে। গুণাঙ্কই বলেছে আমাকে। গুণাঙ্কর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে বারণ করে দিও বন্ধুকে।

অবিনাশবাবুর কথায় মাটিতে মিশে গেলাম আমি। তেজেশের সঙ্গে যে আমার কোন সম্পর্ক নেই, জানিয়ে দিয়েছি।

ঝড়ের বেগে কথাগুলো বলে অনিরুদ্ধ থামতে চৈতালি বলল, আগে বলোনি তো।

খেয়াল ছিল না।

রাত বাড়ছে। স্বদেশকে নিয়ে দেবনাথের ফ্ল্যাটে গেল অনিরুদ্ধ। দেবনাথ বাড়িতে নেই। সতেরোটা স্বশাসিত সংস্থার সভাপতি সে। রোজ পাঁচ, সাতটা মিটিং থাকে। সেরকম কোন বৈঠকে গেছে। দেবনাথের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় একটুও বিমর্ষ হলো না স্বদেশ। স্বদেশকে আস্বস্ত করতে অনিরুদ্ধ বলেছিল, দেবনাথকে যা বলার আমি বলব। তোর সামনে বসে ফোন করব শিক্ষা-বোর্ড অফিসে। এক ফোনেই কাজ হয়ে যাবে।

৬

সরষেহাটের পর বাস দাঁড়াবে উস্থির মোড়ে। বাস যে দাঁড়াবেই, এমন নয়। ওঠা, নামার লোক থাকলে উস্থিতে বাস থামে। তা না হলে উস্থি ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। বাসের মধ্যে হঠাৎ ছায়া ঘনাতে বাইরে তাকিয়ে স্বদেশ দেখল, সূর্যের মুখে ঝুলছে এক টুকরো কালো মেঘ। জানলার ধারে বসা দু-একজন যাত্রীও তাকাল আকাশের দিকে। বাতাসের তাপ হঠাৎ কমে গেছে। এক হাটুরে যাত্রী বলল, গঙ্গায় আজ ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসবে। বৃষ্টি হবে।

বিপুলের অপঘাত মৃত্যুর পর গত দেড় বছরে চারবার ডায়মন্ডহারবারে গেছে স্বদেশ। চার দফায় সুবোধের বাড়িতে কাটিয়েছে মাত্র এক রাত। শেষবার, সুবোধের বাড়িতে ঢোকার আগে দই, মিষ্টি কিনেছিল সে। তার রাতের খাবার। কাঁধের ঝোলায় ছিল জ্যারিকেন ভর্তি ফুটোনো জল। এসব নিয়ে সুবোধের বাড়িতে যথেষ্ট সন্ত্রস্ত হয়ে ঢুকেছিল। হেমন্তের বিকেল শেষ হয়ে অন্ধকার নামছে পৃথিবীতে। পাটের ঝোলায় দই, মিষ্টি লুকিয়ে কলিংবেল টিপতে দরজা খুলল স্বয়ং সুবোধ। বসার ঘরে পা দিয়ে স্বদেশের মনে হলো, বাড়িতে আজ বাড়তি উচ্ছ্বাস। খুশির ঢেউ বইছে বাড়িতে।

স্বদেশের মন মেজাজ ভাল ছিল না। কালীপদর বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না। একটা ছেলে হয়েছে সীতার। মুখটা মিষ্টি, ভারি সুন্দর। কিন্তু কাঠির মতো হাত, পা, রুগ্ন। ছ'মাসের সেই শিশুকে দেখে, আঁতকে উঠেছিল স্বদেশ। সীতার শরীর কঙ্কাল। শুধু প্রসবের ধকলে এত তাড়াতাড়ি সময়ে সে এমন বুড়িয়ে গেছে, মনে হলো না স্বদেশের। নিশ্চয় কোন কঠিন ব্যামো ধরেছে তাকে। কালীপদর মুখে শুনল দুর্গানগরে প্রহ্লাদের অপকর্মের কাহিনী। শ্বশুরবাড়িতে বউ, ছেলেদের রেখে গাঢাকা দিয়েছে প্রহ্লাদ। প্রথমে বুঝতে পারেনি কালীপদ। সরল মনে বিশ্বাস করেছিল জামাইকে। প্রহ্লাদ বলেছিল, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আসানসোল যাচ্ছি। সাতদিনের মধ্যে ফিরব। তারপর নিয়ে যাব সবাইকে।

অভাব সত্ত্বেও মেয়ে, দুই নাতিকে সমাদরে ঘরে তুলেছিল কালীপদ। চকশুকদেবপুর থেকে প্রহ্লাদ ভেগে যাবার দু'তিন দিন পরে জানা গেল আসল কাহিনী। বাবার মুখে স্বামীর কীর্তি শুনে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল সীতা। সীতার দুর্দশার বিবরণ শোনাতে কালীপদর গলা কান্না

তো বুজে যাচ্ছিল, তার চেয়ে পেটফাঁপা, অম্বলে জেরবার স্বদেশের শরীর নেতিয়ে পড়ছিল। ঝিমঝিম করছিল তার মাথা। কালীপদর হাতে শ'খানেক টাকা গুঁজে দিয়ে পালাতে চাইছিল দেশ। পালাবার চেষ্টাও করেছিল। কালীপদ টাকা না নেওয়ায় সে থমকে গেল। কালীপদর এককথা, পেনশনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছ তুমি, তাই যথেষ্ট! কথা না বাড়িয়ে পালিয়ে এসেছিল দেশ। খেয়াঘাট পর্যন্ত ফি-বারের মতো তাকে পৌঁছে দিল কালীপদ। নৌকোয় ওঠার আগে কালীপদকে স্বদেশ প্রশ্ন করেছিল, হেডমাস্টার যতীনবাবুর খবর কি?

বিষণ্ণ কালীপদ বলেছিল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে যতীনবাবুর।

সে কি?

ভিটেবাড়ি ক্রোকের হুকুম হয়েছে।

ঘাটে নৌকো লেগে গিয়েছিল। কালীপদ বলল, বাড়ির লাগোয়া একচিলতে জমিতে দোচালা ঘর তুলে পড়ে আছে যতীন। হঠকারিতা কবে ফেলেছিল সে। আদালতের মধ্যে একঘব লোকজনের সামনে জজসাহেবকে চোর, ঘুষখোর বলেছিল। এজলাস ভর্তি লোক শুনেছিল সে কথা। খেসারত দিতে হলো যতীনকে। জেল খাটল এক মাস। বাড়ি যখন ফিরল, বদ্ধ উন্মাদ।

কালীপদব কথার মধ্যে নৌকোয় উঠে পড়েছিল স্বদেশ।

সুবোধ বলল, দাঁড়িয়ে গেলি কেন? ভেতরে আয়।

পার্টিটার্টি আছে নাকি বাড়িতে?

স্বদেশের প্রশ্নে মুচকি হেসে সুবোধ প্রশ্ন করল, কী করে বুঝলি?

মনে হচ্ছে। তাছাড়া তোর কম্পাউন্ডের মধ্যে দুটো গাড়ি।

কলকাতা থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসেছে। কাল তাদের সঙ্গে যেতে হবে আমাদের।

অসুবিধে করলাম আমি?

কী বাজে বকছিস, আয়।

সুবোধের সঙ্গে ভেতরের ঘরে ঢুকল স্বদেশ। আগে দু'বার এ ঘরে থেকেছে। বারান্দা থেকে ভেসে আসছে অনেকগুলো গলা। ঘরে ঢুকল তনুশ্রী। স্বদেশকে এক লহমা দেখে তনুশ্রী প্রশ্ন করল, আপনি এত শুকিয়ে যাচ্ছেন কেন?

ক্লান্ত হেসে স্বদেশ বলল, হজম হচ্ছে না কিছু। পেটটা একদম গেছে।

কাঁধ থেকে সে যখন সন্তর্পণে ঝোলা নামাচ্ছে, তনুশ্রী প্রশ্ন করল, বস্তা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরছেন কেন?

জলের জ্যারিকেন আছে। একটু দই, মিষ্টি, রাতেব খাবার।

স্বদেশের কথা শুনে কপালে উঠল তনুশ্রীর চোখ। সে বলল, রাতের খাবার নিয়ে এসেছেন আমাদের বাড়িতে? ওসব চলবে না। হলো কি আপনার?

আতঙ্কে ধড়ফড় করছে স্বদেশের বুক। গরহজমের কারণ অনেক ভেবে তখন খুঁজে পেয়েছিল সে। সুবোধের বাড়িতে কিছুই দাঁতে কাটবে না। কাটলে অবধারিত মৃত্যু, এ ধারণা প্রায় কুসংস্কারের মতো আচ্ছন্ন কবেছিল তাকে। হুসহুস করে সিগারেট টেনে সুবোধ বলল, জামা, কাপড় ছেড়ে আগে একটু বিশ্রাম করতে দাও ওকে। তারপর ফয়সালা হবে।

তনুশ্রী বলল, ফয়সালার কিছু নেই। যা বলার বলে দিয়েছি আমি। আমার বাড়িতে এসে

দোকানের দই, মিষ্টি রাতে খাওয়া চলবে না।

অসুস্থতার জন্যে সন্ধেতে স্নান আগেই বন্ধ করেছিল স্বদেশ। স্নান করলে ঠাণ্ডা লে যাচ্ছিল তার। কয়েকবার সর্দি, জ্বরে ভোগার পর এ পাট তুলে দিয়েছিল। ডাক্তারই পরা দিয়েছিল। হাত, মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে বারান্দায় এসে একঝাঁক নারীপুরুষকে দেখল স্বদে সুবোধ, তনুশ্রী ছাড়া সকলেই অচেনা। ঝকঝকে, দামি পোশাকে সুসজ্জিতা চার মহিলার মা তিনজন বিবাহিতা, একজন হয়ত অবিবাহিতা। তার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। বয়সেও সে অ তিনজনের চেয়ে ছোট। পুরুষ তিনজনও সপ্রতিভ, স্বাস্থ্যবান, আটাশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মা তাদের বয়স। খালি টেবিলের ওপর তিন প্যাকেট ডানহিল সিগারেট।

স্বদেশের সঙ্গে পরিচয় হলো সকলের। আলাপ করিয়ে দিল সুবোধ। তনুশ্রীর এক দি এক খুড়তুতো বোনের পাশে বসেছে মালবিকা। নামটা শুনেই চমকেছে স্বদেশ। বিপুলে প্রেমিকা, আইনত বউ, এখানে এল কোথা থেকে? প্রশ্নটা চেপে রেখে তনুশ্রীর দুই ভগ্নিপা ভাই এর সঙ্গে কথা বলছিল স্বদেশ।

সুবোধকে তনুশ্রীর খুড়তুতো বোন, চিরশ্রী প্রশ্ন করল, এত সিগারেট খান কেন?

মনটা খুব খারাপ।

সুবোধের জবাব শুনে মুচকি হেসে তনুশ্রী বলল, 'বড় দুঃখ, বড় ব্যথা সম্মুখেতে কা সংসার!'

দিদির ইয়ার্কিতে উৎসাহিত চিরশ্রী যোগ করল, 'এরই মাঝে পথ চিরে চিরে নু সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।'

হাসির হল্লা উঠল। স্বদেশও যোগ দিল হাসিতে।

সুবোধের বাড়ির আসরে মালবিকাকে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না স্বদেশ। তাকে দেখা পর মালবিকাও উসখুস করছে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে সুবোধ নাটকীয়ভাবে বলতে শুরু করল লেডিজ এন্ড্ জেন্টেল্‌মেন্, এখন ড্রিঙ্কস্ টাইম্। কার কী পছন্দ বলুন?

সুবোধের বলার ধরনে পুরুষেরা খুশিতে হাততালি দিয়ে বলল, ব্রাভো।

যদু আরও চটপটে, চালাকচতুর হয়েছে। টেবিলে গ্লাস্, স্কচ্ হুইস্কি, জিন, লাইমের বোতল শোডা, জল, আইস্ বাকেট্ রেখে, পাকা হাতে ঢেলে দিচ্ছে সে। কমবেশি হচ্ছে না।

মুখোমুখি বসেছে দশজন। মাঝখানে গোল টেবিলের দু'পাশে দুটো কাঠের টিপয়ে কাচে প্লেটে রয়েছে চানাচুর, পোটাটো চিপ্‌স, কাজুবাদাম, মশলাদার কাবলি ছোলাভাজা, নিপুণ হাতে কাটা শসা, আদাকুঁচো। স্বদেশ দেখল, সোডা মেশানো জিনলাইম নিল মালবিকা। দু'হাত জুে স্বদেশ বলল, আপনারা মাপ করবেন আমাকে। একফোঁটা মদ পেটে গেলে মারা পড়ব আমি

তাকে খানিকটা সোডাওয়াটার দিল সুবোধ।

· গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি ক'রে চিয়ারস্, আর উল্লাস বলে—মদ্যপান শুরু হলো। এই আনন্দোৎসবে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছিল স্বদেশের। সোডা খেতেও ভয় পাচ্ছিল। এক দু'চুমুক খেয়ে পেটের মধ্যে কী ঘটছে অনুমান করতে চাইল সে। অস্বাভাবিক কিছু টের পেল না।

ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে এল জাহাজের বাঁশির গম্ভীর শব্দ। সামুদ্রিব শাঁখের মতো সে ধ্বনি। কথা, হাসির খই ফুটছে। তনুশ্রীর জামাইবাবু ডাক্তার অমিতাভ খাসনবিশ রসিক লোক। স্বদেশের সমবয়সী। আধঘণ্টায় তিন পেগ হুইস্কি মেরে দিয়ে চার

হুইস্কির ঢালছে গ্লাসে। মাঝে একবার রান্নাঘরে গিয়ে যদুর কাজের তদারকি করে এসেছে তনুশ্রী। কাচের দুটো বড় প্লেটে গরম ফিশ ফ্রাই, চিকেন টিকিয়া দিয়ে গেল যদু। সুবোধের শ্বশুরবাড়ির কুটুমদের টুকরো কথা জুড়ে একটা কাহিনী ধীরে ধীরে খাড়া করতে পারছিল স্বদেশ।

সুবোধের খুড়শ্বশুর, মানে চিরশ্রীর বাবা মনোমোহন পুততুণ্ড, নামী ওষুধ ব্যবসায়ী। মনোমোহনের প্রতিষ্ঠানের নাম জেন্‌কিন্‌স্‌ ফার্মাসিউটিকাল্‌স্‌। সরকারি হাসপাতালে মনোমোহনের একচেটিয়া ওষুধ সরবরাহের ব্যবসা। ওষুধবিষুধ ছাড়াও সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরে বছরে শুধু দশ লাখ স্যালাইন বোতল সাপ্লাই করে জেন্‌কিন্‌স্‌ ফার্মাসিউটিকাল। ছ'মাস আগে, জেন্‌কিন্‌স্‌-এর স্যালাইন দেওয়ার পর সরকারি তিনটে হাসপাতালে চব্বিশ ঘন্টায় সাতজন মারা যেতে ডাক্তারদের টনক নড়ে। বোতল খুলে স্যালাইনের বদলে পাওয়া যায় কলের জল।

হুলিয়া বেরয় মনোমোহনের নামে। মনোমোহন গাঢাকা দেয়। তিন ডাক্তার নিয়ে তৈরি হয় তদন্ত কমিশন। তিন সদস্যের কমিশনের একজন ছিল মনোমোহন খাসন বিশের জামাই, ডাক্তার অমিতাভ খাসনবিশ। ছ'মাস পরে রিপোর্ট পেশ করে তদন্ত কমিশন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, জেন্‌কিন্‌স্‌ ফার্মাসিউটিকালস্‌ নির্দোষ। অসাধু কোন ওষুধ ব্যবসায়ী জেন্‌কিন্‌সের নাম ভাঁড়িয়ে কিছু স্যালাইন বোতল সেন্ট্রাল মেডিকাল স্টোরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ব্যাচ্‌ নম্বরে মিল থাকলেও বোতলগুলো জেন্‌কিন্‌সের নয়। বিস্তর টাকা ঢেলে আগাম জামিন পেয়েছিল মনোমোহন। না পাবার কথা নয়। মনোমোহনের দাদা গৌরমোহন পুততুণ্ড কলকাতা হাইকোর্টের দুঁদে অ্যাটর্নি। উকিল, ব্যারিস্টার, জজ সব তার হাতের মুঠোয়। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর জেন্‌কিন্‌স্‌-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে সরকার। তেড়ে ওষুধের ব্যবসা করছে মনমোহন পুততুণ্ড।

ভবানীপুরে সুবোধের শ্বশুরবাড়িতে তাই কাল উৎসব। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আইন জগতের দিকপালদের সঙ্গে আছে বড় মাপের সরকারি আমলা, রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী।

সোডা বোঝাই গ্লাস, অর্ধেক শেষ করে এনেছিল স্বদেশ। উৎকট এক চোঁয়া ঢেকুর উঠতে তটস্থ হলো সে। একটা বড় বোতল খালি করে নতুন হুইস্কি খোলা হয়েছে। নতুন বোতলের গড়ন নৌকোর মতো। টেবিলের ওপর বোতলটা দুলছে। হুইস্কির নাম, স্বদেশ পড়ল, সুইং। পাঁচ সুসজ্জিতা, রমণীও এক বড় বোতল জিন প্রায় শেষ করে এনেছে। তলানি পড়ে আছে বোতলে।

হাসিঠাট্টায় মেয়েরা গলে যাচ্ছে, ঢলে পড়ছে। মালবিকাও পাল্লা দিচ্ছে তাদের সঙ্গে। স্বদেশের কানের পাশে মুখ এনে জড়ানো গলায় সুবোধ বলল, বিপুলের চাকরির দাবিদার মালবিকা। আবগারির এক কর্তার সঙ্গে ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিয়ে দেখা করেছিল। মনে হয়, বিপুলের ভাই চাকরি পাবে না। মালবিকাই পাবে। তাকেই বিপুলের বিধবা বউ হিসেবে মেনে নেবে আইন।

গুড়গুড় করছে স্বদেশের ফাঁপা পেট। গলা নামিয়ে সে প্রশ্ন করল, মালবিকা এখানে কেন?

আমার একটা সার্টিফিকেট ওর দরকার, সুবোধ বলল, মালবিকা যে বিপুলের বিয়েকরা বউ, একজন ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসারকে লিখে দিতে হবে। লিখে দিয়েছি আমি। ম্যারেজ সার্টিফিকেটের পাঁচ, সাতটা জেরক্স কপিও অ্যাটেস্ট করে দিয়েছি।

ছুঁচ ফোটার মতো তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠছে স্বদেশের পাকস্থলী। চেয়ার ছেড়ে কলঘরে

গেল সে।

সে রাতে তনুশ্রীর রান্না তো খেলই না, দোকানের দই, মিষ্টিও স্পর্শ করল না স্বদে
মাঝরাতে বমির দমকে ঘুম ভেঙে যেতে দৌড়ে কলঘরে ঢুকল সে। বেসিনের সামনে দাঁড়ি
সে ভাবল, হুড়হুড় করে বমি হবে। হলো না। প্রচণ্ড চাপে ফেটে যাচ্ছিল বুক। নাকমুখ দি
সামান্য তেতো জল বেরল। ঘাড় তুলে আয়নায় স্বদেশ দেখল, তার পেছনে দাঁড়িয়ে অ
সুবোধ।

স্বদেশ ঘুরে দাঁড়াতে সুবোধ বলল, বারোটা বেজে গেছে তোর পেটের। ভাল ডাক্তার দে

হাঁপাতে হাঁপাতে হাসার চেষ্টা করল স্বদেশ। সুবোধ বলল, দাঁড়া, হজমের একটা ও
দেব তোকে।

নিস্তব্ধ, অন্ধকার বাড়িতে শুধু ডাইনিং স্পেসে আলো জ্বলছে। একটা দেওয়াল আলম
খুলে ওষুধের বোতল থেকে লাল রঙের দু'চামচ ওষুধ কাপে ঢালল সুবোধ। ওষুধে অল্প
মিশিয়ে স্বদেশকে বলল, খেয়ে নে।

চুপচাপ কাপটা তুলে নিল স্বদেশ। কাপে সে ঠোঁট ছোঁয়াবার আগেই তার হাতটা খপ ক
চেপে ধরল সুবোধ। ভয় পেয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল স্বদেশ। ঠিকরে বেরিয়ে আ
সুবোধের চোখ। স্বদেশ দেখল, বাঁহাতে ধরা শিশিটার দিকে তাকিয়ে আছে সুবোধ। শিশি
গায়ে ওষুধের নামের তলায় লেখা, জেন্‌কিন্‌স্‌ ফার্মাসিউটিকাল্‌স্‌।

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সুবোধ বলল, এর চেয়ে একটা ভাল ওষুধ আলমারি
আছে। মনে ছিল না। এটা ফেলে দে। অন্য ওষুধ দিচ্ছি।

ওষুধ দিয়ে সুবোধ বিড়বিড় করে বলেছিল, কোন এক কালীপদ মাস্টারের পেনশন দি
শরীরপাত করার মানে হয়! তোর যত্তো সব।

দূর থেকে ভেসে এল জাহাজের ভোঁ। সন্ধের চেয়ে এখন আরও গম্ভীর, জোরালো
ধ্বনি। কলকাতায় ফিরে দু'দিন বাদে পেটের সোনোগ্রাফ করাল স্বদেশ।

৭

উস্থি মোড়ে বাস থামল না। মেঘ সরে জেগে উঠেছে চড়া রোদ। কিন্তু তা সাময়িক।
সাইজের আরও ঘন কালো মেঘ সূর্যের ঘাড়ের ওপর আবার চেপে বসছে। সূর্য কোণঠা
মেঘ বাড়ছে। হুহু করে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায়
গঙ্গায় আসবে ষাঁড়াষাঁড়ির বান। এ বানের পরিচয় ছাত্রজীবন থেকে স্বদেশ জানে। তলা থে
প্রচণ্ড ঠেলায় উথালপাথাল গঙ্গা ছিটকে চলে যেতে চায় আকাশে। ঘোলা জলের মুখ থে
গলগল করে সাদা গাঁজলা বেরয়। গঙ্গার দু'তীর পরস্পরকে জাপটে ধরার জন্যে হাঁসফাঁ
করে। তখন একটাও নৌকো থাকে না গঙ্গায়। নির্জন, পরিত্যক্ত গঙ্গার দু'তীর! সেরকম হ
চকশুকদেবপুরে কালীপদর বাড়িতে আজ পৌঁছনো যাবে না। সেখানে পৌঁছলেও সন্ধের ম
ডায়মন্ডহারবার ফেরা অসম্ভব। একটা দিন তাহলে নিষ্ফল যাবে। তবু এই মেঘ, শীতল বাত
খুশি করল স্বদেশকে। খুশির আরও একটা কারণ আছে। গরহজম, ঢেকুর, অম্বল যে অ
শুধু সে টের পাচ্ছে না, তা নয়, অনেকদিন পরে হাল্কা খিদে জাগছে তার পেটে। গত তিনব
এ অনুভূতি একদিনও তার হয়নি। খিদে কাকে বলে, ভুলে গিয়েছিল সে। তীব্র হচ্ছে এ
বিস্ময়। বাস্তব অনুভূতিকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

ছ'মাস আগে পেনশনের পাকা কাগজ সই হবার আগে নতুন ঝামেলা পাকাল বোর্ডঅফিস। পেনশন ফর্মে কালীপদ রক্ষিতের স্বাক্ষর, পাঁচ আঙুলের ছাপ দেওয়া দুটো পাতার একটার হদিস মিলল না। কেরানি বিনোদবাবু বলল, ছ'বছরের টানাপোড়েনে খসে গেছে একটা পাতা। তবে বেশি দূরে যায়নি। কাছাকাছি আছে।

কথাটা বলে স্বদেশকে প্রশ্ন করেছিল, কী করেন আপনি?

কলেজে পড়াই।

জবাব শুনে ফাইল বন্ধ করে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বিনোদ বলল, কাল আসুন একবার। খুঁজে দেখি।

পেশার কথাটা বলেই আফসোসে হাত কামড়াচ্ছিল স্বদেশ। জীবনের সেরা বোকামি করে ফেলেছে সে। কী কুক্ষণে কলেজে চাকবি করার কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল! ব্যাঙ্ককর্মী,এল আই সি, এমন কি সওদাগরি অফিসের কর্মচারী শুনলেও ফাইল গুটিয়ে রাখত না বিনোদ। বরং পাওনা টাকা চেয়ে নিয়ে ছেড়ে দিত ফাইল। স্বদেশও টাকা দিতে রাজি। এক গোছা নোট পকেটে নিয়েই বিনোদের কাছে এসেছিল সে। কিন্তু অধ্যাপক শুনে গোঁজ হয়ে গেল বিনোদের মুখ। অধ্যাপক মানেই নিরীহ, সৎ, গবিব মানুষ, এ প্রাচীন ধারণা আজও বিনোদের মাথা থেকে যায়নি। হতাশ হয়ে স্বদেশ যখন বাড়ি ফিরল, তার পেটে তখনও গজগজ করছে সকালের গলা ভাত, মাছ। টক হয়ে আছে মুখ। গলায় জ্বালা।

তারপর সাতদিন ঘন্টার পর ঘন্টা বিনোদের টেবিলের সামনে বসে থাকল সে। পকেটে টাকা নিয়েও বিনোদের হাতে গুঁজে দেবার ভরসা পেল না। বিনোদের মুখ থেকে সামান্য কথা, ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় পার হয়ে গেল সাতদিন। এক হপ্তা পরে বিনোদ বলল, বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও কাগজটা পেলাম না। একটা নতুন ফর্মের শেষ পাতা ছিঁড়ে দিচ্ছি আপনাকে। এভাবে দেওয়া বেআইনি। কাউকে বলবেন না। কালীপদবাবুকে দিয়ে কাগজটা সই করিয়ে আনুন। পাঁচ আঙুলের ছাপ নিতে ভুলবেন না। পনের দিনে পেনশনের হুকুম বার করে দেব।

নিরুপায় স্বদেশ তামিল করল বিনোদের হুকুম। ভোররাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিকেল সাড়ে চারটেয় কালীপদর সই, টিপছাপ লাগানো কাগজ বিনোদের হাতে তুলে দিল স্বদেশ। কথা রেখেছিল বিনোদ। দশ দিনের মধ্যে ওপরতলায় পাঠিয়ে দিল কালীপদর ফাইল। তারপর সাতদিন, পনেরদিন, একমাস, দু'মাস, ছ'মাস কেটে গেল, বিনোদের টেবিলে ফাইল নামল না। বিনোদের পরামর্শেই অফিসার চন্দ্রকান্ত আইচের সঙ্গে দেখা করল স্বদেশ। পঞ্চাশ, বাহান্ন বয়স, কাঁচাপাকা চুল, কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালে ঠাণ্ডা, স্থির দু'চোখের দৃষ্টি।

দরজার বাইরে আধঘন্টা স্বদেশ বসে থাকার পরে চন্দ্রকান্তর ঘরে ডাক পড়ল তার। চন্দ্রকান্ত বলল, সার্ভাইভাল সার্টিফিকেট লাগবে।

মানে?

স্বদেশের প্রশ্নে চশমার কাচের ওপর দিয়ে তাকিয়ে চন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করল, সার্ভাইভ মানে জানেন?

স্বদেশ চুপ।

সার্ভাইভ শব্দের অর্থ বেঁচে থাকা। কালীপদ রক্ষিত যে বেঁচে আছেন, প্রমাণ কি?

প্রশ্ন শুনে মাথা ঘুরে গেল স্বদেশের। তার মনে হলো, প্রশ্নটা ঠিক। কালীপদর বেঁচে থাকা অবিশ্বাস্য ঘটনা। স্বদেশের শুকনো মুখ দেখে চন্দ্রকান্ত বলল, কালীপদবাবু যে মরেননি, মরবেন

না, আমি জানি। হাড়ে হাড়ে বিশ্বাস করি। আপনারা যাই বলুন, রিটায়ার্ড বুড়োরা পনের, বিশ বছর পেনশন ভোগ না করে মরে না। মোট পঁচিশ বছর চাকরি করে চল্লিশ বছর পেনশন তুলেছে, এমন কেসও কয়েক গণ্ডা দেখেছি আমি। চল্লিশ বছর না হলেও কালীপদবাবু বিশ বছর পেনশন ভোগ করবেন। তা করুন। কিন্তু তিনি যে বেঁচে আছেন, এ মর্মে একজন গেজেটেড্ অফিসারের সার্টিফিকেট দরকার। সার্টিফিকেট হাতে পেলে কালীপদবাবু বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন, দেখতে যাব না আমি। মরে গেলেও মরার খবর কর্তৃপক্ষের কাছে না পৌঁছনো পর্যন্ত তিনি পেনশন পাবেন। সার্টিফিকেটটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এলেই এ কেসের নিষ্পত্তি করে দেব।

বোর্ডঅফিস থেকে মুখ চুন করে বাড়ি ফিরল স্বদেশ। ঝোলভাত খেয়ে বমি করল সে রাতে। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তায় মাঝরাত পর্যন্ত ঘুম এল না তার। বন্ধুদের মধ্যে বেশ কিছু গেজেটেড্ অফিসার আছে। স্বদেশের অনুরোধ ঠেলতে পারবে না তারা। কালীপদ রক্ষিতের সার্ভাইভাল সার্টিফিকেট তাদের কেউ একজন লিখে দেবে। কিন্তু কালীপদকে সঙ্গে না নিয়ে সার্টিফিকেট চাইতে যাওয়ায় দ্বিধা আছে তার। বন্ধুও ভাবতে পারে যে, বন্ধুত্বের সুযোগ নিচ্ছে স্বদেশ। এ সুযোগ নিতে সে রাজি নয়। আরও এক প্রশ্নে খুঁতখুঁত করছিল তার মন। কালীপদ বেঁচে আছে তো? ছ'মাস আগে তার সই, আঙুলের ছাপ আনার পর আর যোগাযোগ নেই। স্বদেশ চিঠি লেখেনি। সে না লিখলে কালীপদরও লেখার কথা নয়। চিঠি পেলে স্বদেশ বিব্রত হবে ভেবে, কালীপদ চিঠি লেখে না। ছ'মাস আগে কালীপদর যা শরীর, স্বাস্থ্য, সংসারের অবস্থা, স্বদেশ দেখে এসেছে, তা বেঁচে থাকার মতো নয়।

ভোররাতে হঠাৎ তার মনে পড়ল সুবোধের কথা। সুবোধ গেজেটেড্ অফিসার। মালবিকার জন্যে যদি সে সার্টিফিকেট লিখতে পারে, কালীপদর জন্যেও পারবে। দু'দিন পরে ভোরবেলা আবার চকশুকদেবপুরে রওনা হলো স্বদেশ। ডায়মন্ডহারবার ছুঁয়ে গঙ্গা পেরিয়ে বাড়ি থেকে কালীপদকে তুলে আবার ডায়মন্ডহারবার ফিরল। অফিসে পেয়ে গেল সুবোধকে। আধমরা, ঝরঝরে এক বুড়োকে স্বদেশের পাশে দেখে এক মুহূর্ত অবাক চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে গেল সুবোধ। গম্ভীর মুখে একটা ডান্‌হিল ধরাল সে। সুবোধের ভাবগতিক দেখে অবাক হলেও স্বদেশ বলেছিল, আমার মাস্টারমশাই, কালীপদ রক্ষিত। পেনশনের জন্যে একটা সার্ভাইভাল সার্টিফিকেট দরকার। লিখে দে।

কালীপদকে আমল না দিয়ে এক লহমা স্বদেশকে দেখে অফিসের লেটারহেডে খসখস করে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিল সুবোধ। সযত্নে ভাঁজ করে সার্টিফিকেট বুকপকেটে রেখে কালীপদকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে এল স্বদেশ। হাতে ধরে কালীপদকে নৌকোয় তুলে দিল। মাঝিরা সকলেই কালীপদর চেনা। বাড়ি ফিরতে তার অসুবিধে হবে না। নৌকো ছাড়ার পর সুবোধের অফিসের দিকে দু'পা এগিয়েও স্বদেশ গেল না। কলকাতার বাসে উঠে পড়ল। সুবোধ চটলেও স্বদেশের কিছু যায় আসে না। সুবোধের আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সে। কালীপদর সঙ্গে একটা কথা না বলে অন্যায় করেছে সুবোধ। মুখে কিছু না বললেও অপমানিত কালীপদর মনের কষ্ট বুঝতে স্বদেশের অসুবিধে হয়না।

ডায়মন্ডহারবারে ঢুকল বাস। খাল পেরিয়ে কাছারির দিকে চলেছে। কাছারির সামনে জেটি, ফেরিঘাট। ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একঝলক ভিজে ঠান্ডা বাতাস মুখে লাগতে স্বদেশ দেখল, সামনে গঙ্গা। হাতঘড়িতে সাড়ে বারোটা। ঠিক সময়ে পৌঁছে গেছে সে।

মাইক লাগানো পুলিশের একটা জিপ থেকে ভেসে এল ঘোষণা, দুপুর দুটো দশে ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসবে। যাঁদের নৌকো গঙ্গায় আছে দেড়টার মধ্যে ফিরে আসবেন তারা। ক্ষতি এড়াতে তীরে বাঁধা নৌকো সরিয়ে দেবেন। দেড়টার পর নিরাপত্তার কারণে গঙ্গায় নামা নিষিদ্ধ। রাত আটটা পর্যন্ত এ হুকুম বহাল থাকবে।

ধীর গতিতে বাজারের দিকে চলে গেল পুলিশভ্যান। ঘন, জোরালো বাতাস বইছে। বাতাসে ভিজে ভাব। ধূ-ধূ গঙ্গা প্রায় খালি। একটা, দুটো, নৌকো পাল তুলে দ্রুত ছুটে আসছে ঘাটের দিকে। ফুলে ওঠা জলস্রোতে পলকা খেলনার মতো দেখাচ্ছে তাদের। জেটিতে একটা মাত্র নৌকো। যাত্রী নেই। তার মানে এ নৌকো চকশুকদেবপুরে যাবে না। গঙ্গার ওপারে মেঘে, ঝাপসা কুঁকড়ো, দক্ষিণ-পশ্চিমে হলদিয়া, ঘোলা জলস্রোতের সঙ্গে লেপামোছা, হয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘাটে বাঁধা নৌকোর কাছে এসে স্বদেশ দেখল, ছই-এর তলায় গুটিসুটি পাকিয়ে বসে আছে পাঁচ, সাতজন যাত্রী। পেছুনের গলুই-এ রয়েছে দাঁড়ি, মাঝি। রাস্তা থেকে খালি মনে হলেও নৌকোয় মানুষজন দেখে একটু ভরসা পেল স্বদেশ।

বয়স্ক যে লোকটা গলুই-এ বসে বিড়ি টানছিল, সে বলল, মনে রাখবেন, যে যার নিজের হেপাজতে যাচ্ছেন। মোর কোন দায়িক নাই।

মাঝির হুঁশিয়ারির অর্থ বুঝতে স্বদেশের অসুবিধে হলো না। নৌকোর মাঝখানে তখন এসে দাঁড়িয়েছে সে। নৌকো ছাড়ার আগে জেটিঘাটের দিকে তাকিয়ে মাঝি হাঁকল, চকশুকদেবপুর, চকশুকদেবপুর।

বাঁশ তুলে দড়িসমেত পাল টাঙিয়ে দিল ছোকরা দাঁড়ি। জল ঠেলে দশ, বারো হাত নৌকো এগতেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। ছই-এর তলায় গোঁজাগুঁজি করে যারা বসেছে, তারাও ভিজে নেতিয়ে গেল। সব আব্রু ভাসিয়ে দিল এলোমেলো ঘূর্ণি হাওয়া। বাতাসের টানে পক্ষিরাজের মতো উড়ে যাচ্ছে নৌকো। এ গতির বিপদও আছে। মাঝি একটু বেসামাল হলেই উল্টে যাবে নৌকো। তারপর? স্রোতের তীব্র টানের দিকে নজর পড়তে চোখ বুজল স্বদেশ। বাতাসে বৃষ্টির প্রতি দানা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে শীতল, ভারী ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

ছই-এর তলায় জায়গা পায়নি স্বদেশ। চেষ্টাও করেনি। বৃষ্টিতে ভেজা শরীরে বাতাস লেগে হওয়ায় কাঁপুনি ধরে গেছে তার। বাতাসের দাপটে উড়ে যাবার আশঙ্কায় শক্ত হাতে কাঠের পাটাতন চেপে ধরে আছে। তাড়াহুড়ো করে এভাবে নৌকোয় ওঠার জন্যে আক্ষেপ হচ্ছে তার। চকশুকদেবপুরে একদিন পরে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। একটা দিন বাঁচাতে পুরো পরমায়ু বাজি ধরার ছেলেমানুষি তার সাজে না। অথচ সেটাই করেছে সে। এ বোকামি স্কুল, কলেজের ছেলেদের মানায়। খেসারতও তারা দেয়। তারা অবাধ, মুক্ত। সংসার, বউ ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নেই তাদের।

কাছাকাছি জলের ওপর কড়কড় শব্দে বাজ পড়তে লাফিয়ে উঠল নৌকো। অল্পবয়সি ছেলেটাকে মাঝি চেঁচিয়ে বলল, এই শোরের লাতি, পাল নামা, তাড়াতাড়ি নামা। নৌকো তইলে যায়, সামাল, সামাল।

ঝোড়ো হাওয়ার গর্জন, জলের তমুল কলকল শব্দে মাঝির কথার একটা বর্ণ দাঁড়ি শুনতে পেল না। গুঁড়ো জলকণার ঘন ধোঁয়াতে নৌকোর দুপ্রান্তে বসা দুই চালক ঢাকা পড়ে গেছে। কথা শোনা দূরের কথা, কাউকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। মাঝির কোল ঘেঁসে বসেছে স্বদেশ। মাঝির কথার ভাঙা শব্দ জুড়ে এক সর্বনাশা বিপদ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। চকশুকদেবপুরের

বদলে তীরের মতো সমুদ্রের দিকে চলেছে নৌকো। হাল ধরে নৌকো সামলাতে কুকুরের মতো মাঝি হাঁপাচ্ছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে বাঁশ দড়ি সমেত পাল ভেঙে পড়তে ভয়ে যাত্রীরা একসঙ্গে ডুকরে উঠল। মাঝি বলল, বদর, বদর।

অল্পের জন্যে পালের বাঁশ স্বদেশের ঘাড়ে পড়েনি। চোখ তুলে মাঝির দিকে তাকাল স্বদেশ। পাল ভেঙে পড়ায় নৌকো বেঁচে গেছে। বিভীষিকা মুছে শান্ত হয়েছে মাঝির দুচোখ। বান আসার আধঘন্টা আগে চকশুকদেবপুরের ঘাটে লাগল নৌকো। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে।

মেঘে, বৃষ্টিতে নিস্তব্ধ গ্রাম শ্মশানের মতো পড়ে আছে। জল, কাদা মাড়িয়ে কালীপদর বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল স্বদেশ। তার পায়ের পাশ দিয়ে থপথপ করে লাফিয়ে চলে গেল একটা ব্যাঙ। মাটির বাড়ি। দুটো ঘর, একটা দাওয়া। দাওয়ার বাঁ পাশে টালি ঢাকা নিচু রান্নাঘর। বেশিরভাগ টালি ভেঙে গেছে। দাওয়ার খড়ের ছাউনিও প্রায় ফাঁকা। জলে ভেসে যাচ্ছে মাটির দাওয়া। উঠোনে দাঁড়িয়ে স্বদেশ দেখল, দুটো ঘরের দরজাই বন্ধ। বৃষ্টি, দুর্যোগে বাঁচতে দরজা বন্ধ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু বাড়িটা বড় নিঝুম, ভূতুড়ে ঠেকছে। আগে কখনও স্বদেশের এরকম মনে হয়নি। যখনই এসেছে, সদর থেকে শুনেছে সীতার কোন ছেলের গলা, কান্না, কালীপদর কথা, কাশির শব্দ। অবশ্য এমন ঝড়, বৃষ্টি মাথায় করে এ বাড়িতে আগে কখনও আসেনি সে।

গাছ লতায়, পুকুরে অঝোর বৃষ্টির শব্দ। কাছে কোথাও পরপর তিনটে বাজ পড়ল। উঠোনে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ এভাবে বৃষ্টিতে ভেজা যায়? জল ঢুকে কাঁধের ঝোলা অসম্ভব ভারী হয়েছে। দাওয়ায় উঠে কালীপদর ঘরের দরজায় টোকা দিল স্বদেশ। কেউ সাড়া দিল না। এক মুহূর্ত তাকিয়ে স্বদেশ দেখল ঝোড়ো হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে বন্ধ দরজা। এই অবিরাম কাঁপুনিতে আঙুলের টোকার মৃদু শব্দ শোনা সম্ভব নয়। হাত মুঠো করে দরজার পাল্লায় বেশ জোরেই তিন, চার কিল মারল স্বদেশ। গুম, গুম, গুম শব্দের সঙ্গে পুরনো, জীর্ণ দরজা যেভাবে দুলে উঠল, যেন ভেঙে পড়বে। ভয় পেল স্বদেশ। তখনই ঘরের মধ্যে থেকে রুগ্ন ভাঙা গলায় কালীপদ প্রশ্ন করল, কে?

দরজার দুটো পাল্লা সামান্য ফাঁক করে স্বদেশ চেঁচিয়ে বলল, আমি। আমি স্বদেশ।

ঘরে মানুষের নড়াচড়া, ফিসফিস কথা শুনল সে। দরজার খিল খুলে একটা পাল্লা ফাঁক করে উঁকি দিল সীতা। কাকভেজা, আলুথালু স্বদেশের দিকে কয়েক সেকেন্ড অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে সীতা বলল, আসুন।

স্বদেশের ভিজে পোশাক বেয়ে কুলকুল করে জল নামছে। ঘরে ঢুকলে মাটির মেঝে কাদা হয়ে যাবে। তার মুখ দেখে সীতা বলল, ফুটো চালের জলে ঘর ভাসছে। বাড়তি আর কী হবে?

৮

ঘরে পা দিয়ে স্বদেশ দেখল তক্তপোশে বিছানায় শুয়ে আছে কালীপদ। কালীপদ, না তার কঙ্কাল, প্রথমে বুঝতে পারল না স্বদেশ। এক-পা, দু-পা করে সে এগিয়ে গেল তক্তপোশের দিকে। কালীপদকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। কঙ্কাল নয়, সশরীরে কালীপদ। তবে কঙ্কাল হতে খুব দেরি নেই। কালীপদর পাশে ঘুমোচ্ছে সীতার বড় ছেলে লালু। তার বয়স, পাঁচ। আগে দুবার দুপুরে এ ঘরে ঢুকে কালীপদর পাশে তার ছোট নাতি, দু' বছরের ভুলুকে ঘুমোতে দেখেছে

স্বদেশ। রুগ্ন, অপুষ্ট ছোট নাতির ওপরই, স্বদেশের মনে হয়েছে, কালীপদর টান বেশি। লালু ঘুমোত, পাশের ঘরে মায়ের সঙ্গে। ভিজে জামাকাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্বদেশের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে কালীপদ। প্রিয় ছাত্রকে চিনতে জরাজীর্ণ মানুষটার যেন কষ্ট হচ্ছে। আবছা অন্ধকার ঘরে নেচে গেল এক ঝলক বিদ্যুতের আলো। স্বদেশ প্রশ্ন করল, চিনতে পারছেন আমাকে?

আর কিছু সে বলার আগেই তীক্ষ্ণ কান্নায় ডুকরে উঠল কালীপদ। কান্নার আওয়াজটা, আর্তনাদ অথবা বুকফাটা গোঙানি, বুঝতে পারল না স্বদেশ। কালীপদ যে কাঁদতে পারে, এরকম ভেঙে পড়তে পারে, ভাবেনি স্বদেশ। টলমল করে উঠল তার পায়ের তলার মাটি। স্বদেশ ঘরে ঢুকতে বেরিয়ে গিয়েছিল সীতা। ঘরে ফিরল সে।

বিষণ্ণ, থমথমে মুখে সীতা বলল, ভিজে পোশাক ছেড়ে ফেলুন। পাশের ঘরে শুকনো ধুতি, চাদর, গামছা আছে। দাওয়ায় বালতিতে জল দিয়েছি।

আতঙ্কে সিরসির করছে স্বদেশের শরীর। চাঁপা গলায় এখনও গোঙাচ্ছে কালীপদ। পাশের ঘরে এসে ভিজে পোশাক ছেড়ে শুকনো ধুতি, চাদরে আরাম পেল সে। পা, হাত ধুয়ে গামছায় মাথা মোছার সময় হঠাৎ তার মনে হলো, কালীপদর কান্না শুধু অসুস্থতার জন্যে নয়। এ সংসারে কিছু ঘটেছে। ঠিকঠিক নেই সব। কেন এমন মনে হলো? কেন? নিজের ভিজে পোশাক নিংড়ে দড়িতে মেলে দেবার জন্যে ঘরে ঢুকল সে। সে ঘরেও একটা তক্তপোশ রয়েছে। তক্তপোশ খালি। ভুলু কোথায়? ছ্যাঁৎ করে উঠল স্বদেশের বুক। তখনই তার খেয়াল হলো, ভুলুকে না দেখেই একটু আগে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল তার মন।

মাটি থেকে ভিজে জামাকপড় তোলার সময়ে দরজা থেকে সীতা বলল, ওগুলো থাক ওখানে। কেচে দেব আমি।

সোজা হয়ে দাঁড়াল স্বদেশ। দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সীতাকেও আলাদারকম দেখাচ্ছে। স্বদেশ আসায় চটপট একটা আনকোরা নতুন শাড়ি পড়েছে সীতা। শাড়ির জন্যে বোধহয় চকচক করছে তার মুখ। এতক্ষণ পর্যন্ত স্বদেশের ধারণা ছিল, ভুলু আছে সীতার কোলে। রোগা ছেলে মায়ের বুকে এমন লেপটে থাকে যে দেখা যায় না। আজও তাই হয়েছে। ভুলুকে সে দেখতে পায়নি। সীতাকে একা দেখে স্বদেশ প্রশ্ন করল, ভুলু কোথায়?

আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সীতা। সীতার কান্নার ধরণে স্বদেশ চমকে গেল। ভুলু যে পৃথিবী থেকে চলে গেছে, বুঝতে তার অসুবিধে হলো না।

সন্ধের পর মেঘ কেটে গেল। ঝিমিয়ে এসেছে বানের তেজ। রাত আটটার আগে জলে ভাসবে না কোন নৌকো। কেঁদে, ডুকরে, ছটফট করে অনেক স্বাভাবিক হয়েছে কালীপদ। বিছানায় উঠে বসেছে সে। অসুস্থ ভুলুকে হাসপাতালে ভর্তি করে মহকুমা ট্রেজারি অফিসে পেনশনের কাগজ, বই দিয়ে এসেছিল কালীপদ। রোজ সকাল, সন্ধে নাতিকে দেখতে যেত সে। দুদিন গিয়েছিল সীতা। ফুসফুসে ব্যাধি নিয়ে জন্মেছিল ভুলু। ব্যাধিটা কী, সদর হাসপাতালের ডাক্তার ধরতে পারেনি। বকেয়া পেনশনের টাকা পেলে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভুলুকে চিকিৎসা করাবার কথা ভেবেছিল কালীপদ। পেনশন পাবার খবর আর ভুলুর বিষয়ে পরামর্শ নিতে কলকাতায় স্বদেশের বাড়ি রওনা দিয়েছিল কালীপদ। ফেরিঘাটে পৌঁছবার আগেই হাসপাতাল থেকে খবর এল, ভুলু মারা গেছে। রোগে নয়, হাসপাতালে ঢুকে তার আধখানা শরীর কুকুরে খেয়ে ফেলেছে। ঘটনা বলার সময়ে বার বার কাপড়ের খুঁটে নাকের

জল মুছেছে কালীপদ।

ভুলুর বীভৎস মৃত্যুতে বুকে আলোড়ন জাগলেও কালীপদর পেনসনের সুরাহা হওয়ার খবরে স্বদেশের মনের গভীরে হালকা খুশি ছড়িয়ে আছে। একবাটি তেলমাখা মুড়ি, ছোলা ভাজা, এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল সীতা। তক্তপোশে স্বদেশের সামনে মুড়ি, চা রেখে সীতা বলল, খান।

তেলমাখা মুড়ি ছোলা, ঘোলাটে চা দেখে স্বদেশ বলল, এসব আমার চলে না।

কেন?

সীতার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঝোলা থেকে জলের জ্যারিকেন বার করে স্বদেশ বলল, বাইরে কিছু খাই না। ডাক্তারের বারণ। প্রাণের দায়ে খাবার জল পর্যন্ত সঙ্গে রাখতে হয়।

স্বদেশের কথায় কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকল সীতা। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, পাশের বাড়ির পতিতকে যে একটা মুরগি কিনে কেটে আনার জন্যে পাঠালাম।

সর্বনাশ!

স্বদেশের আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে কালীপদ বলল, সর্বনাশের কিছু নেই। আজ এ বাড়িতে ভাত, মাংস খাবে তুমি। আমি বলছি কিছু হবে না তোমার।

মাপ করবেন, ডাক্তারের নিষেধ, খেলেই মারা যাব।

কথাগুলো বললেও মন থেকে সায় পাচ্ছে না স্বদেশ। কেন পাচ্ছে না? আসলে অনেকদিন পরে খিদে বোধ করছে সে। খিদের ছলনাও হতে পারে। মুরগির মাংস আসছে শুনে আনন্দে হাততালি দিচ্ছে লালু। তেলমাখা মুড়িছোলার বাটিতে তার লোলুপ দৃষ্টি! মুড়ির বাটি লালুকে এগিয়ে দিয়ে স্বদেশ বলল, খাও।

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না লালুকে। বাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। সীতা বলল, সাবধান, মুড়ি ছড়াবে না।

চিবনো মুড়িছোলার মিঠে গন্ধ লালুর মুখ থেকে ভেসে আসছে। দুপুর থেকে হাল্কা খিদের যে অনুভূতি স্বদেশ টের পাচ্ছিল, হঠাৎ সেটা তীক্ষ্ণ হয়েছে। মনে হচ্ছে, তেলমাখা একমুঠো মুড়িছোলা খেতে পারত সে। পরীক্ষামূলক একটা ব্যাপার হতো। লালুর কচি হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে দু'চার দানা মুড়ি, কয়েকটা ছোলা তক্তপোশে খসে পড়ছে। কালীপদ বলছে, তোমায় দেখে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠেছি স্বদেশ। কী আনন্দ যে আমার হচ্ছে আজ। ভুলু মারা যেতে খুব ভেঙে পড়েছিলাম। তিন বছরের একটা কচি ছেলেকে যে দেশে হাসপাতালে কুকুর ঢুকে খেয়ে যায়, সেখানে পেনশনের টাকায় বুড়ো বয়সে বেঁচে থেকে কী লাভ? তোমায় দেখে হতাশা কেটে গেছে। মনে হচ্ছে, স্বদেশ সরকারের মতো দু'একজন ছাত্র তো তৈরি করেছি। এর চেয়ে বড় গৌরব কী আছে? ইচ্ছে হচ্ছে, লালুটাকে মানুষ করে তুলি। তোমার মতো হয়ত হবে না, তবু যতটা হয়!

মুরগি রান্নার গন্ধ নাকে ঢুকতে স্বদেশ টের পেল তার পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। বদহজম, চোঁয়াঢেকুর, অম্বল, বমির ভয়াবহ স্মৃতিতেও ভোঁতা হলো না খিদের ধারালো অনুভূতি। বরং মিনিট, ঘন্টার সঙ্গে তাল রেখে চড়চড় করে বাড়তে থাকল খিদে।

হ্যারিকেনের ম্যাড়মেড়ে আলোর সামনে রাত আটটায় পাশাপাশি খেতে বসেছে কালীপদ, স্বদেশ, লালু। স্বদেশ বসেছে মাঝখানে। নকশা করা আসন তাকে পেতে দিয়েছে সীতা। তার ভাতের থালার পাশে বাটি, প্লেটে সাজানো ডাল, বেগুনভাজা, মুরগির মাংস, আনারসের চাটনি।

কী কাণ্ড! কত রেঁধেছ তুমি!

স্বদেশের কথায় সীতা বলল, গত সাড়ে তিন বছরে আজ প্রথম আমাদের বাড়িতে খেলেন আপনি!

তা বলে এত?

কথা ঘোরাতে সীতা বলল, তিন হপ্তা পরে আজ বিছানা থেকে নেমে মাটিতে বসে বাবা খাচ্ছে।

তা ঠিক, মেয়ের কথায় সায় দিল কালীপদ। সীতা যা দিয়েছে, সব খেল স্বদেশ। তবে ভয়ে ভয়ে। জোর করে দ্বিতীয়বার তাকে ভাত, মাংস দিল সীতা। স্বদেশ নিজের চোখ, হাত-পা, পেট, গোটা অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একবার তার মনে হলো, যে খাচ্ছে সে কি স্বদেশ সরকার? স্বদেশ সরকার বাঁচবে তো?

কালীপদর পাশের ঘরে তক্তপোশে রাতে শুলো স্বদেশ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। নিশ্ছিদ্র, গভীর ঘুম। কৈশোর, ছাত্রজীবনের পর এমন ঘুম তার হয়নি। ঘুম ভাঙতে প্রথমে ভয় পেয়েছিল সে। কিন্তু নাহ্, সে যা আশঙ্কা করছিল, কিছুই নেই। চোঁয়াঢেঁকুর, অম্বল, পেটভার, কিছু নেই। বরং পেটে চনমনে খিদে। ভেল্কি নাকি?

অবাক স্বদেশ রহস্যের থই পাচ্ছে না। ঘরে ঢুকল কালীপদ। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সীতা। তক্তপোশে স্বদেশের পাশে বসে কালীপদ প্রশ্ন করল, ঘুম হয়েছে?

হ্যাঁ।

শরীর ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

সীতা প্রশ্ন করল, চা খাবেন?

হ্যাঁ।

মুড়ি, ছোলা?

হ্যাঁ।

বেলা আটটায় নৌকো ধরার জন্যে তৈরি হলো স্বদেশ। বাড়ি থেকে সে বেরবার আগে কালীপদ একটা প্যাকেট স্বদেশকে দিয়ে বলল, বউমার জন্যে ডায়মন্ডহারবার থেকে কিনেছিলাম। কলকাতায় গিয়ে নিজের হাতে এ শাড়ি দেবার ইচ্ছে ছিল তাকে। ভুলু চলে গেল। কলকাতায় যাওয়া হলো না আমার।

কী দরকার ছিল?

স্বদেশের কথায় কালীপদ বলল, গরিব মানুষেরও তো সাধআহ্লাদ আছে।

এ কথার পরে কথা চলে না। শাড়ির প্যাকেট ঝোলায় রাখল স্বদেশ।

জলের জ্যারিকেন কি দরকার হবে আপনার?

সীতার প্রশ্নে স্বদেশ জিজ্ঞেস করল, কেন?

মুচকি হেসে সীতা বলল, ওটা পেলে কেরোসিন রাখতাম।

সীতার কথা শুনে হো হো করে হাসল স্বদেশ।

এই প্রথম ফেরিঘাটে স্বদেশের সঙ্গী হতে পারল না কালীপদ। লালুকে কোলে নিয়ে সীতা গেল ঘাট পর্যন্ত। নৌকো ছাড়াব সময় সীতা বলল, আবার আসবেন।

নরম রোদ উঠেছে আকাশে। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। প্রথম সকালের আলোয়

ঝিলমিল করছে গঙ্গার জল। হাতের পাতায় জড়িয়ে থাকা তেলমাখা মুড়িছোলার সুগন্ধ পেল স্বদেশ। টেঁকুর নেই, গলাজ্বালা নেই, কোন কষ্ট নেই পেটে। অসাধারণ এক নিরাময়ে বুঁদ হয়ে আছে সে। জেটির কাছে চলে এসেছে নৌকো। পেটে খিদে, হজম করার অসম্ভব শক্তি। ডায়মন্ডহারবার বাজার থেকে একটা টাটকা ইলিশ কিনে আজ বাড়ি ফিরবে স্বদেশ।

উন্মোচন

এক

সাতটা বাজার দু' এক মিনিট আগেই সুতপন এস্‌প্ল্যানেড বাসগুমটিতে পৌঁছে গেল। দীঘার বাস ছাড়বে সওয়া সাতটায়। বাসগুমটির কাছাকাছি কয়েকটা চায়ের দোকান, ঠিক দোকান নয়, অগোছালো দেহাতি ঝুপড়িতে উনুনে বসানো ফুটন্ত জলের ড্রাম থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দোকানের সামনে ভাঙা বেঞ্চি, খালি ব্যাটারির খোল আর ইট পাতা। দীঘার বাসটার ওপর চোখ রেখে বেঞ্চিতে বসে সুতপন বললো, একটা চা, ভাঁড়ে।

শেষ শীতের কুয়াশা ঢাকা আবছা সকাল। গঙ্গার বুক থেকে সারারাত ধরে সর্পিল গতিতে উঠে আসা শীতল, ভারী বাষ্প চারপাশের মাঠ, ময়দান, গাছপালা আবৃত করে আছে। ফ্যাকাশে সাদা বায়বীয় আস্তরণ অনেক বেলা পর্যন্ত এই অঞ্চলকে আঁকড়ে থাকে। উলের মাফলারটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে সুতপন চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিল। চোখে সতর্ক, সন্ধানী দৃষ্টি। কুয়াশার মধ্যে দু'একজন করে অচেনা মেয়ে, পুরুষ দীঘার বাসে উঠছে। এলা কি ইতিমধ্যে বাসে উঠে পড়েছে? এলার কথা মনে হতে সুতপনের হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করে ওঠে। ভয় আর উত্তেজনায় শরীরের রক্ত চলাচল দ্রুত হয়। ট্রাউজার্সের হিপ পকেটে ডান হাতের তর্জনী ঢুকিয়ে দীঘার টিকিট দুটো স্পর্শ করে। এলার টিকিটও তার কাছে আছে। আর আছে, দীঘা টুরিস্ট হোমের চার নম্বর ঘর বুকিং-এর রসিদ। এলাকে নিয়ে সে আজ দীঘায় চলেছে। গোপনে, চেনা লোকচক্ষুর নজর এড়িয়ে টুরিস্ট হোমের চার নম্বর ঘরে ঢুকে পড়লে সে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত হবে। পরিচিত মানুষের সামনেই একজন মানুষ অবাঞ্ছিত কোনো কাজ করার জন্যে লজ্জা পায়। এলাকে নিয়ে আজ রাতভর দীঘায় কাটিয়ে কাল সন্ধ্যের মধ্যে সুতপন কলকাতায় ফিরবে। সেই রকম পরিকল্পনা মাথায় আছে। বাড়িতে জয়ন্তীকে তাই বলেছে। অবশ্য দীঘা যাওয়ার কথা জয়ন্তীকে বলেনি। বলা সম্ভবও নয়। একজন পঁয়ত্রিশোর্ধ, মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী ভদ্রলোক এই ধরনের দুঃসাহসী ভ্রমণে যাওয়ার আগে ঠিক যেভাবে বানানো কথায় স্ত্রীকে ফাঁকি দেয়, সুতপনও তাই করেছে। বলেছে, অফিসের জরুরি কাজে ধানবাদ যাচ্ছি, কাল বিকেলে ফিরবো।

বিশ্বাস না করে উপায় নেই বলেই জয়ন্তী বিশ্বাস করেছিল সুতপনের কথা। কেননা, অফিসের কাজে আগে কখনো সুতপনকে বাইরে যেতে হয়নি। বাইরে যাওয়ার কাজ সুতপনের নয়।

মিথ্যে কথাটা বলে সুতপন জয়ন্তীর দিকে তাকায়নি। কি জানি, মুখ দেখে জয়ন্তী যদি কিছু আঁচ করে। ভয়ে ধুক্‌পুক্‌ করছিল সুতপনের বুক। কিন্তু না, জয়ন্তী কিছু বুঝতে পারেনি। জয়ন্তী সরল, অনুগত স্ত্রী। সুতপনের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। শুধু পাঁচ বছরের ছেলে গোগোল, ভোররাতের ঘুম জড়ানো গলায় বায়না ধরেছিল, বাবা আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

চা শেষ করে সুতপন একটা সিগারেট ধরালো। বাঁ হাতের কবজিতে। বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, সাতটা বেজে দশ মিনিট। সাতটার মধ্যে এলার এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। অথচ এলার দেখা নেই। হয়তো সে আসার আগে এলা এসে বাসে উঠে বসেছে। আর

অপেক্ষা করার মানে হয় না। দুরুদুরু বুকে সে বাসের দিকে এগোলে। একটা ভর্তি বাসে প্রা
জনা পঞ্চাশ যাত্রী থাকে। তাদের কেউ একজন যদি তার চেনাজানা বন্ধু বা আত্মীয় হয়, ডেে
ওঠে 'সুতপন' বলে, তাহলে কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। ভয়ে কণ্ঠনালীটা হঠাৎ ভীষণ শুকা
লাগে, বুকের খাঁচার মধ্যে হৃৎপিণ্ড দাপাদাপি করে। সুতপন নামে কেউ নেই। এলাও তাে
চেনে শুভেন্দু নামে। টুরিস্ট হোমের রসিদেও তার নাম সুতপন সেন নয়, শুভেন্দু গুপ্ত। বাে
ওঠার মুহূর্ত থেকে সে শুভেন্দু গুপ্ত হয়ে যাবে। শুধু নাম নয়, তার পেশা, আচরণ, সবকি
বদলে যাবে। পাঁচ বছর ধরে এলার সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলা শুভেন্দু গুপ্তে
ভাবমূর্তিকে অটুট রাখতে হবে। কোথাও যেন এতোটুকু ভুল না হয়। অতি বাস্তব জীবন্ত সুতপ
সেনকে নাকচ করে কাল্পনিক শুভেন্দু গুপ্তকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। কাল্পনি
শুভেন্দুর হাতে বাস্তব সুতপনের মৃত্যু ঘটাতে হবে।

বাসের জানলার কাচ বন্ধ। কাচের গায়ে পাতলা ধোঁয়ার মতো কুয়াশার আবরণ। জানল
পাশে বসা মানুষগুলোর মুণ্ডু বাইরের রাস্তা থেকে বিমূর্ত শিল্পের মতো মনে হচ্ছে। হকারে
কাছ থেকে একটা ইংরিজি, একটা বাংলা সংবাদপত্র কিনে সুতপন বাসের সিঁড়ির কাছে এে
দাঁড়ালো। তারপর দু' ধাপ উঠে ভেতরে একপলক চোখ বুলিয়ে যাত্রীদের দেখে নেওয়ার চেষ্ট
করলো। উত্তেজনায় তার শরীরের সব রক্ত মুখে উঠে এসেছে। পরিচিত কারো চোখের সঙ্গে
যদি তার চোখ দুটো আটকে যায়। না, সেরকম কিছু হলো না। সুতপনের কপালের দুপাশে
রক্তচাপ ক্রমশ শিথিল হয়ে যায়। এলা আসেনি। বাঁচা গেল। আরামে সুতপন একটা লম্ব
নিঃশ্বাস ফেললো। তার শরীর এবং মনে নিবিড় প্রশান্তি ঘনিয়ে উঠলো, অনেকদিনের চেষ্টায়
তৈরি ভ্রমণের এই পরিকল্পনা এভাবে মাঠে মারা গেলেও কষ্ট হলো না। ভালোই হয়েছে। এতে
সংশয়, এতো ভয় আর ঝুঁকি নিয়ে বান্ধবীর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করা যায় না। এলার ন
আসাটা সুতপনের কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে হলো। বাসের টিকিট আর হোটেলের বুকি
বাবদ কিছু টাকা গচ্চা গেল। তা যাক। চব্বিশ ঘন্টার জন্যে সে একাই বেড়িয়ে আসবে। মুক্ত
বিহঙ্গের মতো একা একা ঘুরে বেড়াবার মধ্যেও এক ধরনের অনাবিল আনন্দ আছে। জানলার
ধারে তেরো নম্বর সিটটায় বসে গলার মাফলারটা সুতপন আলগা করে দিল। ফ্যাকাশে সাদ
কুয়াশা অদৃশ্য এক ধুনুরির ছিলার টঙ্কারে ছাইবর্ণ পেঁজা তুলোর মতো টুকরো টুকরো হয়ে
ভোরের আলোয় মিশে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হচ্ছে চারপাশ। ইংরিজি খবরের কাগজট
মুখের সামনে খুলে, তার আড়াল থেকে আরো একবার সহযাত্রীদের খুঁটিয়ে দেখে নিল সে
না, চেনাজানা কেউ নেই। প্রশান্তির ঘন নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে। সেই সঙ্গে
মুখ থেকে শীতের বর্ণহীন বাষ্প কিছুটা ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। তার বাঁ পাশে চোদ্দ নম্বর
সিটটা এলার। ওটা খালি। দীঘা পর্যন্ত খালি থাকবে। বাস চললে একটু কাত হয়ে আয়েশ করে
গোটা আসন জুড়ে সে বসবে। দুটো সিটেরই পয়সা দিয়েছে সে। অতএব দুটোই ভোগদখলের
অধিকার তার আছে। কখন একসময় নিজের সিটে ড্রাইভার এসে বসেছে, সে দেখেনি। ইঞ্জিন
গর্জে উঠতে বাসের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলো, কন্ডাক্টর একজন লোকের সঙ্গে
কথা বলছে। গরম হচ্ছে বাসের ইঞ্জিন, আর সেই সঙ্গে এক গতিময় কম্পন ছড়িয়ে পড়ছে
বাসের শরীরে। ঠিক তখনই সুতপন দেখতে পেলো এলাকে। জোর কদমে পা ফেলে এল
এগিয়ে আসছে বাসের দিকে। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, ফর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল। পনিটেল
করা লম্বা ঘন কালো চুল পিঠের ওপর নাচছে। ফুলতোলা গোলাপি রঙের উলের আলোয়ানে

রীর ঢাকা। বাঁ কাঁধে ঝোলানো নাইলনের জাপানি ব্যাগ, ডান হাতে চামড়ার বটুয়া। এলা বাসে উঠতেই সুতপনের হৃৎপিণ্ডটা কেমন কুঁকড়ে গেল। বিরক্তি, ভয়, আড়ষ্টতা ছড়িয়ে পড়লো শরীরে। ভর্তি বাসে একমাত্র এলারই ওঠা বাকি ছিল। সে উঠতে বাস বোঝাই মেয়ে পুরুষ একাগ্র নজরে তাকে লেহন করতে লাগলো। যে কোনো জায়গায় শেষে পৌঁছোনোর এই বিপদ। সকলের চক্ষুশূল হতে হয়।

হিম আর রোমাঞ্চে এলার মুখ মাখামাখি। রীতিমতো সুন্দরী দেখাচ্ছে তাকে। মুখের সামনে থেকে কাগজটা নামিয়ে সুতপন চোখের ইঙ্গিতে এলাকে ডাকলো। দুচোখে উদ্বেগ নিয়ে এলাও খুঁজছিলো সুতপনকে। সুতপনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে এলা ঝিলিক দিয়ে হাসলো। অনেক চেষ্টায় ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি সঞ্চয় করে সুতপন উঠে দাঁড়ালো। এটুকু ভদ্রতা করতেই হবে। জানলার পাশের জায়গাটা আর পাঁচজন মহিলার মতো এলারও খুব প্রিয়। সেই সুবাদে এলা দখল করলো তেরো নম্বর সিট, আর সুতপন সরে এলো চোদ্দ নম্বরে। বাস তখন ময়দান ছেড়ে রাস্তায় উঠেছে। বাসের মধ্যে একজনও পরিচিত মানুষ নেই, ভর্তি বাসে মাঝ রাস্তা থেকে কেউ উঠবে, এমন সম্ভাবনাও কম, তবু অস্বস্তি আর ভয়ে সুতপনের গলা শুকিয়ে যেতে থাকে। হৃৎপিণ্ডে কি দারুণ লাফালাফি! যন্ত্রটা যেন এখনি বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে। কপালে, ঘাড়ে ঘাম জমছে, সুতপন বুঝতে পারে। দমবন্ধ, কষ্টকর অবস্থা। একটু ঠাণ্ডা বাতাসের জন্যে সুতপনের ফুসফুস খাবি খায়। বাসভর্তি শীতকাতুরে মানুষ, ঠাণ্ডার ভয়ে কেউ জানলা খোলেনি। গলার মাফলারটা আলগা ক'রে নিচু স্বরে সুতপন বললো, এলা, জানলাটা খুলে দাও। বাস তখন হাওড়া ব্রিজের মুখে। ভরা জোয়ারের গঙ্গায় গৈরিক বর্ণ জলস্রোত সাদা ফেনার ফুল ফুটিয়ে উত্তরমুখো ছুটে চলেছে। রাস্তার মানুষ, যানবাহন হাতে গোনা যায়। এলা তখনও কলকল করে বলে যাচ্ছিল, তার দেরি হওয়ার কাহিনী। শীতের সময় এতো সকালে সে কখনো বাসে চাপেনি। ভোর পাঁচটায় ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। বিশ্বাসঘাতক ঘড়ি বাজলো ছ'টায়। তারপর উঠে বাড়ির সব ঝামেলা মিটিয়ে বার হওয়া সহজ কথা নয়। এলার মুখটা হঠাৎ ম্লান হয়ে উঠলো। বাড়ির প্রসঙ্গে ওর হয়তো অসুস্থ দাদা হেমাঙ্গ, আর বিধবা মায়ের মুখ মনে পড়েছে। বুকের অসুখে গত বিশ বছর ধরে হেমাঙ্গ ভুগছে। হেমাঙ্গর বয়েস এখন চৌত্রিশ, সরকারি চাকুরে, আর কটা দিন বাঁচবে, কেউ জানে না। অসুস্থতা সত্ত্বেও হেমাঙ্গ প্রেম করে বিয়ে করেছে, বছর চারেকের একটা মেয়ে আছে। এলার পারিবারিক এইসব খবর সুতপন আগেই শুনেছে। দাদার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে বৌদির বিরুদ্ধে চাপা অভিমান এলার কথাবার্তায় সুতপন মাঝে মাঝে টের পায়। দাদার প্রসঙ্গ উঠলে এলা সুতপনের অন্তরঙ্গ, মুহূর্তগুলো বড় বিষাদগম্ভীর হয়ে ওঠে। হেমাঙ্গ সম্পর্কে সুতপন তাই সহজে কথা তোলে না। হেমাঙ্গর মেয়ে আবার এলার খুব ন্যাওটা। ভাইঝির কথা বলতে এলা তাই গদগদ। ভাইঝি যেন তারই মেয়ে, তার গোপন আকাঙ্খার ফসল।

কাচের জানলাটা সুতপন নিজেই হাত বাড়িয়ে খুলে দিতে তির বেগে শীতল হাওয়া এসে এলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পনিটেলের গুচ্ছ লণ্ডভণ্ড করে দিল। চুলের সুগন্ধের সঙ্গে কড়া প্রসাধনের ঘ্রাণ পেল সুতপন। গন্ধওলা পারফিউম সুতপন সহ্য করতে পারে না। মাথা ধরে, গা গুলোয়। ঠাণ্ডায় হি হি করে কেঁপে উঠে এলা অবাক চোখে সুতপনকে দেখলো। একবুক হাওয়া টেনে খানিকটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিতে সুতপন বললো, বেজায় গরম হচ্ছে।

আমি যে শীতে জমে যাচ্ছি, শরীরে আলোয়ানটা আরো ভালো করে জড়িয়ে এলা

জানালো। পেছনের সিটে খুকখুক করে কেশে কেউ জানিয়ে দিল, ঠাণ্ডা হাওয়া তার পছ
নয়। ইঞ্চিখানেক খোলা রেখে জানলার কাচ সুতপন বন্ধ করে দিল। চাপা গলায় এলাকে প্র
করলো, সিঁথিতে সিঁদুর দাওনি কেন?

এতো তাড়াহুড়োয় মনে থাকে! এলা বললো, ব্যাগের মধ্যে সিঁদুর কৌটো আছে, রাস্ত
কোথাও লাগিয়ে নেবো।

দু'জনের মাঝখানে কুলকুল করে ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে। বাসের যাত্রীরা এ
নিজেদের মধ্যে কথায় মশগুল। চোরা চোখে চারপাশ দেখে নিয়ে সুতপন বুঝেছে যে, কে
তাদের দেখছে না। বাসে ওঠার সময়ে এলার শূন্য সাদা সিঁথি হয়তো কেউ নজর করেনি
তাছাড়া এলার মাথার চুল এতো ঘন আর গভীর যে সহজে সিঁথি দেখা যায় না। শীতল হাওয়া
সুতপনের উদ্বেগ ক্রমশ থিতিয়ে আসতে থাকে। চিন্তা, চেতনা ধীরে ধীরে স্বচ্ছ, স্বাভাবিক হয়
একটু নড়েচড়ে এলার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সুতপন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। সুতপনের দিকে
একপলক চেয়ে আবছা হেসে এলা বললো, আমার খুব শীত করছে।

জানলার ছোট্ট ফাঁকটা বন্ধ করার জন্যে সুতপন হাত বাড়াতে তার হাতটা ধরে এলা ফিসফি
করে বললো, খুব হয়েছে।

এলার হাতের স্পর্শে উষ্ণতা।

আমি কিন্তু সমুদ্রে চান করবো না, এলা জানালো। সুতপন সাড়া করলো না।

জি. টি. রোডে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসেব ইঞ্জিনে পাগলামি ভর করেছে। ঝড়ের গতিতে
ছুটে চলেছে বাস। এলা বলছে ছেলেবেলায় তার প্রথম সমুদ্র দেখার গল্প। বাবা, মার সঙ্গে ও
দু'ভাইবোন সেবার দীঘাতেই এসেছিল। সমুদ্রের ঘন নীল রঙ আর ঝাউবনে বাতাসের মর্ম
আজো স্বপ্নের মতো তাকে আচ্ছন্ন করে।

মুখের সামনে কাগজটা ধরে এলার কথাগুলো সুতপন শোনার চেষ্টা করছিল। সব কথা
কানে ঢুকছিল না। অন্য এক ভাবনায় ক্রমশ বুঁদ হয়ে যাচ্ছিল সে।

দুই

অনেক ভেবেই এলাকে নিয়ে সুতপন দীঘা যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিল। জটিল এক ফাঁদে
সে আটকে গেছে। স্বেচ্ছায়, খেলাচ্ছলে নিজেই ফাঁদটা সে বানিয়ে ছিল। ভেবেছিল, যখন খুশি
এই ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসবে। তার আগে একটু সুখ, একটু আরাম, এক আঁজলা জলের
মতো গণ্ডুষে পান করে নেবে। চার পাঁচ বছর ধরে এলার সঙ্গে মেলামেশার সময়ে এমন সুযোগ
বেশ কয়েকবার এসেছে। এলা নিজেই আত্মসমর্পণের সঙ্কেত পাঠিয়েছে। হয়তো মুখ ফুটে
বলেনি যে, আমায় গ্রহণ করো, লুঠ করো, নবজন্ম দাও আমার নারীত্বকে। কিন্তু আচরণে, কথায়
নানা সূক্ষ্ম রহস্যময় ইঙ্গিতে এলা তার অন্তঃকরণ, সুতপনের সামনে অনাবৃত করেছে। বারবার
কিন্তু সুতপন তার সঙ্কেতে সাড়া দিতে পারেনি। কি এক জড়তা আর পাপবোধ তাকে নিষ্ক্রিয়
নিরুত্তাপ করে দিয়েছে। মন বলেছে আসঙ্গলিপ্সা মেটাও, শরীর চীৎকার করছে. ম্যায় ভুখা
হুঁ, খাদ্য চাই, তবু সুতপন সেই কামনা মেটাতে পারেনি। শরীর এবং মন ছাড়াও মানুষের
আরো এক নিয়ামক চেতনা আছে, যা শরীর এবং মনকে অদৃশ্য রেশমি সুতোয় বেঁধে দেয়।
অদৃশ্য সেই রেশমি সুতোটা হলো মূল, মানুষের সর্বস্ব। শরীর যখন ক্ষুধার্ত, মন তখন বিমুখ

মন যখন জাগ্রত, শরীর বলে, আমি অক্ষম, ক্লান্ত। রেশমি সুতো মূল শক্তি, তখন আড়ালে বসে হাসে, অথবা কখনো করুণা জাগলে দেহ এবং মনের গিঁঠ বেঁধে দেয়। তখন মানুষ জেগে ওঠে, বলে আমি আছি, আমি অপ্রতিরোধ্য।

সুতপন জানে, এলার সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই পর্যায়টা, তার দোষেই আসছে না। আসবে না। পরিচয়ের শুরুতেই সে এক গুরুতর অপরাধ করে বসে আছে। এলাকে তার আসল পরিচয় দেয়নি। ভুল নাম, অলীক ঠিকানা আর মিথ্যে পেশার কথা বলে সে ধোঁকা দিয়েছে এলাকে। সেই সঙ্গে সে নিজেও একটা বড় ধোঁকা খেয়েছে। মিথ্যে পরিচয় বুমেরাং হয়ে তাকে বিদ্ধ করেছে। আজ এলাকে সে সব কথা খুলে বলবে, বলবে তারসত্য পরিচয়, তার স্বীকারোক্তি শোনাবে এলাকে। দ্রুতগতির বাসের সঙ্গে দুপাশের সবুজ বনস্থলী, টুকরো জনপদ চোখের পলকে পেছনে সরে যাচ্ছে। হিম আর ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশা জড়ানো পৃথিবী সূর্যের আলোয় মাতৃগর্ভ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। দুপাশের দৃশ্যাবলী স্বচ্ছ, পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

পরিচয় গোপন করে, মিথ্যে নাম ঠিকানা বলে এলার সঙ্গে গত পাঁচবছর সুতপন মেলামেশা করেছে। এই মেলামেশায় সে ক্লান্ত, হতাশ। গোটা ব্যাপারটা এখন নিষ্ফল, অর্থহীন মনে হয়। অবিবাহিতা একজন যুবতীর সঙ্গে আত্মপরিচয় লুকিয়ে এই ঘনিষ্ঠতার মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হতে চলেছে। অনেক সুযোগ পেয়েও এলাকে ব্যবহাব করতে পারেনি। দ্বিধা, জড়তায় নিজের বিরুদ্ধে, এলার বিরুদ্ধে রাগে মেজাজ বিস্বাদ হয়ে গেছে। বেশ কয়েকবার সুতপন ঠিক করেছে, এলার সঙ্গে আর মিশবে না। গোল্লায় যাক এলা। নিজের মতো সৎ, ভদ্র জীবনযাপনে সে অবিচল থাকবে। এইরকম মানসিক অবস্থায়, কয়েকবার দেখা করার সময় এবং জায়গা ঠিক করেও এলার সঙ্গে সে দেখা করেনি। শেষ বিকেলে একা নির্জন মাঠে, বা চায়ের দোকানে বসে ছটফট করেছে। এলা তখন ধর্মতলায়, বা জি পি ও ঘড়ির নিচে সুতপনের জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়ি দেখছে, ভিড় দেখছে। তার মনে সুতপন সম্বন্ধে হয়তো সন্দেহ জেগেছে। জাগা অস্বাভাবিক নয়। মানুষের বাইরের চেহারা, তার ব্যবহারিক পরিচয়, আসল মানুষটার এক দশমাংশও নয়। এলা যদি একথা না বোঝে, তবে সেটা তারই বোকামি, অপরিণত মনের লক্ষণ। বেশ কিছুদিন ধরে সুতপন চাইছিল, এলা তাকে সন্দেহ করুক, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার চোখে চোখ রেখে সরাসরি, স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করুক, তুমি কে? তোমার আসল নাম, ঠিকানা আমাকে বলো।

এলার ধারালো উজ্জ্বল দৃষ্টির সামনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সে শিউরে উঠবে, তার ভুয়ো পরিচয়ের শুকনো খোলস, এলার দৃষ্টির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যন্ত্রণা আর স্বস্তিতে সুতপন তখন গড়গড় করে বলে যাবে, তার আসল নাম সুতপন সেন, শুভেন্দু গুপ্ত নয়। সে বিবাহিত, ঘরে তার স্ত্রী, একটা ছেলে আছে। ব্যবসায়ী বলে এলা জানলেও, সে চাকরিজীবী, চাকরি করে। নাম ভাঁড়িয়ে, মিথ্যে পরিচয়ে এতোদিন মেলামেশার জন্যে ক্ষমা চাইবে।

স্বীকারোক্তি শুনে এলা অবাক, ব্যথিত এবং শেষপর্যন্ত ক্রুদ্ধ হবে। হওয়া স্বাভাবিক। তাকে হয়তো এলার লম্পট, জোচ্চোর মনে হবে। তার মুখের দিকে তাকাতে এলার প্রবৃত্তি হবে না। মানুষ এতো কপট, নীচ হয় কি করে, ভেবে নিথর হয়ে যাবে। তবু পরিচয় গোপনের বোঝা সুতপন আর বইতে পারছে না। প্রায়ই তার দমবন্ধ হয়ে আসে। অনেক রাতে ঘুমের মধ্যে এলার রণরঙ্গিণী, এলোকেশী, আগুনঝরা, রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যায়। মাঝে

মাঝে সুতপন নিজেকে শাসন করে, তিরস্কার করে। নাম ভাঁড়িয়ে এলার সঙ্গে বন্ধুত্বের ঘটনা তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এক বিশেষ মুহূর্তে খেয়ালের ঝোঁকে শুভেন্দু গু নামে নিজের পরিচয় সে দিয়েছিল। সেই থেকে এলার কাছে সে পাকাপাকিভাবে শুভেন্দু হ গেল। শুভেন্দু গুপ্ত নামেই এলা চেনে তাকে। এলার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে, রেস্টুরেন্টে, পা বসে আড্ডা দেওয়ার সময়, অনেকবার ভুলটা শুধরে সত্য পরিচয় বলে দেওয়ার ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু সংকোচ আর ভয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। ভুয়ো শুভেন্দু আসল সুতপনকে আধম করে দিয়েছে।

বোম্বে রোডের ওপর দিয়ে বাস যেন উড়ে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস কোলাঘা পৌঁছে যাবে। যাত্রীদের কেউ কেউ এখন জানলার কাচ খুলে দিয়েছে। বাসের ভেতরে ঘুর শিশিরভেজা বনজ পৃথিবীর মাটির গন্ধ। রোদে ঝলমল করছে চারপাশ। ঠাণ্ডার আড়ষ্ট কাটিয়ে যাত্রীরা দরাজ গলায় গল্প করছে।

সৈকতাবাসে আমার বুকিং আছে, একজন বললো।

আমরা থাকবো কটেজে, আর একজন জানালো।

সময়টা কিন্তু দারুণ, বেড়াবার পক্ষে আইডিয়াল, এক মহিলার মন্তব্য।

ঠিক, সায় দিল কেউ, মাঝে মাঝে পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্রের জন্যে মনটা আনচান করে।

মহিলা কলকণ্ঠে হেসে উঠলো। হাসির শব্দে মিষ্টি সম্মোহন।

ইচ্ছে থাকলেও সুতপন পেছনে তাকালো না। মনে পড়লো, কার যেন লেখায় পড়েছিল, একজন নারীর মধ্যে সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য, একাকার হয়ে আছে। শরৎ সেতু পেরিয়ে বাস এসে থামলো একটা মিষ্টির দোকানের সামনে। গঞ্জ এলাকা। ছড়ানো, ছিটোনো দোকান। রোদে পিঠ দিয়ে এখানে ওখানে জটলা করছে কিছু মানুষ। গরম সিঙাড়া আর চায়ের লোভে নিমেষে বাস খালি হয়ে গেল।

চা খাবে, সুতপন জিজ্ঞেস করলো এলাকে।

হ্যাঁ, ঘাড় নাড়লো এলা।

এলাকে নিয়ে বাস থেকে নামলো। রাস্তার ওপর, নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে সুতপন জোরে শ্বাস টানলো কয়েকবার। ঠাণ্ডা তাজা বাতাসে ভরে গেল ফুসফুস। পশমের আলোয়ানটা এলা বাসে রেখে এসেছে। মৃদু হাওয়ায় হাল্কা নীল রঙের নাইলন জর্জেট শাড়ি লেপ্টে যাচ্ছে তার শরীরে। দারুণ খুশিখুশি দেখাচ্ছে তাকে। চা, সিঙাড়া খেতে খেতে নিচু গলায় সুতপন বললো, কেউ বাসে ওঠার আগে সিঁথিতে সিঁদুরটা লাগিয়ে নাও।

মুখে আবছা হাসি নিয়ে এলা জিজ্ঞেস করলো, এতো ভয় কেন?

সুতপন গম্ভীর হয়ে গেল। কোন জবাব দিল না। পাশে দাঁড়ানো এক মহিলার সঙ্গে এলা আলাপ জুড়ে দিতে সুতপন বিরক্ত হলো। পরিচয় মানেই নাম ঠিকানা জানাজানি এবং সেই সূত্র ধরে এমন কিছু তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে, যা তার পক্ষে বিপজ্জনক। এলা ছাড়া দ্বিতীয় কারো কাছে অলীক নামে সে পরিচিত হতে চায় না। শুভেন্দু গুপ্ত নামের বানানো মানুষটা অসামাজিক। অপরিচয়ের অন্ধকারে সে সুস্থ বোধ করে। এলার জন্যে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সুতপন বাসের মধ্যে নিজের জায়গায় এসে বসলো। পাঁচ বছর আগে অফিস যাওয়ার সময় একদিন এলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সাড়ে দশটা বেজে গেলেও সুতপন সেদিন বাসে উঠতে পারেনি। গনগনে সূর্য ক্রমশ মাঝ আকাশে উঠে আসছিল। আধঘন্টার দৌড়ঝাঁপ আর

অস্বস্তিতে শরীর তপ্ত। হঠাৎ একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে দাঁড় করিয়েছিল। ট্যাক্সিতে উঠে দরজা বন্ধ করার সময় এলা এসে বলেছিল, আমি কিন্তু ট্যাক্সিটা আগে ডেকেছিলাম।

অপরিচিত এলার মুখের দিকে সুতপন তাকিয়েছিল। ফর্সা মুখ রোদে লাল, কপালে গুঁড়িগুঁড়ি ঘাম। আপনি যাবেন কোথায়, সহজ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল সুতপন।

ধর্মতলা।

উঠে আসুন, সুতপন বলেছিল, আমি ওদিকেই যাবো।

মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি ছড়িয়ে কপালের ঘাম মুছে এলা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছিল। তারপর বলেছিল, ধন্যবাদ। ইতিমধ্যেই বেশ দেরি হয়ে গেছে।

হুহু করে ট্যাক্সি ছুটে চললো। শরতের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছিল চারপাশ। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মিশে মিষ্টি গন্ধ এসে লাগছিল সুতপনের নাকে। হয়তো এলার শরীরের সুবাস। চলন্ত ট্যাক্সিতে এলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল।

এলা বলেছিল, থিয়েটার রোডে আমার অফিস। এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দিলেই হবে।

আপনার অফিসের সামনেই নামিয়ে দেবো, সুতপন বলেছিল, আমি যাবো ভবানীপুর।

কথাটা নির্জলা মিথ্যা। তবু কেন বলে ফেললো, সুতপন আজো জানে না। আসলে এলাকে দেখে তার পুরোনো পরিচয় হঠাৎ এলোমেলো, একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। সুতপন আজ বোঝে, প্রতিদিনের ব্যবহারে নিজের মলিন, অকিঞ্চিৎকর পরিচয়কে সে ঘৃণা করে। অথচ বানানো নতুন পরিচয়ে তার ভীষণ ভয়। ঈষৎ ভারী, অথচ নরম, মেয়েলি গলায় এলা কথা বলছিল। তার অফিসের কথা, নিত্য যাতায়াতের নানা অসুবিধের টুকরো সংবাদ। চোরা চোখে এলাকে দেখে সুতপনের মনে হচ্ছিল, এ মুখ তার চেনা, আগেও দেখেছে অনেকবার। হয়তো এক বাসস্টপ থেকে তারা রোজ বাসে ওঠে। তা যদি হয়, তবে এলা তার এলাকারই মেয়ে। ছিপছিপে সুঠাম, ফর্সা চেহারা। এক বাশ ঘন কালো লম্বা চুল, বিনুনি বাঁধা। ধারালো চিবুকে বুদ্ধির ছাপ। সুতপন কেমন অবশ হয়ে গিয়েছিল। ঝরে যাওয়া অসংখ্য আকাঙ্খা, ইচ্ছে ভর করেছিল তার মাথায়। তখনই আত্মপরিচয় গোপন করে মিথ্যে নাম, ধাম বলেছিল। সুতপন এমনিতে চরিত্রহীন, ভণ্ড নয়। ত্রিশ বছরের জীবনে যতোটা সম্ভব নীতি, মূল্যবোধ মেনে চলেছে গড়পড়তা নীতি নিষ্ঠার চেয়ে তা কম নয়। তবু এলার সামনে অজ্ঞাত তাড়নায় সে, সুতপন সেন হঠাৎ শুভেন্দু গুপ্ত হয়ে গেল। পরে সুতপন এ নিয়ে অনেক ভেবেছে। সুতপন সেনের তুচ্ছ, সাধারণ পরিচয়কে সে শুধু ঘৃণা করে না, তার মধ্যে শুভেন্দু নামে এক উপোসি, ক্ষুধার্ত সত্তা ওৎ পেতে বসে আছে। তথাকথিত হাজার নিয়মকানুন, সংস্কারের চাপে রুদ্ধ, লাঞ্ছিত সেই অচেনা শুভেন্দু বহুদিন ধরে আত্মপ্রকাশ করার জন্য ফুঁসছিল। মুক্ত, উদার পরিবেশে হয়তো এই শুভেন্দুর জন্ম হতো না। নিজের পরিচয়ে সুতপন অটুট থাকতো। শুভেন্দু সেজে নিজের সঙ্গে এই যন্ত্রণাদায়ক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো না। কিন্তু জমে থাকা চোরা অভিমান, চাপা অসহায়তা, ক্ষুধা কখন যেন তলে তলে সুতপনকে বিস্ফোরণের জন্যে তৈরি করে দিয়েছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে হতমান শুভেন্দু। রুক্ষ, কালো ভিজে পাথরের চাঙড়ে তৈরি এক আবছা পৃথিবীর বাসিন্দা এই শুভেন্দু। সেই পৃথিবী বড়ো নির্জন, রহস্যময় এবং অন্ধকার। অতল নৈঃশব্দে থমথম করছে চারপাশ। অদেখা কোন ফাটল থেকে সেখানে টুপটুপ করে শুধু চুঁইয়ে পড়ছে জলের ফোঁটা। অজাগতিক, জনমানবহীন সেই পৃথিবীতে শুভেন্দু গুপ্ত ছাড়া কেউ নেই। নিজের ক্ষিধে মেটাতে ছল, বল, কৌশল, এমন কি লুঠতরাজেও সে পিছপা নয়। সে প্রতিশোধ নিতে চায়। ত্রিশ বছরের রুদ্ধশ্বাস

বন্দী জীবনের বিরুদ্ধে এ তার জেহাদ।

ট্যাক্সির আয়নায় ড্রাইভারের দুটো অনুসন্ধানী চোখের সঙ্গে সুতপনের দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল। পেছনে বসা এলা আর সুতপনের ওপর নজর রাখছিল ড্রাইভার। ঠিক নজরদারি নয়, স্টিয়ারিংবন্দী মানুষটার চোখে ভাসছিল গোপন ক্ষুধা। সুতপনের মনে হয়েছিল, চারপাশের কোন মানুষই নিজের পরিচয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ব্যবহারিক পরিচয়ের আড়ালে সকলে অন্য কিছু পরিচয় বহন করছে, নতুন পরিচয়ে পরিচিত হতে চাইছে। দেব, দ্বিজ, সাধু, সজ্জন, চোর, ছ্যাঁচোর, কেউ ব্যতিক্রম নয়। হয়তো এর নাম বিপরীতের ঐক্য। যে সমাজ, সংসারে অসঙ্গতি যতো বেশি, পরিচয়ের এই বিদীর্ণ রূপ সেখানে ততো প্রবল। মানুষের প্রচ্ছন্ন পরিচয়, তার চালু নাম, ঠিকানার চেয়ে বহুগুণ জোরালো। অথচ এই প্রচ্ছন্ন সত্ত্বাকে জানা বা প্রকাশ করা দুরূহ। চেনা মানুষকেও তাই জটিল, দুর্বোধ্য মনে হয়। পৃথিবীতে নিয়ত অপরিচিত মানুষের ভিড় বাড়ে। ট্যাক্সিতে পাশে বসা এলার দু'গালে লালচে আভা ঘন হচ্ছিল। সুতপন সেদিন বুঝতে পেরেছিল, এক রহস্যময় খেলা শুরু হলো। নানা নতুন নক্সায়, খেলা চারিয়ে উঠবে।

থিয়েটার রোডের মুখে ট্যাক্সি থেকে নামার সময় ব্যাগ খুলে এলা বলেছিল, ট্যাক্সি ভাড়া কিন্তু শেয়ার করতে হবে।

সুতপন হামলে পড়ে এলাকে থামিয়েছিল। বলেছিল, না, না, সেকি?

ঝুঁকিবিহীন উদারতা দেখাবার সুযোগ পেলে মানুষ ছাড়ে না। ট্যাক্সির মধ্যে মৃদু সুবাস রেখে এলা নেমে গিয়েছিল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একপলক সুতপনকে দেখে সরলভাবে বলেছিল, দেখা হবে।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল সুতপন। তারপর রবীন্দ্রসদনের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বাসে চেপে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে নিজের অফিসে এসে পৌঁছেছিল। বেশ কিছু টাকা গচ্চা দিয়েও সুতপন অন্য ভাবনায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। সদ্য শুরু হওয়া খেলার মাদকতা আচ্ছন্ন করেছিল তাকে।

তিন

ধারালো হর্নের শব্দে কানের পর্দা ঝনঝন করে উঠতে সুতপন চমকে গেল। চা দোকান ছেড়ে ড্রাইভার তার আসনে গিয়ে বসেছে। যাত্রীরা তখনো চা, সিঙাড়া, হাতে হাসি ঠাট্টায় মশগুল। হর্নের আওযাজ শুনে এবার সকলে পড়িমরি করে খাওয়া শেষ করে বাসে উঠতে থাকে। কারো হাতে আধভাঁড় চা, কেউ সিঙারা চিবোচ্ছে। সিঁথিতে সিঁদুর লাগানো এক কচি তরুণীর সঙ্গে এলা বাসে উঠলো। বাসে উঠতে উঠতেও দুজনে কথা বলছে। একটু আগে মেয়েটির সঙ্গে এলার আলাপ হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এতোক্ষণ কথা বলেও গল্প ফুরোয়নি। বাসেও শেষ হবে না। গল্পের জের দীঘা পর্যন্ত চলবে। তারপর? গল্প এক অমর, অক্ষয় নটেগাছ, স্বয়ং ঈশ্বর গরু সেজে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেও এই নটেগাছকে মুড়িয়ে খেতে পারবে না। উদ্বেগ আর বিরক্তিতে সুতপন হাতের কাগজে মুখ ঢাকলো। আলাপিনীকে নিয়ে এলা এসে পাশে দাঁড়াতে, মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজ সরাতে বাধ্য হলো সে।

সুতপনকে দেখিয়ে এলা বললো, শুভেন্দু।

মেয়েটি স্মিত মুখে দু'হাত জোড় করলো।

এ হচ্ছে পারমিতা, এলা মেয়েটির পরিচয় দিল।

এলা আর পারমিতার পেছনে বেশ কয়েকজন যাত্রী জড়ো হয়ে গেছে। বাসের পেছন দিকে তাদের আসন। 'দীঘায় দেখা হবে' জানিয়ে পারমিতা নিজের সিটে চলে গেল। বাস চলতে শুরু করতে এলা বললো, পারমিতা দারুণ সুইট্ মেয়ে। এই অঘ্রাণে ওর বিয়ে হয়েছে।

আরো কি একটা বলতে গিয়ে এলা চুপ করে গেল।

স্বামীর সঙ্গে হনিমুনে যাচ্ছে নিশ্চয়, সুতপন জানতে চাইলো।

জানি না, ছদ্ম গম্ভীর গলায় এলা বললো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কাল ফিরতে পারবো তো?

কাল না হলে পরশু ফিরবো, মজা করে সুতপন বললো।

ওকথা বলবেন না, ভয়ার্ত গলায় এলা বললো, কাল থেকে দাদার শরীর ভালো যাচ্ছে না। পরশু সকালে এক্সরে করার কথা। হাসপাতালে আমাকেই নিয়ে যেতে হবে।

এলার ফর্সা মুখ মেঘলা হয়ে ওঠে।

অসুস্থ দাদার প্রসঙ্গ উঠতে বিচলিত সুতপন বলল, কালই ফিরবো। পরশু সকালে কলকাতায় আমাকেও থাকতে হবে। জরুরি কাজ।

অগাধ বিশ্বাসে এলার দুচোখ ভরে গেল। ঘন দৃষ্টিতে সুতপনের দিকে তাকালো। আত্মসমর্পণের ইচ্ছে, মাতৃত্বের পুষ্পে পল্লবিত হওয়ার আকাঙ্খা, তার দু'চোখে ফুটে উঠেছে। সুতপন জানে, শুভেন্দু গুপ্ত নামে এক অস্তিত্বহীন মানুষকে এলা তার স্বামীর আসনে বসিয়ে দিয়েছে। শুভেন্দুর কাছে এখন এলার কোন লজ্জা নেই। শুভেন্দুর সঙ্গে অবলীলায় দীঘা যাচ্ছে। অথচ শুভেন্দু বলে কেউ নেই। এলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ রাতে সে কথা জানিয়ে দেবে সুতপন। তখন এলা কি করবে? সুতপন নামে অচেনা, বিপজ্জনক এক মানুষের সঙ্গে এক ঘরে কি রাত্রিবাস করবে, অথবা চীৎকার করে আকাশ ফাটাবে? না, অতো নাটকীয়তা এলা নিশ্চয় করবে না।

খড়গপুরের দিকে বাস ছুটে চলেছে। ইঞ্জিনের গর্জন, দ্রুতগতি চাকার হাওয়া কাটার শনশন শব্দ, বায়ুতরঙ্গের সঙ্গে যাত্রীদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে অনেক যাত্রীর চোখ।

সুতপনের কানের কাছে মুখ এনে এলা বললো, পারমিতা আর তার হাজ্‌ব্যান্ড অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দেখছে।

আশঙ্কায় হিম হয়ে গেল সুতপনের বুক।

কেন? দেখছে কেন, সুতপন জিজ্ঞেস করলো।

তার গলার ঝাঁঝ এলা টের পেল না। হাল্কা গলায় বললো, আপনাকে চেনে হয়তো।

ভয়ে কাঠ হয়ে যায় সুতপন। পারমিতা বা তার স্বামীর দিকে তাকাতে সাহস পায় না। কে চেনে তাকে? পারমিতা, না তার স্বামী? যন্ত্রণায় সুতপনের পাকস্থলী কুঁকড়ে যেতে থাকে। একটা বড় এলাচ ছাড়িয়ে কয়েক দানা মুখে পুরে এলা জিজ্ঞেস করলো, আপনার ক'জন বান্ধবী আছে?

এলার গলায় মজা আর দুষ্টুমির মিশ্র সুরটুকু সুতপনের কানে ধরা পড়ে, এবং সহসা সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তার ভয়, সন্দেহ অহেতুক, বুঝতে পারে। সমুদ্র দেখার মেজাজ ভর করেছে এলাকে। তাই এলার কথায়, আচরণে এতো লঘুতা আর উচ্ছ্বাস। নিজের কাল্পনিক আতঙ্কে

সুতপন লজ্জা পায় এবং সাবলীল হওয়ার জন্যে বলে, আমাকে নয়, পারমিতার স্বামী তোমাকে দেখছে।

লজ্জা আর খুশিতে এলা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কয়েকটা এলাচদানা সুতপনের হাতে দেয়। পূবের রোদ টেরচাভাবে বাসের ওপর এসে পড়েছে। রাস্তার গর্ত, ভাঙচুর বাঁচিয়ে বাস ছুটছে বেপরোয়া গতিতে। তবু মাঝে মাঝে গর্তে চাকা পড়লে তুমুল ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠছে যাত্রীরা।

আমি কিন্তু সমুদ্রে স্নান করবো না, এলা বললো।

সুতপন মনে মনে ভাবলো, বাঁচা গেল। একজন সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে সমুদ্রে নামলে চারপাশে হ্যাংলা মানুষের ভিড় জমে যাবে। তার মধ্যে চেনা জানা দু'একজন থাকতে পারে। তাহলে সর্বনাশ! তন্বী যুবতীসহ এভাবে হাতেনাতে ধরা পড়লে কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। তবু সুতপন বললো, তোমাকে সমুদ্রে না নামিয়ে আমি ছাড়বো না। সমুদ্রস্নান না করলে দীঘায় এসে লাভ কি?

প্রথম সমুদ্র দেখার স্মৃতি এলা আবার রোমন্থন শুরু করেছে। দু'হাতে বাবাকে আঁকড়ে ধরে রোমাঞ্চে আত্মহারা এক শিশু বালি আর ফেনায় মাখামাখি হয়ে কিভাবে সমুদ্রে নেমেছিল, তার খুঁটিনাটি বর্ণনা শোনাচ্ছে। সুতপনের কানে সব কথা ঢুকছিল না। সে ভাবছিল, আসন্ন রাত্রির কথা। এলার মতো এক সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে টুরিস্টহাউসের নির্জন, পরিপাটি ঘরে রাত্রি যাপনের অসংখ্য বর্ণাঢ্য ছবি মাথায় ভিড় করছে। গত পাঁচ বছর ধরে সে এই রাতের প্রতীক্ষায় আছে। অনেক কৌশলে তৈরি করেছে এই রাত। কয়েক ঘন্টা বাদে নির্ধারিত সময় এসে যাবে। তারপর? এলে দমকা উত্তেজনার ঝোঁক কমে এলে মনটা কেমন শীতল হয়ে যায়। সিটের ওপর দু'পা মুড়ে সুতপনের শরীরের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে এলা বসে আছে। শাড়ি মোড়া এলার নরম, মসৃণ শরীর থেকে রক্ত মাংসের হাল্কা তাপ সুতপনের গায়ে লাগে।

প্রথম পরিচয়ের দিন সাতেক পরে এলার সঙ্গে এসপ্ল্যানেডে সুতপনের দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল। শেষ বিকেলে অফিস ফেরৎ এলা, ট্রাম গুমটির সামনে লেডিস্ ট্রামের অপেক্ষা করছিল। কলকাতা শহরের ওপর একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। মেঘহীন পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে ছিল দিনান্তের গোলাপি রঙ। বাতাসে ভিজে মাটি আর ঘাসের গন্ধ। এলাকে দেখে কি এক সম্ভাবনায় সুতপনের বুকের ভেতর একটা ভারী লোহার বল গড়াতে শুরু করেছিল। গুড়গুড় একটানা শব্দের সঙ্গে জেগে উঠছিল শুভেন্দু গুপ্ত। এলাও দেখেছিল সুতপনকে। পরিচিতের উষ্ণ হাসি ছড়িয়ে এলা জিজ্ঞেস করলো, বাড়ি ফিরছেন?

সুতপন বাড়িই ফিরছিল। কিন্তু সে কথা বলতে পারলো না। মুচকি হেসে বললো, আমাদের বাড়ি ফেরা! ব্যবসায়ীরা এতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারে না। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাতটার সময় দেখা করার কথা, এ পাড়াতেই।

হাতঘড়ি দেখে এলা বললো, সাতটার তো এখন অনেক দেরি।

প্রায় সওয়া ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে, সুতপন জানালো। একমুহূর্ত চুপ থেকে বললো, কোন চায়ের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে সময়টা কাটিয়ে দেবো।

চোখে চাপা হাসি নিয়ে এলা তাকিয়ে ছিল সুতপনের দিকে। বুকের মধ্যে বেতাল ধুকপুকুনির সঙ্গে সুতপন ধরতে পারে, সুযোগ এসে গেছে। দেরি করার উপায় নেই। জিজ্ঞেস করলো, খাবেন নাকি এক কাপ চা?

এলা জবাব দিয়েছিল, আমি চা খাইনা। তারপর একপলক ভেবে বললো, বসতে পারি কিছুক্ষণ।

ভিজে রাস্তা থেকে সূক্ষ্ম ধোঁয়া আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। চারপাশে মানুষের ভিড়, হাজার কথা, ট্রামবাসের শব্দ। ট্রাম লাইনের তারে ঝুলছে জলের পুরুষ্টু ফোঁটা। সেটা খসে পড়ার আগে সুতপন চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকলো। সুতপনের বুকের মধ্যে অস্বস্তি আর ভয় তাল পাকাচ্ছিল। গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ডাকলো, সুতপন? ভয়ে সুতপনের অন্তরাত্মা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠলো। এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বিবর্ণ মুখে পেছনে তাকালো। না, কেউ নয়। শোনার ভুল।

এলাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিছু না বুঝে তাকিয়েছিল সুতপনের মুখের দিকে। নিজেকে সামলে নিয়ে সুতপন পাশের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছিল; গ্লোব সিনেমার পেছনে একটা দামি রেস্টুরেন্টে দোতলাব নিরালা কোণে দুজন মুখোমুখি বসেছিল। কথায় কথায় বয়ে ছিল সময়। সুতপন যতো কথা বলছিল, ততো বেশি অদৃশ্য জাদুকরের মোহময় ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছিল। অলীক শুভেন্দু গুপ্ত জীবন্ত, বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছিল। সুতপন অনর্গল মিথ্যে কথা বলছিল এবং প্রতিটা মিথ্যে জ্বলন্ত বুমেরাং হয়ে ফিরে এসে তাব হৃৎপিণ্ডে বিঁধে তছনছ করছিল তাকে। সে ভুলে গিয়েছিল সে বিবাহিত, ঘরে স্ত্রী জয়ন্তী আর ছেলে গোগোল আছে। এলার সামনে, একজন অবিবাহিতা যুবতীর সামনে নিজেকে বিবাহিত বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। মনে অপরাধবোধ জেগেছিল। জাগলেও নিজেকে সামলাতে পারছিল না। বিবাহিত পুরুষের সামনে সব দরজা বন্ধ। বিশেষ করে তরুণী, কুমারীদের কাছে বিবাহিত পুরুষ অচল, অপ্রয়োজনীয়। নিজের এই পরাধীনতার কথা সুতপন ভালো জানে। সমাজ, সংসার, জয়ন্তী, গোগোল, প্রতিদিন নানাভাবে তাকে মনে করিয়ে দেয় সে অবরুদ্ধ, সে পরাধীন। পরাধীনতাকে বিনা প্রতিবাদে মেনে না নিলে সংসারে তার জায়গা নেই।

শেডে ঢাকা আলোর তলায় এলা বসেছিল। ফিকে ছায়া ছড়িয়েছিল তার মুখের ডানপাশ বরাবর। পাখার হাওয়ায় উড়ছিল তার কপালের কুচো চুল। সুতপনের বুকের মধ্যে গুড়গুড় শব্দটা কমেছে। সুতপন ভাবছিল, একজন বিবাহিত পুরুষের যদি দু'একজন বান্ধবী থাকে, সেটা কি পাপ? এলার সঙ্গে মেলামেশার জন্যে কি তাকে লম্পট বলা হবে? অস্বস্তি আর জ্বালা, বুকের মধ্যে মোচড় দিচ্ছিল। প্রচলিত নীতিবোধেব বিরুদ্ধে আক্রোশে সে ফুঁসছিল। সেই শিশুকাল থেকে সংস্কারবশে শরীরটাকে ঘৃণা করতে শিখেছে। শরীর মানে ক্লেদ, গ্লানি আব বিকার। আসল হলো, মন, আত্মা। অদৃশ্য আর প্রকট ধাঁধায় দেহটা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। সুতপন জানতো, এলাও এই আধিভৌতিক ধ্যানধারণার সৃষ্টি। তাকে বিবাহিত জানলে তার সঙ্গে মিশতো না। ভাবতো, সে দেহের কাঙাল। দেহ মানে জৈব তাড়না এবং পাপ। সুতরাং সে আপাদমস্তক পাপী এবং পাজি। এলাকে এতো সরল, সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে সে রাজি নয়। তার আজও বন্ধু দরকার, মহিলা বন্ধু। তার দেহ, মনের বিস্ময় এখনও ফুরোয়নি। এখনও সে স্বাধীনতা খোঁজে। অথচ তাকে স্বাধীনতা দিতে কেউ রাজি নয়। বিবাহিত পুরুষের আবার স্বাধীনতা কি? স্বাধীনতা তো চরিত্রহীনতা এবং লাম্পট্য। এমন অকাট্য যুক্তির ফাঁদে আটকে মানুষকে ঠুটো জগন্নাথ বানিয়ে রাখা হয়। এই সব বানানো যুক্তিতর্কের পেছনে সামাজিক ষড়যন্ত্র আছে। স্বাধীনতার নামে সুতপন স্বেচ্ছাচারের বিরোধী। কিন্তু এ দুয়ের সীমারেখা কোথায়? সে বিশ্বাস করে মানুষ, পুরুষ, নারী যাই হোক, কখনও এঁটো হয় না। পারিবারিক, সামাজিক

ঠিক করেছিল, শেষ মুহূর্তে অসুস্থতার অজুহাতে পিছিয়ে যাবে। ঈশ্বর সেবার তাকে বাঁচিয়েছিল। দেখা করার দু'দিন আগে বুকের ব্যথায় রীতিমতো অসুস্থ হেমাঙ্গকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল।

সুতপন জানতো না, হেমাঙ্গ অসুস্থ হয়েছে। অফিস থেকে সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিল। বাড়ি ফিরে জয়ন্তী আর গোগোলকে নিয়ে সিনেমা দেখার কথা আছে। তারপর কোন একটা চীনা রেষ্টুরেন্টে খেয়ে বাড়ি ফিরবে। রাতে বাড়িতে রান্নার পাট না থাকলে জয়ন্তী খুশি হয়। দারুণ প্রাণবন্ত, কালিমাহীন দেখায় তাকে। নিটোল, মধুর, একটা রাত্রি জয়ন্তী তখন অনায়াসে উপহার দিতে পারে। ট্রামে করে সুতপন ফিরছিল। ট্রামে ভিড় না থাকায় বসার জায়গা পেয়েছিল। ঘরমুখো মানুষের ভিড় রাস্তায় শুরু হয়েছে। বৌবাজার পেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিক্‌শার, জটিল জট। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাড়িগুলো এগোচ্ছিল। অধৈর্য ঘন হচ্ছিল সুতপনের মনে। তখনই নজর পড়েছিল ট্রামের পাশ দিয়ে একটা ট্যাক্সি প্রাণপণে হাসপাতালে ঢোকার চেষ্টা করছে। বাস আর ট্রামের মাঝখানে ট্যাক্সিটা আড়াআড়ি আটকে গেছে। ট্যাক্সির ভেতর নজর পড়তে সুতপন স্থির হয়ে গিয়েছিল। জানলার পাশে অসহায়ের মতোই, এলা বসে আছে। তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে একজন মানুষ। মানুষটার অন্যপাশে এক অপরিচিত মহিলা। গোটা ব্যাপারটা সুতপন চকিতে বুঝতে পেরেছিল। অসুস্থ দাদাকে নিয়ে এলা হাসপাতালে ঢোকার চেষ্টা করছে। এলার ফর্সা মুখ রক্তহীন, ফ্যাকাশে। মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো। এলা দেখে ফেললে মুস্কিল। দু'এক মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিটা রাস্তা করে নিয়ে হাসপাতালে ঢুকে গিয়েছিল। আচমকা বিপদে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সুতপন। কয়েক মিনিটের জন্যে। তারপর ফুরফুরে খুশির হাওয়ায় হাল্কা হয়ে গেল মেজাজ। যাক, হেমাঙ্গের সঙ্গে আলাপ করার ঝক্কি থেকে মুক্তি পাওয়া গেল আপাতত। উল্লাসে শিস বাজাতে বাজাতে বাড়ি ফিরেছিল। বৌ, ছেলে নিয়ে সন্ধেটা দারুণ কেটেছিল। চীনা রেষ্টুরেন্টে খেতে খেতে এক সময় নিচু গলায় জয়ন্তী জিজ্ঞেস করেছিল, কি ব্যাপার, আজ এতো ফুর্তি কেন?

ততোধিক নিচু গলায় সুতপন জবাব দিয়েছিল, সুন্দরী বৌ পাশে পেয়ে।

নকল রাগে ধমক দিয়েছিল জয়ন্তী। তারপর বলেছিল, আজকাল তোমায় কেমন অচেনা মনে হয়। সবসময়ে এতো গুম হয়ে থাকো কেন?

সুতপন সতর্ক হয়েছিল। বলেছিল, যা খাটুনি পড়েছে। তার ওপর যাতায়াতের ধকল।

জয়ন্তী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা আমি কি ফুরিয়ে গেছি?

ভেতরে ভেতরে বিচলিত বোধ করলেও সুতপন বললো, তুমি অনন্তযৌবনা, ফুরোয় না, তার কিছুই ফুরোয় না।

· জয়ন্তী আর কথা বলেনি। সুতপন স্বগতোক্তি করেছিল, আমিই বোধহয় নিঃশেষ হয়ে গেছি। সুতপন সেন ইজ্ ফিনিশ্‌ড। মায়ের কাঁধে ঠেস দিয়ে গোগোল ঘুমোচ্ছিল। রেষ্টুরেন্টের বেয়ারা ট্যাক্সি ডেকে আনতে তিনজন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল।

হেমাঙ্গের সঙ্গে দেখা করার দিন অক্লেশে কেটে গেল। সুতপনকে কোনো ঝক্কি পোহাতে হলো না। তলায় অনুযোগ সাজিয়ে পরের দিন বেলা তিনটে ফোন করেছিল এলাকে। সে মুখ খোলার আগে ক্লান্ত গলায় এলা বলেছিল, চারটের সময় জি. পি. ও. ঘড়ির তলায় আসবেন, কথা আছে।

এলার কণ্ঠস্বরে সুতপন ভয় পেয়েছিল। ফোনে এলা কথাটা বললো না কেন? সেই মারাত্মক টনাটা কি ঘটে গেছে, হেমাঙ্গ মারা গেল নাকি? নানা দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্ক নিয়ে সুতপন রটের কিছু আগে জি. পি. ও-র কাছে পৌঁছেছিল। এলা এলো চারটের দশ মিনিট পরে। লো পাড় সাদা তাঁদের শাড়ি পরা প্রসাধনহীন এলার যেন বৈধব্য বেশ। শুকনো, ক্লান্ত মুখ লে এলা বলেছিল, দাদা হাসপাতালে, অবস্থা খুব খারাপ।

আর কিছু এলা বলতে পারেনি। চাপা কান্নায় তার গলা বুজে গিয়েছিল। খবরটা যেন প্রথম নলো, এমন ভঙ্গিতে সুতপন দাঁড়িয়েছিল। দু'একটা সান্ত্বনার কথা বলা উচিত ছিল। বলতে রলো না। মনের গভীরে নিষ্ঠুর আনন্দ কাজ করছিল। এলার দাদা, যে কিনা এলার নির্ভরযোগ্য ক অভিভাবক তার সামনে যদি কখনো দাঁড়াতে না হয়, তার চেয়ে শুভ ঘটনা আর কি আছে!

আলাপের বহুদিন পরে, সেই সন্ধ্যেতে আবার সুতপনের ফোন নম্বর চেয়ে এলা বলেছিল, ড়িতে কোন পুরুষমানুষ নেই, হঠাৎ দরকার পড়লে আপনাকে ডাকবো।

এলার কথায় হিমশীতল অনুভূতি সুতপনের শিরদাঁড়া বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে ড়ছিল। সান্ত্বনার ভাষা ভুলে গিয়ে সুতপন তখন পালাতে পারলে বাঁচে। বলেছিল, হাজার কা টেলিফোন কোম্পানিতে জমা দিয়ে হা পিত্যেশ করে দু'বছর বসে আছি, ফোনের পাত্তা ই। যাচ্ছেতাই ব্যাপার!

শব্দহীন এলা দাঁড়িয়েছিল। সুতপনের আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। এলার সাদা ...ড়ির ভাঁজ থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে অচেনা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। হয়তো সেটা মৃত্যুর গন্ধ!

খড়গপুর শহরের মধ্যে দিয়ে ধীর গতিতে বাস এগিয়ে চলেছে। কর্মচঞ্চল বাজার এলাকা, দুপাশে সারি সারি দোকান, থিকথিক করছে মানুষ। পিচের রাস্তার পাশে রেলশহরের বাড়িঘর। ভেঁপু বাজিয়ে ছুটে চলেছে লাইনবন্দী সাইকেল-রিক্‌শা। সকলের ভীষণ তাড়া, পৃথিবীতে আজই হয়তো শেষ দিন। দুরপাল্লার বাসস্টপ, শহরের সামান্য বাইরে। বাস এসে থামলো নির্দিষ্ট জায়গায়। গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে পা রাখার জন্যে যাত্রীরা অধীর হয়ে ছিল। কুলকুল করে স্রোতের মতো তারা নেমে এল। বাসস্টপের চারপাশ বেশ ফাঁকা। মানুষজন, দোকানপাট কম। চা, খাবারের একটা মাত্র দোকান। নিমেষে যাত্রীরা দোকানটা ছেঁকে ধরলো। দোকানী বসে ছিল ওৎ পেতে। হাতে হাতে চা, গরম সিঙাড়া, মিষ্টি ছড়িয়ে পড়লো। ক্রেতাদের তাড়াহুড়ো দেখে বোঝা যায়, বেড়াতে বেরোলে খিধে খুব বাড়ে। পুরোনো একটা বাস, মাঝবরাবর কেটে গুমটির অফিস করা হয়েছে। অফিসের পেছনে একটা ইঁটের ঘর, সম্ভবত ল্যাট্রিন।

চা খাবেন না, এলা জিজ্ঞেস করলো।

জুতো মোজা খুলে দু'পায়ের আঙুলগুলো কয়েকবার খেলিয়ে সুতপন বললো, নামতে ইচ্ছে করছে না।

তেজি রোদ উঠেছে বাইরে। বাতাসে উত্তাপ জমছে। আগেই, ফুলহাতা কার্ডিগান শরীর থেকে সুতপন খুলে ফেলেছিল। নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলোয়ান খুলে এলা রাখলো সিটের ওপর। গরম পোশাকে সিট প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। এগুলো বাক্সে তুলে রাখি, সুতপন বললো, এখন গরম পোশাক ছুঁলে শরীরে ফোস্কা পড়ে যাবে।

এলা মিষ্টি হেসে বলে, ঠিক।

শাড়ির আঁচলটা জাপানি পাখার মতো মুখের ওপর ধরে হাওয়া খেতে লাগলো এলা আলোয়ান সরাতে এলার নতুন রূপ সুতপনের চোখে পড়লো। অনাবৃত দুটো হাত, লম্বা গ্রীবা উজ্জ্বল চোখ, এই এলাকে সুতপন আগে দেখেনি। সুতপনের মুগ্ধ দৃষ্টির খবর পেয়েই বোধহয় এলা ব্যাগ থেকে চিরুণি বার করে তার কালো, লম্বা চুল, বুকের ওপর টেনে আঁচড়াতে শুরু করলো। এলার ঝকমকে কপালে লাল কুমকুমের ছোট টিপ জ্বলজ্বল করছে। খোলা মাঠে উজ্জ্বল রোদে একদল শালিক ব্যস্ত গলায় কিচিরমিচির করে কিছু বলছে। হাওয়ায় এলার চুলের ভেষজ শ্যাম্পুর গন্ধ পেল সুতপন।

এলা বললো, কি মজা, কতো শালিক!

তারপর যোগ করলো, দু'শালিক দেখলে দিনটা ভালো কাটে, আর একশো দেখলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

তোমার মনস্কামনা কি,সুতপন জানতে চাইলো।

মুচকি হেসে এলা জবাব দিল, বলবো না।

আমি জানি, সুতপন বললো।

কি, এলা জানতে চাইলো।

হেসে সুতপন বললো, বলবো কেন?

প্লিজ, বলুন, আবদার করলো এলা।

একটা অচেনা নাম ধরে জানলার বাইরে থেকে কেউ ডাকছিল। দু'তিনবার ডাকলো। কাকে ডাকছে, কে জানে। সুতপন খেয়াল করলো না। সুতপনের সঙ্গে কথার খেলায় এলা মগ্ন থাকলেও এই ডাক তার কান এড়ায় নি। বললো, পারমিতার কর্তা ডাকছে আপনাকে। তখন জানলার পাশে এক ভাঁড় চা নিয়ে একজন ভদ্রলোক সুতপনকে বললো, শুভেন্দুবাবু, আপনার চা।

চায়ের ভাঁড়টা ধরতে গিয়ে সুতপনের হাত কেঁপে গেল।

খুব গরম নাকি, পারমিতার স্বামী জিজ্ঞেস করলো। তাবপর এলার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার জন্যে কিন্তু আনিনি।

বিব্রত সুতপন বললো, আপনি কেন কষ্ট করে চা বয়ে আনলেন?

তাতে কি হয়েছে, পারমিতার স্বামী জবাব দিল, এক ভাঁড় চা তো আর গন্ধমাদন নয়।

সুতপন কথা বাড়ালো না। সে এখন গুটিয়ে যেতে চাইছে, সম্ভব হলে এক ভাঁড় চায়ের মধ্যে ডুব দিয়ে আত্মগোপন করতে চায়। দু'এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে, 'দীঘায় আলাপ হবে' বলে পারমিতার স্বামী চলে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে খড়গ্‌পুর থেকে বাস ছেড়ে দিল। সুতপনের গায়ে গা লাগিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে এলা বসেছে। এলার নরম শরীর লেপ্টে আছে সুতপনের সঙ্গে। বাস যতো দীঘার দিকে এগোচ্ছে, এলা ততো অসংকুচিত, জড়তাহীন হচ্ছে। খোলা আকাশ আর মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্য, মানুষের অনেক সংস্কার ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

পাঁচ

মাঠ ঘাট এবং পরিচিত রাস্তা, জনপদকে সম্প্রতি সুতপন ভয় পায়। ঠিক ভয় নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু ঘটে। তার ভেতরকার শুভেন্দু গুপ্ত, জেগে ওঠে। চেনা পৃথিবী

ধেয়েমিতে সুতপন ক্লান্ত, হতাশ। পরিচিত সমাজ-সংসার, পৃথিবীকে সে ঘৃণা করে। ভূমিতে বাঁধা পশুর মতো এই জীবনযাপনে সে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয়। তবু এই জীবন, চে থাকা, এগুলো নিয়ে আমরণ বেঁচে থাকতে হবে ভেবে হতাশায় ডুবে যায়। মানুষ অসহায়, ক্ষম, অপারগ, তার কিছু করার নেই। সত্যি কি কিছু করার নেই?

প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলে সুতপনের মাথাটা গুলিয়ে যায়। সেই সুযোগে শুভেন্দু গু এসে হাজির হয়। কালো পাথরে তৈরি, ভিজে ভিজে, নির্জন এক অন্ধকার পৃথিবীতে ভেন্দুর বাস। সে পৃথিবী যেন এক পাতালগুহা। সেখানকার হাওয়ায় আদিম শ্যাওলার গন্ধ। াজকাল সুতপনও সেই পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। এলাকে নিয়ে এমনি এক নিঃশব্দ, জনমানবহীন হায় সে ঢুকে পড়তে চায়, সামাজিক সংস্কার, সাংসারিক অনুশাসন সেখানে নাক গলাতে ারবে না।

আলাপের দু'মাসের মধ্যেই এলার সঙ্গে সুতপনের ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। শুরু হলো একান্তে দেখা, বসা ময়দানে, নির্জন কেবিনে বহুবার এলার সঙ্গে বসে তাকে স্পর্শ করতে পারেনি ুতপন। কেউ যেন আড়াল থেকে তার ওপর কড়া নজর রাখছে। রাস্তায় দু'জনে যখন াশাপাশি হাঁটে, সুতপনের ভয় তখন তুঙ্গে ওঠে। বুকের মধ্যে অবিরত দুরমুশ পড়ে। কানদিকে তাকাতে পারে না। মনে হয়, চেনাজানা কেউ তার নাম ধরে ডেকে উঠবে। এমন য়েছেও কয়েকবার। অন্ধকার, জনহীন গঙ্গার ধারে, অথবা গড়িয়াহাটের ঘিঞ্জি ফুটপাতে কেউ হঁকে উঠেছে 'সুতপন' বলে। পেছন ফিরে, চারপাশে তাকিয়ে কাউকে সে দেখতে পায়নি।

সে জানে, সে কোন পাপ করছে না। তবু তীব্র পাপবোধ তাকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করতে াকে। তার অন্তর্দাহ বুঝতে পারে না এলা। গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। এলার দু'চোখের চাহনিতে নারীর সনাতন ভাষা ঝিলমিল করে। কিন্তু প্রখর আত্মমর্যদাসম্পন্ন, বুদ্ধিমতী মেয়ে সে নিভৃততম বসার জায়গা পেয়েও মুখ ফুটে নিজের চাহিদার কথা কখনো বলেনি। তবু সুতপন ধরতে পারে। মানুষের গোপন আকাঙ্খা অদৃশ্য বায়ুতরঙ্গে আলোড়ন তুলে, শব্দহীন ভাষার জন্ম দেয়। কথার চেয়ে সে ভাষার আবেদন বেশি।

সুতপনের কাঁধে আলতোভাবে মাথা রেখে এলা কাগজ পড়ছে। চলমান বাসের নিরবচ্ছিন্ন থরথর কাঁপুনি তার পা, পেট, শরীর বেয়ে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। কাঁধের ওপর এলার মাথার একটানা মৃদু ঘর্ষণ সুতপনের স্নায়ুতে কোনো অনুভূতি জাগায় না। বাস ছুটছে বেলদার দিকে। দু'পাশে শস্যহীন ফাঁকা মাঠ দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো। অনেক দূরে ফিকে সবুজ রেখার মতো গ্রামের আভাষ পাওয়া যায়। সুতপন দেখলো, এলা মন দিয়ে একটা রোমহর্ষক খবর পড়ছে। খবরের হেডলাইন হলো, শাশুড়ি আর দেওরের হাতে বধূ খুন।

খবরটা সুতপন দেখেছিল, পড়েনি। খুনের খবরের ঠিক ওপরে রয়েছে, পোল্যান্ড নিয়ে রাশিয়া, আমেরিকার পারস্পরিক হুঁশিয়ারি। এ খবরটাও সুতপন নজর করেনি। অথচ অনেকক্ষণ ধরে এই পাতাটা মুখের সামনে খুলে রেখে বসেছিল। পাতার প্রধান খবরটা, ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও বামপন্থীদের ভিন্নধর্মী মতামত সেটাও নজর এড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার! কিন্তু ঘটেছে। পুরো সংবাদটা অচেনা মনে হচ্ছে। তাহলে এই দীর্ঘ সময় কাগজে মুখ ঢেকে সে কি ভেবেছে? মহাশূন্যতা ছাড়া আর কোন ভাবনার কথা সুতপনের মনে পড়লো না। এতোটা পথ এলাকে স্পর্শ করে থেকে তাকেও খেয়াল করেনি। অবয়বহীন শূন্যতায় সে বুঁদ হয়ে ছিল।

কি ভয়ঙ্কর, এলা বিড়বিড় করলো।

কি, জানতে চাইলো সুতপন।

একজন নিরীহ মেয়েকে কি নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে, এলা জানালো।

সুতপন হাই তুললো। খুনের খবর তার মনে রেখাপাত করলো না। তার উদাসীন মুখের দিকে তাকিয়ে এলা অবাক হলো। অবাক হওয়ারই কথা। মৃত্যুসংবাদ শুনে যে মানুষ নির্বিকার ভাবে হাই তুলতে পারে, সে স্বাভাবিক নয়। মৃত্যুর খবর, যে কোন স্বাভাবিক মানুষকে বিচলিত করে। খবরের কাগজটা সুতপনের হাতে দিয়ে এলা বললো, পড়ে দেখুন।

খবরের ওপর চোখ রেখে প্রথম দু' লাইন পড়ে সুতপন নিজের ভাবনায় ডুবে গেল। কি হবে খবর পড়ে? একজন গৃহবধুর মৃত্যুতে পৃথিবীর কি আসে যায়! কারো মৃত্যুতেই দেশ, কাল, ইতিহাসের পর্দা সামান্য কাঁপে না। আজ সুতপন মরে গেলেও তাই হবে। নিজের তুচ্ছ অস্তিত্বের খবর সে কবে যেন জেনে গেছে! রাষ্ট্র, সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতির সে কেউ নয়। রাষ্ট্র চালাবেন ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেশাই, চরণ সিং, জ্যোতি বসুরা। তারাই ক্রমাগত বাষ্প হয়ে উঠবেন। সে এক দুর্ভেদ্য জগৎ। সুতপন সেনের সেখানে কোন ভূমিকা নেই। সমাজ সংসার-রাষ্ট্রের দিকে অসংখ্য আশা নিয়ে তাকিয়ে থেকে সে নিয়ত বিচ্ছিন্ন, শতধা হয়ে যাবে। একটা প্রত্যাশাও মিটবে না। রাষ্ট্র গিলে নিচ্ছে সমাজ, সংসারের যাবতীয় মূল্যবোধ, সূক্ষ্ম মানবিক সম্পর্ক। প্রতিদানে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ব্যক্তিমানুষ কিছু পাচ্ছে না। ব্যক্তিমানুষ ভবঘুরে দিগ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে, সামাজিক, সাংসারিক মানুষ থাকছে না। ব্যক্তির এই ভয়াবহ পরিণামকে রেগন, ব্রেজনেভ, ইন্দিরা গান্ধী, জ্যোতি বসুরা ঠেকাতে পারবে না। বরং তারা আরো বেশি করে চূড়ান্ত ভাঙচুরের দিকে ঠেলে দেবে। এই অবস্থায় দেশকাল, ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? প্রতিদিনের সংবাদপত্র কোন্ মোক্ষলোকের সন্ধান দেবে? এই রকম মানসিকতায় কালো পাথরে তৈরি সেই অন্ধকার পৃথিবীর কথা সুতপনের মনে পড়ে। ভিজে ভিজে, রহস্যময়, নির্জন সেই পৃথিবীতে নিজেকে উলঙ্গ করে খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। শুভেন্দু গুপ্ত হয়ে যায় সে। আগন্তুক. শুভেন্দু গুপ্ত বাস্তব হয়ে ওঠে। দেশ, কাল, রাষ্ট্রের বর্ণচোরা, নপুংসক মূর্তিকে শুভেন্দু সেজে সুতপন কলা দেখাতে পারে।

বছর খানেক আগে এক বিকেলে এলাকে নিয়ে সুতপন এক চীনা রেস্টুরেন্টে ঢুকেছিল। শুধু রেস্টুরেন্ট নয়, সঙ্গে পানশালা আছে। মাঝখানে হলঘর আর দুপাশে বেশ বড় বড় কেবিন, পর্দাঢাকা আর নির্জন। কাবো চোখে পড়ার ভয় নেই। কেবিনের ভেতরে সাদা চাদর ঢাকা বিরাট টেবিলের দু'পাশে মেহগনি কাঠের হাতলওলা চারটে চেয়ার। পাশাপাশি দুটো চেয়ারে সুতপন, এলা বসেছিল। চারপাশ ভালো করে একপলক দেখে এলা বলেছিল, দারুণ জায়গা।

কি অর্থে, জানতে চেয়েছিল সুতপন।

আড্ডা দেওয়ার পক্ষে।

আর কিছু নয়?

লজ্জা পেয়ে এলা বলেছিল, জানি না।

পাশের কেবিন থেকে মেয়েলি হাসির শব্দ ভেসে আসছিল। ঝাঁকড়া, কালো লোমওলা দুটো বিরাট কুকুর কেবিনের তলা দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি মারছিল। সুতপন আগেও এখানে এসেছে, কুকুর দুটো চেনা। রেস্টুরেন্টের দোতলায় চীনা মন্দির থেকে হঠাৎ কখনো ধাতব ঘন্টাধ্বনি ভেসে আসছিল। বাড়িটা পুরোনো, রেস্টুরেন্টটাও বহুদিনের। বাইরের আলো আসে

ম। ভেতরের ইলেকট্রিক বাতি তেমন জোরালো নয়। রেস্টুরেন্টের মধ্যে শাশ্বত সন্ধ্যা স্থির য়ে আছে। একজন ওয়েটার সতর্কভাবে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে টেবিলে দুটো মেনুকার্ড রখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

কি খাবে, এলাকে জিজ্ঞেস করেছিল সুতপন।

আপনি বলুন।

মনে সংকোচ পাক খেলেও ঝেড়ে ফেলে সুতপন বললো, আগে একটু ড্রিংক্‌স্‌ হোক।

সুতপনের মতলব এলা আগেই ধরতে পেরেছিল। বললো, আমি ওসব খাই না।

আমি কি রোজ খাই, অকেশন ছাড়া খাই না। খাওয়া, না খাওয়া নিয়ে আমার সংস্কার নেই।

ঠোঁট টিপে হেসে এলা জিজ্ঞেস করলো, আজকের অকেশনটা কি?

বাঃ, এমন দারুণ জায়গায় আড্ডা মারার প্রথম দিন, হাল্কা গলায় সুতপন জবাব দিল।

আপনি খুব চালাক, এলা বললো।

তোমার চেয়ে নয়, সুতপন মন্তব্য করলো।

বেয়ারা আবার কেবিনে ফিরে এলে সুতপন একটা বিয়ার আর একটা জিন উইথ্‌ লাইম দিতে বললো।

সে জানে, শরীর আর মনের ওপর অ্যালকোহলের প্রভাব আছে। কঠিন তরলের তাপে ক্লান্ত, বিমুখ শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মনের জড়তা কেটে যায়, দ্বিধা অদৃশ্য হয়। আকাঙ্খায় শরীর ছটফট করে। মানুষের বেপরোয়া, কামনাতুর সত্ত্বাকে মদ জাগিয়ে দেয়। প্রবৃত্তিকে দেহের ভেতর থেকে টেনে বার করে আনে। পুরুষ, নারী দুজনের ক্ষেত্রে একথা সমভাবে প্রযোজ্য। ট্রেতে হুকুমমাফিক জিনিস সাজিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকলো। কেবিনের মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়েছে। অতি প্রাচীন, স্যাঁতসেঁতে গন্ধ ছড়িয়ে ছিল বাতাসে। সুতপন বিয়ারে চুমুক দিল। এলা ঠোঁট ছোঁয়ালো জিনের গ্লাসে।

সুতপন ভাবছিল, এলাকে নিবিড়ভাবে পেতে হলে তার মধ্যে ভোগাকাঙ্খা জাগাতে হবে। এলাকে সে জাগাতে চায়। এলা না জাগলে তার জড়তা, পাপবোধ কাটবে না। এলাকে উত্তেজিত করে নিজের ভোগাকাঙ্খার অজুহাত তৈরি করতে চেয়েছিল সুতপন। সুস্থ, সামাজিক এলাকে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে আয়ত্ত্ব করার সাহস তার নেই। তাই শুভেন্দু সেজেছিল। কিন্তু চরম মুহূর্তে শুভেন্দুও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঝিমিয়ে যায়। সুতপন প্রাণপণে শুভেন্দুকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল। এলা কিছুই ধরতে পারছিল না। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে এক নতুন মজা। তাড়াতাড়ি লম্বা চুমুকে গ্লাস প্রায় শেষ করে ফেলেছিল।

পাশের কেবিনে তখন ঘনীভূত নৈঃশব্দ। নড়াচড়ার শব্দে বোঝা যাচ্ছিল, সেখানে মানুষ আছে। কেবিনের বাইরে থেকে কখনও সখনও মানুষজনের পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছিল। আধখানা দরজার তলা দিয়ে কদাচিৎ শাড়ি, ট্রাউজার্সের অংশ দেখা যায়।

এলার ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠছিল। দু'চোখের তারায় টলটলে ভাব। রেস্টুরেন্টের সব আলো জ্বলে উঠলো। সুতপনের দিকে চেয়ে এলা হাসলো। এক প্লেট চিলি চিকেন, এক প্লেট ফ্রায়েড প্রণ নিয়ে বেয়ারা হাজির হলো। পৃথিবীতে তখন রাত নামছিল। রেস্টুরেন্টের সব কেবিন এবং বাইরের হলঘরে লোক ভর্তি। কাঁটা চামচ, কাচের গ্লাসের টুংটাং শব্দ, নারী পুরুষের কথা, হাসিতে পুরোনো দোতলা বাড়িটা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল। দু'পেগ জিনের প্রভাবে এলা তখন রুদ্ধ আগ্নেয়গিরি। তার শরীরের বিহ্বলতা দেখে সুতপন বিস্ফোরণের

আভাষ পেয়েছিল। ইতিমধ্যে সুতপন আড়াই বোতল বিয়ার মেরে দিয়েছে। গ্লাসের তলানি বাদ দিয়ে আরো আধবোতল বিয়ার মজুত আছে। সুতপন বুঝতে পারছিল, তার মুখ থে তৃতীয় পেগ জিন-লাইমের অর্ডার শোনার জন্যে এলা প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আর নয়। সুত ভয় পেয়েছিল। মনে হয়েছিল, অশুভ কিছু ঘটে যেতে পারে। চাপা আন্তরিক গলায় এলা ক বলছিল। সিনেমা, নাটক, সাহিত্য, রবীন্দ্রসংগীত এবং আরো নানা বিষয় তুলছিল। তার সিথে শাড়ির নরম আঁচল সুতপনের গায়ে ঠেকছিল। এলার অসুস্থ দাদার মুখ তার হঠাৎ মনে পড়ে হেমাঙ্গকে তখনও দেখেনি। অথচ মনে হচ্ছিল হেমাঙ্গর হুবহু মুখচ্ছবি চেতনায় ভেসে বেড়া এলার সুন্দর, সুসজ্জিত শরীর থেকে বিষাদের গন্ধ উড়ে এসে তার বুকে ঢুকে যায়। ম হয়, ইউক্যালিপটাস্, অগুরু আর ধূপের এই মিশ্র গন্ধ বড় পরিচিত। সুতপন জুড়িয়ে যা এলার চেয়ারের পেছনে, তার কাঁধ বরাবর ছড়িয়ে রাখা সুতপনের ডান হাতটা আড়ষ্ট হ গেল। এলার চুল আর মাথার সাংকেতিক স্পর্শ তাকে উদ্দীপ্ত করতে পারলো না। দু'দিন ধ সে অনেক মতলব ভেঁজেছিল। রেস্টুরেন্টের নিভৃত কেবিনে এলার সঙ্গে কি কি খেলা খেল ছক করেছিল। কতো ছক, কতো মজার পরিকল্পনা! কিন্তু সেই মুহূর্তে আলগোছে দু'এক এলার কাঁধ ছুঁয়ে থেমে গিয়েছিল। মনে মনে বলেছিল, জাগো, শুভেন্দু জাগো।

শুভেন্দুকে কিছুতে জাগাতে পারছিল না। সুতপনের শরীরে কোন তাগিদ নেই। নখদন্তহীন ভোঁতা হয়ে গেছে। কি এক ভয়, নিরাসক্তি তাকে নিষ্ক্রিয়, শীতল করে দিয়েছি আড়াল থেকে কেউ নজর করছে। অদৃশ্য নজরদারের দৃষ্টিতে কঠিন শাসন। অনেক খুঁচি সুতপন তার প্রবৃত্তিকে লেলিয়ে দিতে পারলো না। শরীর আর মন পরস্পরের বৈরী হ দাঁড়ালো। মনের হুকুম শরীর মানলো না। অথচ শরীরে খিধে আছে। শরীর খেতে চায়। কি খাদ্য পেয়েও শরীর খেতে পারছে না। এক অদৃশ্য শক্তি বহুদিন ধ'রে শরীরকে শাসন করে তার ছাড়পত্র না পেলে শরীর নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। হৃদয়, মন, বুদ্ধি কিছুই সে শক্তিকে টলা পারে না।

কেবিনে কেবিনে খুশির বান ডাকছিল। এলার শরীরের ভেতরেও বাজছিল চোরা ঢেউে ছলাৎছল শব্দ। সে আওয়াজ শুনেও সুতপন অপারগ, পাথরের মতো বসে ছিল, নিস্তেজ গল দু'চারটে কথা বলে কেবিন থেকে বেরোবার জন্যে ছটফট করছিল।

সুতপনের অবস্থা বুঝতে পেরে এলা বলেছিল, ওঠা যাক।

সুতপনেব হাতঘড়িতে তখন রাত আটটা। টাকাপয়সা মিটিয়ে দু'জনে রাস্তায় এ দাঁড়িয়েছিল। এলারও বেশ নেশা হয়েছে। এখনি ওকে বাড়ি ফিরতে দেওয়া উচিত ন গঙ্গার ধারে বা ময়দানে, খোলা আকাশের নিচে এলাকে নিয়ে কিছুক্ষণ বসতে হবে। হাও না থাকলেও আর্দ্রভাব ছিল প্রকৃতিতে। চারপাশ বেশ ঠাণ্ডা। রাস্তায় বিশেষ লোকজন নে দোকানপাট সব খোলা। পূব, পশ্চিম রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। অক্ষমতায় ম মনে নিজেকে সুতপন গালাগালি করছিল, অভিশাপ দিচ্ছিল। ভাবছিল, আমি এতো অপদ এতো অচল! একগাদা টাকা খরচ করে এমন অনুকূল পরিবেশেও কিছু করতে পারলাম ন

এলার শরীরে যে তখন জোয়ার ফুঁসছে, বুঝতে সুতপনের অসুবিধে হয়নি। তার অস্ব হচ্ছিল, ভয় করছিল। এলার সঙ্গ এড়াতে পারলে সে বাঁচে। আর এক মুহূর্ত এলাকে সহ্য হচ্ছি না। তবু সহজ, স্বাভাবিক মুখে পথ হাঁটছিল। এলা বলছিল, দারুণ জায়গা, আবার একদি আসবো।

নিঃশব্দে সুতপন সায় দিয়েছিল। জানতো, এখানে আসা, না আসা দুই সমান। একটা ট্যাক্সি ধ'রে দুজনে আউটরাম ঘাটে গিয়েছিল। গঙ্গার ধারে নির্জন জায়গায় ঘাসের ওপর দু'জনে পাশাপাশি বসলো। গঙ্গার জলে মৃদুমন্দ ঢেউ। একজন মাঝি পা টিপে টিপে এসে জিজ্ঞেস করলো, নৌকো লাগবে? আট টাকা ঘন্টা।

এলাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সুতপন বললো, না।

ধূসর, কালচে আকাশে একঝাঁক নক্ষত্র জ্বলছিল। হাওয়ায় আঁশটে মেদুর গন্ধ। অন্যদিন তিন বোতল বিয়ারে সুতপন নিখুঁতভাবে ভিজে যায়। তার চৈতন্যময় পৃথিবী টলমল করে। সেদিন কিন্তু তা হলো না। অদম্য কামনার ব্যর্থতায় মাথা ধরে উঠলো। মুখে স্বাদ নেই। কয়েক জোড়া নারী পুরুষ ইতস্তত দলা পাকিয়ে বসে আছে। অস্পষ্ট সেই রঙ্গভূমির দিকে এলা আড়চোখে তাকায়, সাবানের ফেনার মতো ফুলতে থাকে। নৌকো চাপার ইচ্ছে ছিল তার। সাধ মেটেনি। সুতপন গুটিয়ে যাচ্ছিল। এলার হাত থেকে মুক্তি চাইছিল। অথচ উঠতে পারেনি। রাত বাড়ে। সুতপনের আচরণে এলা অবাক হলেও মুখে কিছু বলেনি। একসময় দু'জনে উঠে পড়লো। এলাকে এড়াবার জন্যে সুতপন বললো, তোমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে চাঁদনীচকে একটা কাজ সেরে আমি ফিরবো। পিলকহীন, স্থির চোখে সুতপনের দিকে চেয়ে এলা বলেছিল, আজ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

এলার কথা যেন অপরিবর্তনীয়, কঠিন নির্দেশ, অমান্য করার উপায় নেই। আতঙ্কে বুক কাঁপলেও সে অরাজি হতে পারলো না।

সাবলীল পায়ে এলা হাঁটছিল। তার নেশা যে কেটে গেছে, সুতপনের সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মাথার মধ্যে অস্বস্তি ডেলা পাকাচ্ছিল। এলার পাড়ায় তার অনেক বন্ধু আছে। কারো সঙ্গে দেখা হলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাছাড়া এলার বাড়ির কাছাকাছি গেলে তার বাড়িতেও যেতে হতে পারে। তখন পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াবে! আশঙ্কায় সুতপনের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

ট্যাক্সি, জোর গলায় ডেকে উত্তমুখো গাড়িটাকে দাঁড় করালো সুতপন। নিঃশব্দে পাশাপাশি বসলো দু'জন। বড় রাস্তায়, যেখনে প্রথম আলাপ হয়েছিল, সেই বাসস্টপে এসে এলা বললো, নামবো।

ট্যাক্সি থেকে নেমে চাপা গলায় জানিয়েছিল, আজই আপনাকে নিয়ে যেতাম আমাদের বাড়ি, কিন্তু যা গন্ধ!

এলার সঙ্গে সুতপনও ঠোঁট টিপে হেসেছিল।

এলা চলে যেতে সুতপনের মন হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বুক থেকে যেন গুরুভার পাথর নেমে গেছে। ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সজোরে নিঃশ্বাস টানলো কয়েকবার। চারপাশ খুশিতে টইটম্বুর, প্রজাপতির রঙিন পাখার মতো তিরতির করে আনন্দে কাঁপছে আর কাঁপছে। সুতপনের ভাঙাচোরা টুকরোগুলো জোড়া লেগে আস্ত সুতপন জেগে উঠলো। সে সুতপন সংসারী, গৃহস্থ, স্বামী, সে বাবা, সে ছেলে, নানা পরিচয়ের ফুলে তৈরি এক নিটোল মালা।

সুতপন তখনই ঠিক করেছিল, এলার সঙ্গে আর দেখা করবে না। কে এলা, কি তার পরিচয়? এলা নামের কোন মেয়ের সঙ্গে তার কখনো পরিচয় হয়নি। ও নামে কেউ পৃথিবীতে নেই। তার বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর এলা জানে না। তার পক্ষে সুতপনের হদিশ পাওয়া অসম্ভব।

চলন্ত বাসটা হঠাৎ মাতালের মতো রাস্তা ছেড়ে মাঠের দিকে ঢলে পড়লো। মুহূর্তের জন্যে

কাত হয়ে পরক্ষণে নরম, ভারী এটা কিছুকে ধাক্কা দিয়ে উঠে এলো রাস্তার ওপর। গাড়ি ঝাঁকুনি আর বাসশুদ্ধ লোকের অস্ফুট, ভয়ার্ত চিৎকারে সুতপনের চিন্তা ফুটিফাটা হয়ে যা আতঙ্কে এলা জড়িয়ে ধরেছে সুতপনকে। একটু এগোলে বেলদা শহর। রাস্তায় দু'চারজন প চলতি মানুষ হাত তুলে বাস থামাবার চেষ্টা করলো। দু'পাশের মাঠ থেকেও ঝাঁক বেঁধে ছু আসছে চাষির দল। বাসের চাকায় ঝড় উঠলো বেপরোয়া, মত্ত বাসের গতি। নিমেষের ম ঘটনাটা বোঝা গেল। একজন সাইকেল চালককে বাঁচাতে গিয়ে ড্রাইভার একটা বাছুর চা দিয়েছে। জানলা দিয়ে রক্তাপ্লুত জীবটাকে সুতপন একচমক রাস্তায় দেখতে পেয়েছিল। ঝনঃ করে ডানপাশের জানলার একটা কাচ ভেঙে পড়লো। মেয়েলি গলা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলে সুতপন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো পারমিতার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে। বাসের শরীরে দুমদ শব্দ হচ্ছে। পথচলতি রাস্তার মানুষ বাস লক্ষ্য করে এলোপাথারি ইট, পাথর ছুঁড়ছে।

কে যেন বললো, মাথা নিচু করে বসুন সবাই।

সুতপনের কোলে মুখ রেখে এলা ভয়ে কাঁপছিল। সুতপন কিন্তু মাথা নোয়ায়নি। রা দেখছিল। রাস্তায় মানুষজনের সংখ্যা বাড়লেও বাসের দুরন্ত গতির রহস্য কেউ মান করতে পারছে না। বিস্ময়ে, ভয়ে রাস্তা ছেড়ে কেউ মাঠে নেমে যাচ্ছে। বাসের পেছনে হ তুলে কিছু লোক তখনও ছুটে আসছে। প্রায় মাইল দেড়েক দৌড়েও তারা ক্লান্ত নয়। জা বেলদায় বাসকে থামতে হবে। পেছনের কাচটা তখনি ঝনঝন করে ভেঙে গেল।

ছয়

কাঁথিতে বাস যখন পৌঁছোলো, সূর্য তখন মাঝ আকাশ ছেড়ে পশ্চিমে ঢলে পড়েে কাঁথিতে বাস দাঁড়ালো না। দাঁড়াতে বললো না কেউ। বেলদায় বাস প্রায় একঘন্টা দাঁড়িয়েে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। মারমুখী জনতার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ড্রাইভার গাড়িটা সোজা থান ঢুকিয়ে দিয়েছিল। থানার সামনে কিছু সময় অবরোধ আর হল্লা করে জনতা শেষ পর্যন্ত মিটমা রাজি হলো। বাস ড্রাইভার নগদ পঁচাত্তর টাকা বাছুরের মালিকের জন্যে থানার বড়বাবুর হা জমা দিল। বাছুরের মালিক জনতার মধ্যে ছিল না। থানার ফার্স্ট এড্ বক্স থেকে তুলোয় ভে টিন্চার আয়োডিন পারমিতার সিঁথির ঠিক নিচে, কপালের ওপর তার স্বামী লাগিয়ে দিয়েছি ভাঙা কাচে কপাল কেটেছে। কাচের টুকরো ক্ষতের মধ্যে আছে কিনা সেটা দীঘায় পৌঁ ডাক্তার দেখিয়ে জানতে হবে। তাজা সিঁদুর লেপা পারমিতার সরু সিঁথিটা তুলোর ব্যান্ডেজে বেমালুম ঢাকা পড়ে গেছে। পারমিতাকে খুব বিচলিত না দেখালেও তার স্বামীর মুখ আতঙ্কে কালো হয়ে গিয়েছিল। থানার সামনে অনেকটা খোলা মাঠ। কয়েকটা দশাসই ঝাঁকড়া গাছ ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বড় নিমগাছের তলায় বাসটা দাঁড়িয়েছিল। বাস থেকে অনেকে নামলেও সুতপন সিট্ ছেড়ে ওঠেনি। তার বেশ শীত করছিল। মৃদু অথচ হাড়কাঁপানে হাওয়া বইছিল। তাছাড়া নিমগাছের তলায় শীতলতা বেশি হয়। উর্দিপরা দু'চারজন পুলিশ বাসটা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়, সন্দেহ, ঘৃণায় থমথমে, ভারি একজন পুলিশ মাঝে মাঝে ধরালো দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিল। সেই দৃষ্টির সামনে ভয়ে সে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। অপরাধী সনাক্ত করার কাজে পুলিশের নাকি সহজাত দক্ষতা থাকে। পারমিতার সঙ্গে এলাও থানার ভেতরে গেছে। কয়েকজন বুড়োবুড়ি ছাড়া বাসে কেউ নেই

সুতপনকে সহজ চোখে তারা দেখছে না। ভেতরে ভেতরে সুতপন অস্বস্তি বোধ করছিল। তখনই থানার বড়বাবু আক্রান্ত বাসটা সরেজমিনে দেখার জন্যে সদলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। ভাঙা কাচগুলো নজর করে বড়বাবু ড্রাইভারকে বললো, ফেরার পথে বাসের প্যাসেঞ্জারদের নাম, ঠিকানা দিয়ে যাবে। কোর্টকাছারি হলে দরকার পড়বে।

ড্রাইভার নিজের আসনে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। কন্ডাকটরকে বড়বাবু বললো, মেয়েদের বাদ দিয়ে শুধু পুরুষযাত্রীদের নাম, ঠিকানা দিলেই হবে।

পারমিতাকে নিয়ে তার স্বামী আর এলা বাসে উঠছিল। বড়বাবু বললো দীঘায় গিয়ে একজন ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন। কিসে যে কি হয়, কে বলতে পারে।

কথাটা বলে, সুতপনের দিকে চেয়ে বড়বাবু মুচকি হাসলো। গূঢ়, রহস্যময় হাসি। সুতপন মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং দেখলো পাশে এলা বসে আছে। এলার সিঁদুরহীন সাদা সিঁথি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সুতপন ভাবলো, কাচের টুকরোটা পারমিতার বদলে যদি এলার সিঁথির তলায় লাগতো!

কাঁথি বাজারের লাল ধুলো ঢাকা সরু রাস্তা দিয়ে বাস ঢিমেতালে এগোচ্ছে। দু'ঘন্টা আগে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়ে সুতপনের কোন চিত্তচাঞ্চল্য হয়নি। এতোক্ষণে ভয়ের ঘন মেঘ ধীরে ধীরে সুতপনের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল। থানার নিমগাছতলায় বসে থাকার সময়, অলৌকিক ঠাণ্ডা হাওয়া তার হাড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব ভয়ংকরভাবে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। সুতপন ভাবছিল, দীঘায় নেমে বাসের কন্ডাক্টরকে কি নাম, ঠিকানা দেবে? ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারে। এলাকে নিয়ে চুপচাপ চলে যেতে পারে। এলা কিছু ভাববে না। পারমিতা বা তার স্বামীর চোখে সে কি যথেষ্ট সন্দেহভাজন হয়ে উঠবে? হ'লে ক্ষতি নেই।

কাঁথির গঞ্জ এলাকা ছেড়ে বাস হাইওয়েতে উঠলেও গতি বিশেষ বাড়লো না। দুর্ঘটনা থেকে একটু আগে রেহাই পেয়ে ড্রাইভার সতর্ক হয়ে গেছে। এই গতিতে গাড়ি চললে দীঘা পৌঁছোতে দুটো বেজে যাবে। সেই কোন্ সকালে বাস ছেড়েছিল। সুতপনের মনে হয়, অনন্ত এই বাসযাত্রার শুরু নেই, শেষ নেই। বাস দুর্ঘটনায় যদি আজ তার মৃত্যু হতো? কথাটা মনে হতে সুতপনের অন্তরাত্মা কুঁকড়ে যায়। সুতপন সেন নামে কেউ তাকে সনাক্ত করতে পারতো না। দুর্ঘটনার পর, যদি এলা জীবিত থাকতো, বলতো, মৃত মানুষটির নাম শুভেন্দু গুপ্ত, পেশায় ব্যবসায়ী। তারপর হয়তো শুভেন্দু গুপ্তের ঠিকানায় খবর দিতে গিয়ে পুলিস বেকুব বনতো। হাজার জেরায় জেরবার হয়ে ধাঁধা লাগা মানুষের মতো এলা ভাবতো, পৃথিবীতে শুভেন্দু গুপ্ত নামে কেউ কি কখনো ছিল? উল্টোটাও হতে পারতো। মৃত এলার পাশে জীবিত সুতপন দাঁড়িয়ে আছে। তখন কি ভূমিকা হতো তার? দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হলে সে কি জবাবদিহি করতো? মৃত এলাকে ফেলে সে কি পালিয়ে যেতো? পালাবার উপায় ছিলো না। দুজনের এক সঙ্গে টিকিট, সে নিজে কেটেছিল। তাছাড়া বাসের জীবিত যাত্রীরা অনেকেই সে যে এলার স্বামী, এই মর্মে সাক্ষী দিতো। মানুষের সব ভাবনার পেছনে কিছু সত্য আছে। সুতপনের পরিচয় নিয়ে তখন টানাটানি হতো। সুতপন মারা গেলে জয়ন্তী, গোগোল হয়তো কখনো জানতে পারতো না যে তাদের একজন বিধবা, অন্যজন পিতৃহীন হয়েছে। আমৃত্যু শাখা সিঁদুর নিয়ে জয়ন্তী সধবা সেজে থাকতো, গোগোল খুঁজতো নিরুদ্দিষ্ট বাবাকে। এরকম ঘটনা ইতিপূর্বে কম হয়নি। দুর্ঘটনা মানুষকে বেশিক্ষণ কাবু করে রাখতে পারে না। যে দুঃখ বিপদের চেয়ে মানুষের

প্রাণশক্তি, অনেক শক্তিমান। আজীবন মানুষ মৃত্যুর হাত ধরে পথ হাঁটলেও অবলীলায় মৃত্যুকে ভুলে থাকে। বাসের যাত্রীরা সহজ, স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। উঁচু গলায় কথা বলছে। হাসির ফোয়ারা ছুটেছে। সদ্য একটা কঠিন পরীক্ষা পাশ করে প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। বাসযাত্রার ধকল চোখ মুখে স্পষ্ট হলেও মেজাজের দিক থেকে সকলে উৎফুল্ল। এলার মুখে সকালের তাজা ভাব আর নেই। তবু খুশিতে সে ফুটছে, সুতপন বুঝতে পারে।

টুরিস্টহাউসে একটু বিশ্রাম করে সমুদ্র দেখতে যাবো, এলা বললো।

সমুদ্রে স্নান করবে না, সুতপন জিজ্ঞেস করলো।

আপনি করবেন, আমি দেখবো।

আমারও সখ আছে তোমার স্নান দেখার।

অতো সখ ভালো নয়, সুতপনের কাঁধের ওপর চিবুক নিয়ে এলা বললো।

সুতপন মনে মনে জানে সূর্যাস্তের আগে তাদের সমুদ্রের ধারে যাওয়া হবে না। সমুদ্রের তীর মানেই ভিড়, হাজার হাজার মানুষ, মানুষের বাজার। দু'চারজন চেনাজানা মানুষ সেখানে থাকবেই।

আজ তো পূর্ণিমা, এলা জিজ্ঞেস করলো। পূর্ণিমার খবর সুতপন রাখে না। বললো, তাই নাকি?

পেছন থেকে কেউ বললো, সমুদ্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অন্য একজন যোগ করলো, নোনা হাওয়ার স্পর্শ পাচ্ছি।

ড্রাইভারের পাশ থেকে কন্ডাক্টর জানালো, এখন সমুদ্র শান্ত, তীরে না দাঁড়ালে ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাবে না। তাছাড়া দীঘা এখনও মাইল পাঁচেক দূর। শীতের সমুদ্রের শব্দহীনতা বা দূরত্বের খবরে যাত্রীদের কিছু যায় আসে না। তারা যথারীতি সমুদ্রগর্জন শোনে, নোনা হাওয়ার উপস্থিতি টের পায়। ফিকে রোদে ঢাকা সবুজ গাছপালার দিকে এলা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। নিজের চিন্তায় সুতপন ডুবে যায়। দীঘায় নেমে কন্ডাক্টর নাম ঠিকানা চাইলে সে কি বলবে? ভুল নাম, ভুল ঠিকানা দেবে। আদালত খুঁজে বার করুক শুভেন্দু গুপ্তকে। ওটা আদালতের দায়িত্ব। এলার অগোচরে সুতপন তার সত্য পরিচয়ও জানাতে পারে। কিন্তু এলা যদি তার সঙ্গ না ছাড়ে! সে যদি কন্ডাক্টরকে একা না পায়! অবশ্য আজ রাতেই এলার কাছে সুতপন তার স্বরূপ উন্মোচন করবে। আসল নাম, ধাম জানিয়ে দেবে। রাত হতে এখনও কয়েক ঘন্টা দেরি। রাতের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। রাতের অন্ধকারে চারপাশ অদৃশ্য হয়ে গেলে মানুষ সাহসী হয়। দরজা বন্ধ ঘরে সুতপনও সাহস পাবে। প্রখর রৌদ্রালোকিত রাস্তায় অসংখ্য মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ করার মতো সাহস তার নেই। কোন মতে টুরিস্টহাউসের চার নম্বর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে পারলে বাঘের বিক্রম দেখাবে। সুতপনের এবার হাসি পেল। বাঘের বিক্রম সে কোনদিন দেখাতে পারবে না। অতো তেজ, অতো শক্তি তার নেই। বহুকাল যাবৎ সে নিরীহ মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করছে। বৈচিত্রহীন এই জীবনই তাকে যাপন করতে হবে। এটাই তার ভবিতব্য। দুঃসাহসী, সে হতে পারবে না কোনদিন। অথচ বাঁধাধরা জীবনের বিরুদ্ধে বিরক্তিতে তিলে তিলে ক্ষয়ে যাবে। সামনে নিজের মৃতদেহ নিয়ে বসে থাকলেও কাঁদতে পারবে না, দেহ সৎকার করতে পারবে না। বিবর্ণ এই মানসিকতা থেকে একদিন শুভেন্দু গুপ্তের জন্ম হয়েছিল। লোভী, তেজি, ক্ষুৎকাতর শুভেন্দু আপোষে রাজি নয়। অপরাজেয় থাকতে চায় সে। শুভেন্দু বলে, বড় কিছু করো। বৃহৎ ভালো, অথবা বৃহৎ মন্দ হও। মোটামুটি কিছু করা, কিছু

না করার সামিল। এই ধরনের মানুষকে বড় তুচ্ছ, দেখায়। আদর্শ মহাপুরুষ হতে না পারলে আদর্শ অধঃপতিতদের শিরোমণি হওয়া ভালো।

শুভেন্দুর এইসব বিপজ্জনক পরামর্শে সুতপনের পায়ের তলার মাটি প্রায়ই কেঁপে ওঠে। কিন্তু অতীব গৃহস্থ সুতপনকে শুভেন্দু বাগ মানাতে পারে না। ফলে রাগে শুভেন্দু ফুঁসতে থাকে। সুতপন বলে, আমাকে আর একটু ভাবার সময় দাও।

শুভেন্দু জবাব দেয়, ঠিক আছে। ভাবো। ভাবার কিন্তু শেষ আছে।

তারপর নানাভাবে সুতপনকে প্ররোচিত করে। সেই রাতে এলাকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে সুতপন প্রতিজ্ঞা করেছিল, এলার সঙ্গে আর দেখা করবে না। কিন্তু দু'দিন না যেতে শুভেন্দু খোঁচাতে শুরু করলো, আর একবার চেষ্টা করো। এমন তাজা, নিষ্কলুষ যুবতীকে এভাবে ছেড়ে দিও না। আফশোষ করতে হবে একদিন।

সুতপন জবাব দিয়েছিল, আমার স্ত্রী আছে, ছেলে আছে।

তুমি তো তাদের ত্যাগ করছো না।

কিন্তু অন্যায় করছি।

কিসের অন্যায়?

সুতপন বোঝাতে চাইলো শুভেন্দুকে। বললো, আমার মতো জয়ন্তী যদি কোন পুরুষের সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে মেলামেশা করে, কি করে তাকে ঠেকাবো আমি?

ঠেকাবে কেন, শুভেন্দু পাল্টা প্রশ্ন করেছিল।

বিহ্বল সুতপনের কথা আটকে গিয়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু হোহো করে হেসে উঠে বলেছিল, স্বাধীনতা বীরভোগ্যা! পুরুষের বীরত্ব আছে। মেয়েদের নেই। তোমার স্ত্রী জয়ন্তী একজন মেয়ে। পাঁচটা মেয়ের মতো অবাধ স্বাধীনতায় সে ভয় পায়। তার ধারণা, স্বাধীনতা মেয়েদের খেয়ে ফেলে। যে মেয়ের সাহস আছে, সে চুটিয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে। কাকপক্ষী টের পায় না। তোমার বৌ, জয়ন্তী সে জাতের মেয়ে নয়।

সুতপন আর কথা বলেনি। ঘন অন্ধকারে গা ঢেকে ফিসফিস করে শুভেন্দু বলেছিল, এলাকে নিয়ে একদিনের জন্যে কোথাও ঘুরে এসো।

আমি পারবো না, সুতপন বলেছিল।

আমি পারবো, শুভেন্দু জানিয়েছিল।

তুমি কে, প্রশ্ন করেছিল সুতপন।

প্রশ্নটা তুমি নিজেকে করো সুতপন, রহস্যময় গলায় জবাব দিয়েছিল শুভেন্দু। বলেছিল, তুমি আমাকে অস্বীকার করতে পারবে না।

অবশ্যই পারবো, কঠিন স্বরে জানিয়েছিল সুতপন, এলাকে আমি সব কথা খুলে বলবো।

তখন তুমি সুতপন সেন থাকবে না, হেঁয়ালির সুরে শুভেন্দু বলেছিল।

বাজে কথা, চেঁচিয়ে উঠেছিল সুতপন।

ঘুমন্ত সুতপনের পিঠে হাত রেখে জয়ন্তী বলেছিল, কি হলো তোমার? ঘুমের মধ্যে গোঙাচ্ছো কেন?

নিজের মনে জয়ন্তী বলেছিল, আজেবাজে জিনিস খেয়ে পেট গরম হয়েছে।

বেড়সুইচ জ্বেলে জয়ন্তী এক গ্লাস জল এনে দিয়েছিল সুতপনকে। জল খেয়ে কপালের ঘাম মুছে সুতপন আবার শুয়েছিল। অন্ধকার ঘরে সারারাত আর ঘুমোতে পারেনি।

দিন তিনেক পরে এলার সঙ্গে সুতপনের আবার দেখা হয়েছিল। এলার অফিসে ফোন করেছিল সুতপন। ফোনে এলা বলেছিল, চলে আসুন আমার অফিসে।

আগেও বার দুই তিন এলার অফিসে গিয়ে সুতপন দেখা করেছে। তবু অফিসটা এড়াতে চায়। অফিসে ঢুকলে ভয়ে বুক কাঁপে। আতঙ্কে শরীর শক্ত হয়ে যায়। চেনা কেউ দেখে ফেলবে নাতো! একটা বড় হলঘরে আর পাঁচজন সহকর্মীর সঙ্গে নিজের টেবিলে বসে এলা কাজ করে। প্রথম দিনেই সুতপন দেখেছে তাদের কেউ পরিচিত নয়। কিন্তু লতা পাতায় পরিচয় বেরিয়ে যেতে কতোক্ষণ! এলার সহকর্মীদের মধ্যে জন; তিন পুরুষ। দু'জন অল্পবয়সি. ত্রিশ পেরোয়নি। সুতপনকে তারা বিব্রত করে না। কিন্তু চল্লিশোর্ধ পঞ্চাননবাবু ভীষণ গায়ে পড়া। সুতপনের হাঁড়ি আর নাড়ির খবর জানার জন্যে পঞ্চাননের বিপুল আগ্রহ। এরা ছাড়া দু'জন মহিলা আছে। একজন বিবাহিতা, অন্যজন কুমারী। বিবাহিতার চেয়ে কুমারী মেয়েটির বয়স বেশি। সুতপনকে দেখলে তাদের চোখে দুষ্টু রহস্য ঘনিয়ে ওঠে। সুতপন মাথা তুলে তাকাতে পারে না।

এলার জবাবে সুতপন বলেছিল, ধর্মতলায় কোথাও দাঁড়ালেই তো হয়।

রাস্তায় দাঁড়াতে ভালো লাগে না, এলা জানিয়েছিল, তাছাড়া আমার অফিসের সামনে দিয়েই তো আপনি যাবেন।

নিজের মিথ্যের ফাঁদে জড়িয়ে গিয়েছিল সুতপন। কি কুক্ষণে সে বলেছিল তার অফিস ভবানীপুরে! সেই মিথ্যেটাকে এলা সত্যি বলে ধরে আছে।

সুতপন চুপ হয়ে যেতে এলা বললো, আপনি এলে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারি। তা না হলে হাজার কৈফিয়ৎ দিতে হয় পঞ্চাননদাকে। আপনার মতো আমার স্বাধীন ব্যবসা নয়।

'স্বাধীন' শব্দটা সুতপনের মস্তিষ্কে বিঁধে গিয়েছিল। দপদপ করছিল মাথা। কিন্তু বলার কিছু পায়নি এলাকে। এলার অফিস থেকে তাকে নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল। খুশিখুশি দেখাচ্ছিল এলাকে। তিনদিন আগের উচ্ছ্বাস তার মুখ চোখ থেকে তখনো মুছে যায়নি।

কোথায় যাবেন, জানতে চাইলো এলা।

বললো, আজ কিন্তু আমি খাওয়াবো।

আবছা হেসে সুতপন জিজ্ঞেস করলো, কি খাওয়াবে?

যা খাবেন, চটপট জবাব দিয়ে এলা যোগ করলো, পানীয় নয়।

কিন্তু আমি যে ভীষণ তৃষ্ণার্ত, সুতপন বললো।

এলা জবাব দিল, আপনার তৃষ্ণা অমৃত ছাড়া মিটবে না।

কথাটা শেষ করে এলা খিলখিল করে হেসেছিল।

সুতপন অবাক হয়ে ভাবলো, সত্যি কথাটা এলা এতো অবলীলায় বললো কি করে!

পার্ক স্ট্রিটে একটা রেস্টুরেন্টের নির্জন কোণে দু'জনে বসলো। দুটো আইসক্রিমের অর্ডার দিল এলা। তারপর গল্প শুরু করলো। আজ তাদের অফিসের সামনে ব্যাঙ্কে দারুণ হৈচৈ। সকালে ব্যাঙ্ক খোলার পাঁচ, সাত মিনিট পরে সেখানে পুলিশ এসেছিল। ব্যাঙ্কের এক কর্মচারী বয়স প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, নাম হেমন্ত দত্ত, গতকাল বৌকে খুন করেছে। অথচ কাল হেমন্ত অফিসে বসে সারাদিন কাজ করেছে। মাঝখানে একবার বাথরুমে যাওয়া ছাড়া অফিস থেকে বেরোয়নি। পুলিশের সন্দেহ বাথরুমের সামনের দরজা বন্ধ করে পেছনের দরজা খুলে হেমন্ত ফ্ল্যাটে গিয়ে এই কাণ্ড করেছে। পুলিশের হাতে নাকি প্রমাণ আছে!

হাঁ করে গল্প শুনছিল সুতপন। কাহিনী শেষ করে এলা বললো, কি সাংঘাতিক কাণ্ড!

সাংঘাতিক সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা সম্ভব কি করে? সুতপন প্রশ্ন করতে এলা জবাব দিয়েছিল, আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না। ওই ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্ট আছে। শুধু আমার নয়, আমাদের অফিসের অনেকের আছে। হেমন্তবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি। শান্ত, ভদ্র, ভালোমানুষ।

এসব পুলিশের বদমাইসি, সুতপন বলেছিল।

আমারও তাই ধারণা, সায় দিয়েছিল এলা।

তারপর ম্লানমুখে, ফিসফিস করে বলেছিল, কিন্তু অবাক কাণ্ড কি জানেন? কোন প্রসঙ্গে হেমন্তবাবুর নাম উঠলে আমাদের পঞ্চাননদা বলতেন, এসব লোক বিপজ্জনক হয়, স্ত্রীহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। ডিপার্টমেন্টে এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে পঞ্চাননদার বেশ কয়েকবার তর্ক হয়েছে।

এলার কথায় সুতপনের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছিল। সে ভাবছিল, পঞ্চানন সহজ লোক নয়। তার সম্পর্কে পঞ্চানন কি বলেছে, জানা দরকার। ইচ্ছে থাকলেও প্রশ্নটা এলাকে জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি। গ্লাসভর্তি আইসক্রিম গলে দুধ হয়ে যাচ্ছিল। আইসক্রিমে মেশানো কুচো ফল ভেসে উঠলো গ্লাসের ওপর। হেমন্ত দত্তের গল্প শেষ করে এলা তখন তার এক পিসেমশাই-এর কাহিনী শুরু করেছে। বাইরে থেকে দেখে যে পিসেমশাইকে ডাকাবুকো, দুঃসাহসী মনে হতো, হঠাৎ একদিন জানা গেল, সে ভিতুর ডিম। আরশোলা দেখে ভির্মি খায়। খবরটা জানাজানি হবার পরে সে কি ঠাট্টা আর হাসাহাসি!

এলার সব কথা সুতপনের কানে যাচ্ছিল না। সে ভাবছিল, মানুষের পরিচয়ের রহস্য! মানুষের সত্য পরিচয়, আসল মূর্তি, কেউ দেখতে পায় না। মানুষ নিজেও কি তার সবটুকু জানে! কেন এতো রহস্য, অস্পষ্টতা? এই সংকট থেকে মানুষ কবে মুক্তি পাবে? সুতপন নিজেও কম বিচিত্র চরিত্রের মানুষ দেখেনি। প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, এমন কিছু ব্যক্তিকে সে চেনে। অথচ নামে, চেহারায় তারা আমৃত্যু একই থেকে যায়।

সুতপনের মনে হয়, সব মানুষই বহুরূপী, দুর্জ্ঞেয়।

সরকারি রিসেপশনের হলুদ রঙের একতলা বাড়িটার সামনে বাস এসে থামলো। বাসভর্তি লোক হৈহৈ করে উঠলো খুশিতে। বাঁ দিকে তাকিয়ে সুতপন দেখলো দিগন্ত-বিস্তৃত নীল সমুদ্র, ফেনিল ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালিয়াড়িতে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা জানলা দিয়ে তার মুখের ওপর আছড়ে পড়লো।

সাত

টুরিস্ট হোমের চার নম্বর ঘরে এলাকে নিয়ে ঢুকে সুতপন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অনেকক্ষণ ধরে টানটান করে বাঁধা শরীরের স্নায়ুগুলো এতোক্ষণে বিশ্রাম পেল। এই ঘরে কোন বিপদ নেই, ভয় নেই। বাস থেকে নামার সময় সুতপনের আশঙ্কা ছিল, কন্ডাক্টর নাম, ঠিকানা চাইবে। কিন্তু যাত্রীদের নাম, ঠিকানা নেওয়াতে কন্ডাক্টর আগ্রহ দেখালো না। পারমিতার স্বামী এবং আর একজন যাত্রী নিজেরা উদ্যোগী হয়ে তাদের কলকাতার ঠিকানা কাগজে লিখে কন্ডাক্টরের হাতে গুঁজে দিয়েছিল। ব্রিফকেস নিয়ে সুতপন তখন হাঁটতে শুরু করেছে। পারমিতার সঙ্গে

বাংলোর চৌকিদার নৃসিংহ হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতো। নৃসিংহ'ই রান্নাবান্না করতো, পাকা রাঁধুনি ছিল সে।

জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে তরল সুরে সুতপন বলতো, সমুদ্রস্নান নিয়ে খাওয়া সেরে ঘরে গিয়ে আলোচনা করবো।

কথা শেষ করে দুষ্টু চোখে তাকিয়ে থাকতো জয়ন্তীর দিকে। সদ্যবিবাহিতা জয়ন্তী মুখ তুলে সুতপনকে দেখতে চাইতো না। কিন্তু নিজের দু'চোখকে বাইশ বছরের তরুণী কতক্ষণই বা বাগ মানাতে পারে! কয়েক মুহূর্ত না যেতে জয়ন্তীর চোখের দুটো ঘন কালো তারা আটকে যেতো সুতপনের চোখের ওপর। দুজনেই হেসে উঠতো। নকল রাগে জয়ন্তী বলতো, এখন আমি ঘরে যাবো না।

সুতপন জবাব দিত, তাহলে সমুদ্রস্নান নিয়ে আলোচনা হবে কি করে?

দুষ্টু, ফিসফিস করতো জয়ন্তী। তার দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠতো। নাকের পাটায়, দু'গালে লালচে আভা ঝিলিক দিতো। সুতপনের মনে হতো শিথিল, সুন্দর, রহস্যময় হয়ে উঠছে জয়ন্তী। ডাইনিং হলের চেয়ার থেকে জয়ন্তীকে হয়তো কোলে করে শোয়ার ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

বিয়ারের বোতল নিঃশেষ করে গ্লাসে ঢেলে নিল সুতপন। শরীরের ক্লান্তি কমে যাচ্ছে। আরাম থৈথৈ করছে মাথায়। অ্যান্টিরুমের দরজা খুলে এলা বেরিয়ে এলো। সালোয়ার কামিজ পরা এলাকে অসাধারণ রূপসী দেখাচ্ছে। ভিজে কালো একরাশ এলো চুল পিঠ, কোমর ছাপিয়ে নিতম্ব স্পর্শ করেছে। সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার বদলে কপালে পরেছে সিঁদুরের টিপ। রক্তবিন্দুর মতো সিঁদুর, ফর্সা কপালে জ্বলজ্বল করছে।

শুরু করে দিয়েছেন, সুতপনের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে এলা জিজ্ঞেস করলো। তার ঠোঁটে প্রসন্ন হাসি। হাসিতে প্রশ্রয় আছে। রূপবতী দেখাচ্ছিল এলাকে। খরচোখে সুতপন কয়েক মুহূর্ত এলার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তীব্র রোমাঞ্চে চিকুর দিয়ে উঠলো সুতপনের শরীর। আড়াল থেকে গরম নিঃশ্বাস ফেলছে কেউ। সুতপন বুঝলো, শুভেন্দু এসে গেছে। যুদ্ধং দেহি তার মূর্তি। লোলুপ চোখে এলার আপাদমস্তক চেটে খাচ্ছে। সুতপন জিজ্ঞেস করলো, জিন খাবে নাকি?

এখন নয়, এলা বললো।

গ্লাসে বিয়ার বুদ্বুদ কাটছে। সুতপন বললো, আমি স্নান সেরে আসি। গ্লাস হাতে সে উঠে দাঁড়ালো।

অ্যান্টিরুমের দিকে আঙুল তুলে এলা জানালো, আপনার ব্রিফকেস ওখানে আছে।

কলঘরে ঢুকে সুতপন দরজা বন্ধ করতে বিশ্বচরাচর নিঝুম হয়ে গেল।

স্নান করার জন্যে তৈরি হলো সুতপন। এলার শরীরের গন্ধে কলঘরের বাতাস ভারী হয়ে আছে। আদিগন্ত ফাঁকা মাঠে শেষ বেলার ধূসর আলো ছড়িয়ে আছে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে স্নানঘরের খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সুতপন। তার শরীরের মধ্যে কিছু বিস্ফোরক ক্রমাগত ফেটে পড়ছিল। চার দেওয়ালের নিরাপদ চৌহদ্দিতে সুন্দরী এক নারীর মুখোমুখি হয়ে তুলকালাম যুদ্ধ চলছিল তার অস্তিত্বে। অস্তিত্বের সঙ্গে অনস্তিত্বের যুদ্ধ। সদ্য দেখা এলার স্নানসিক্ত শরীর তার দুচোখ ঝলসে দিয়েছে। কিন্তু সুখের শেষ কথা দেখা নয় ভোগ করা। এলাকে পাওয়ার আগে, সুতপন নিজেকে উন্মোচিত করতে চায়। আজ তার আত্মপ্রকাশের

দিন, পরিচয় দেওয়ার দিন।

এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে সুতপন শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালো। ঠাণ্ডা জলের ধারা ছুঁচের মতো শরীরে বিঁধে শীতশীত করছে। কাঁপুনি জাগছে হাড়ের মধ্যে। জয়ন্তীর সঙ্গে দীঘা ভ্রমণের এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

মধুচন্দ্রিমার মৌতাতে সুতপন তখন বুঁদ হয়ে আছে। কলকাতায় ফেরার আগের দিন মনের আশ মিটিয়ে সমুদ্রস্নান করছিল। কোমরডুব জলে দাঁড়িয়ে ছিল জয়ন্তী। সমুদ্রর সঙ্গে কয়েক দিনে সখ্য বাড়ায় জয়ন্তীর ভয় কমেছে। সমুদ্রস্নানের শেষ দিন। দুপুর অনেকটা গড়িয়ে গেলেও আকাশে ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ ছিল। সময় বোঝা যাচ্ছিল না। জোলো ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল ধীর গতিতে। এই রকম মেঘলা, স্যাঁতসেঁতে দিনে বেশি মানুষ সমুদ্রে স্নান করতে আসে না। সেদিনও আসেনি। যারা এসেছিল, তাদের অনেকে মিনিট কুড়ি পঁচিশ থেকে চলে গেছে। ছায়াচ্ছন্ন সমুদ্রতীরে সুতপন, জয়ন্তী ছাড়া আরো গুটিকয়েক স্নানার্থী ছিল। তাদের অধিকাংশ অল্পবয়সি তরুণ, আর যুবক। সুতপন, জয়ন্তীর মতো নবদম্পতির টানে হয়তো তারা সমুদ্র কামড়ে পড়েছিল। গোটা দুই জেলে ডিঙ্গি জলের কোল ঘেঁষে তীরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বছর বাইশ, তেইশের একজন ছেলে, নাম কার্তিক, পেশায় মাছ মারা, তার সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করার সুবাদে প্রথম দিনে আলাপ হয়েছিল সুতপনের। পাড়ে লাগানো একটা ডিঙ্গি দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, সাগরের ভেতর থেকে ঘুরে আসবেন নাকি? উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছিল সুতপন। নিশ্চয় যাবো, সুতপন বলেছিল।

জয়ন্তীর আপত্তি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে তাকে নিয়ে সুতপন চেপে বসেছিল ডিঙ্গিনৌকোয়। স্নানার্থীরা অবাক হয়ে দু'জনকে দেখছিল। উদ্বেল তীরভূমি। পাগল ঢেউ কাটিয়ে কার্তিক প্রায় যুদ্ধ করে স্থির জলে নৌকো এনে হাজির করেছিল। সেখানে জল ঠিক স্থির নয়। জলের নিচে অস্থিরতা ছিল। ছোট ছোট ঢেউ, গভীর জলের টানে ক্রমাগত ওঠানামা করছিল। ঘন সবুজ, গম্ভীর জলের শরীর। গভীরতা বাড়লে যে কোন জিনিষের চরিত্র বদলে যায়। নৌকোয় বসে ভেজা শাড়ি শরীরে, জয়ন্তী হিহি করে কাঁপছিল। তবু খুশিতে চিকচিক করছিল তার চোখ। সমুদ্রের তীর, বালিয়াড়ি, ঝাউবন, রাস্তার ঘরবাড়ি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। পাড় থেকে লাউড্ স্পিকারে ভেসে আসা গানের আবছা আওয়াজ মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিল সুতপন।

ডিঙ্গিনৌকোর তলার কাঠের জালি দিয়ে জল ঢুকছিল। এখানকার প্রায় সব নৌকোর গড়ন এরকম। ঢেউয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এটা করতে হয়। খোলের ভেতরে জল কিন্তু জমে থাকে না। ঢোকে আর বেরিয়ে যায়। সুতপনের হাতে নারকোলের একটা মালা দিয়ে কার্তিক বলেছিল, মাঝে মাঝে জল ছিঁচে দেবেন।

কাঠের দাঁড় হাতে কার্তিক ডিঙ্গি বাইছিল। খালি গা, খাটো ধুতি, কার্তিকের গায়ের রঙ কষ্টিপাথরের মতো কালো। দশাসই চেহারা। শান্ত সমুদ্রে অবলীলায় দাঁড় টানছিল সে। আদিগন্ত ঘন সবুজে ডুবে আছে। আকাশ আর সমুদ্র যেন ঝিনুকের দুটো দিক। সুতপন স্তব্ধ হয়ে দেখছিল। ডিঙ্গির মাঝখানে বসে জয়ন্তী তাকিয়েছিল কার্তিকের দিকে। দাঁড়ের প্রত্যেক টানে কার্তিকের অনাবৃত কালো দেহের পেশিতে ঢেউ উঠছিল। জয়ন্তীকে মাছ ধরার গল্প শোনাচ্ছিল কার্তিক। সমুদ্রের গভীর থেকে উঠে আসা গুমগুম শব্দের সঙ্গে কার্তিকের গলার আওয়াজ মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। জোলো হাওয়ায় নোনা, আঁশটে গন্ধ। তীর থেকে কতদূরে ডিঙ্গিটা এসেছে, বোঝার জন্যে সুতপন রাস্তার দিকে তাকালো। কোথায় রাস্তা, কোথায় দীঘার

জনপদ? তীর জুড়ে কেউ আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। সুতপন প্রথমটা বুঝতে পারে নি। সে তাকালো কার্তিকের দিকে। গল্প থামিয়ে তীরের দিকে নজর করল কার্তিক। আকাশ দেখলো। নিমেষে কালো হয়ে গেল তারমুখ। আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকলো সে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর স্বাভাবিক গলায় বললো, ঝড় উঠবে এখনি, চলেন ফেরা যাক।

দীঘা কতো দূরে, সুতপন জিজ্ঞেস করেছিল।

মাইল দুই, আড়াই, জবাব দিয়েছিল কার্তিক। নিজের মনে বলেছিল, ঝড় ওঠার সময় এখন নয়। তবু জলের রঙ ঠাহর করা উচিত ছিল।

জয়ন্তী, সুতপন দুজনে সমুদ্রের দিকে তাকালো। ঘন সবুজ রঙ কখন যেন কালো হয়ে গেছে। জলের তলা থেকে অন্ধ শক্তি উঠে ফুৎকারে জলস্রোত ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে তুলছে। ফ্যাকাশে মুখে জয়ন্তী তাকালো সুতপনের দিকে।

সুতপনকে কার্তিক বললো, এবার খানিক জল আপনাকে ছিঁচতে হবে।

ডিঙ্গির একপ্রান্তে বসেছে কার্তিক, অন্যপ্রান্তে সুতপন। সুতপন দেখলো, কাঠের জালি দিয়ে গলগল করে যে পরিমাণ জল ঢুকছে, তার অর্ধেক বের হচ্ছে না। জোলো বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। গুমোট আবহাওয়া।

আপনি সাঁতার জানেন তো বাবু, কার্তিক জিজ্ঞেস করেছিল।

শুকনো গলায় সুতপন জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ।

কথাটা বললেও ভয় পেয়েছিল। ক্ষ্যাপা সমুদ্রে অতি বড় সাঁতারুও যে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। এই ক'দিনের সমুদ্রস্নান সে অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। শান্ত সমুদ্রে আধ মাইল সাঁতরে যাবার পরেও পায়ের নিচে মাটি পেয়েছে। তবু এক একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ধরাশায়ী হয়ে গেলে ভয়ে কেঁপে উঠেছে বুক। বিশাল সমুদ্রে দিকচিহ্নহীন জলরাশির দিকে তাকিয়ে নিজেকে ভীষণ তুচ্ছ মনে হয়েছে। জয়ন্তীর সামনে মুখে সাহস দেখালেও সমুদ্রে নেমে আদৌ সে কোন বেয়াদপি করেনি। কার্তিকের মুখে সাঁতার কাটার প্রসঙ্গ শুনে সে দমে গেল।

জলের নিচে হঠাৎ বিস্ফোরণ শুরু হলো। ডিঙ্গির তলায় জল ফেটে পড়ছিল। মৃদু সোঁসোঁ আওয়াজ ধীরে ধীরে দামাল ঝড়ের চেহারায় সমুদ্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সমুদ্র নেচে উঠলো ঝড়ের প্ররোচনায়। ঢেউ এর পর ঢেউ লাফিয়ে পড়তে থাকলো খুদে ডিঙ্গির ওপর। দিগন্তব্যাপ্ত ঢেউ, পৃথিবী গুঁড়িয়ে দিতে চায়। দীঘার ভূখণ্ড দেখা যাচ্ছিল না। সাত, আট ফুট উঁচু সারিবদ্ধ ঢেউয়ের আড়ালে দীঘার লোকালয় অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারপাশে থোকা থোকা ঘন সাদা ফেনার ঘূর্ণি নেচে বেড়াচ্ছে।

আতঙ্কে দু'হাতে শক্ত করে গলুই ধরে জয়ন্তী বসে ছিল। ঢেউয়ের ঝাপটায় যে কোন মুহূর্তে ডিঙ্গির বাইরে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা করছিল।

প্রায় এসে গেছি, কার্তিক বললো, কিন্তু ডিঙ্গি তো এখন তীরে ভেড়ানো যাবে না।

তাহলে কি হবে, কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল সুতপন।

ডিঙি এখানে ছেড়ে যেতে হবে। জলের ধাক্কায় ডিঙি তীরে চলে যাবে। আমি বৌদিকে ডাঙ্গায় পৌছে দেবো, কার্তিক বলেছিল, আপনি এটুকু সাঁতরে চলে আসুন।

নিদারুণ ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল সুতপন। হয়তো এর নাম মৃত্যুভয়! তার মনে হয়েছিল, ঢেউয়ের পাহাড় পেরিয়ে সে কোন দিন তীরে পৌছোতে পারবে না। অতল সমুদ্রে চিরতরে তলিয়ে যাবে। তারপর কোন এক সময়ে, প্রকৃতি শান্ত হলে তার শবদেহ বালির ওপর ছুঁড়ে

ফেলে দিয়ে নির্বিকার সমুদ্র দু'এক কদম পেছনে সরে যাবে। ফাঁকা চোখে সুতপন নিজের শবদেহের দিকে তাকিয়েছিল। বাতাস, সমুদ্র হাততালি দিয়ে নাচছে। চরাচর জুড়ে বুকচাপা, কান্নার শব্দ। জয়ন্তীর দিকে চোখ পড়তে সুতপন দেখলো, ডিঙ্গির মাঝখান থেকে সরে গিয়ে কার্তিকের কোল ঘেঁসে সে বসেছে। যে কোন মুহূর্তে বাঁচার আশায় কার্তিকের গলা জড়িয়ে ধরতে পারে। সুতপন ভেবেছিল, কার্তিকের প্রস্তাবে জয়ন্তী রাজি হবে না। জয়ন্তী বলবে, সুতপনের হাত ধরে সে পাড়ে উঠবে। অথবা সুতপন, জয়ন্তীকে একসঙ্গে কার্তিক আগলে নিয়ে বালির ওপর দাঁড় করিয়ে দেবে। কিন্তু জয়ন্তী যেন সুতপনের কথা ভুলেগেছে। সুতপন নামে কাউকে চেনে না। সে একবার তাকিয়েও দেখলো না সুতপনকে। মধুচন্দ্রিমার দিনগুলোর যতো অনুরাগ, প্রেম, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ধাক্কায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

ডিঙ্গি যতো পাড়ের দিকে এগোচ্ছে, ঝড়ের গোঁগোঁ শব্দ ততো জোরালো হচ্ছে।

কার্তিক বিড়বিড় করলো, আর এগোনো যাবে না।

একটা ভাঙ্গা ঢেউয়ের গুঁতো খেয়ে ডিঙ্গি লাফিয়ে উঠলো আকাশের দিকে। কার্তিক চেঁচিয়ে উঠলো, বাবু, সাবধান।

তারপর জয়ন্তীর ঘন কালো লম্বা বেণি ধরে কার্তিক ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। ঝাঁকুনিতে হাল্কা ডিঙ্গি প্রায় উল্টে পড়েছিল। সুতপন কিছু বোঝার আগে একটা ঘূর্ণি ঢেউ তাকে তীরের দিকে ছুঁড়ে দিল।

কলঘরের দরজায় ঘন ঘন আঘাতের শব্দে সুতপনের ঘোর কেটে যায়। কেউ ডাকছে। এলার গলা শুনতে পেল সুতপন, এলা বললো, খাবার কিন্তু জুড়িয়ে যাচ্ছে।

হয়ে গেছে, সুতপন জানালো। কিন্তু তারপরও আত্মস্থ হতে কিছু সময় নিলো। ফোয়ারার জলে স্নানঘর প্রায় ডুবে গেছে। পায়ের নিচে থৈথৈ জল। সুতপনের খেয়াল হলো, ফোয়ারার তলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কল বন্ধ করে তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গ মুছে যখন বাইরে এলো, তখনও তার চেতনা ঝাপসা হয়ে আছে।

দেরি হয়ে গেল, সুতপন কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করলো। বিয়ারের নেশা জলে ধুয়ে গেলেও মাথার মধ্যে ঝিমধরা ভাব। খাটে বসে স্টু-এর বাটিটা সুতপন কোলের ওপর টেনে নিল।

বাইরে দিনের আলো মরে আসছে। ঘরের মধ্যে ধূসর ছায়া। দু'চামচ স্টু খাওয়ার পরে সুতপনের নাকে এক দশক আগের সেই আঁশটে গন্ধটা সজোরে ধাক্কা মারলো। দু',তিন মিনিট নাকানি চোবানি খেয়ে সুতপন সেদিন তীরে উঠেছিল। ফাঁকা, ধুধু তটভূমিতে তখন একজনও মানুষ নেই। শুধু ঢেউয়ের গর্জন আর হাওয়ার হা হা শব্দ। কালচে মেঘ কিছুটা ফিকে হয়ে গিয়ে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছিল। জনমানবহীন বেলাভূমির ওপর সুতপন কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। কোথায় জয়ন্তী? কার্তিকই বা কোথায়? জয়ন্তীকে কি কার্তিক বাঁচাতে পারেনি? তখনই অদূরে ঝাউবন থেকে কেউ ডাকলো, বাবু!

ঘাড় ফিরিয়ে সুতপন দেখতে পেয়েছিল কার্তিককে। কয়েক লাফে বালিয়াড়ি ভেঙ্গে সুতপন পৌঁছে গেল কার্তিকের কাছে।

বৌদি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল, কার্তিক জানালো, এইমাত্র জ্ঞান ফিরেছে।

অগোছালো শাড়ি, এলোমেলো চুল, সিক্ত শরীরে বালি আর কুটোমাটি মাখা জয়ন্তী দু'হাতে

মুখ ঢেকে একটা ঝাউ গাছের নিচে শুয়ে ছিল। তার দিকে একপলক তাকিয়ে কার্তিক বললে
আমি একটা রিক্‌শা ডেকে আনি।

কার্তিকের কথা কানে যেতে জয়ন্তী নড়ে উঠছিল। ক্লান্ত গলায় বলেছিল, রিক্‌শার দরকা
নেই, হেঁটে যেতে পারবো।

কিছু সময় বাদে সুতপনের কাঁধে ভর দিয়ে বাংলোয় ফিরেছিল জয়ন্তী। জয়ন্তীর শরী
থেকে আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছিল। মাত্র কয়েক মিনিটে জয়ন্তীর জন্মপরিচয়, শারীরিক উপাদা
বদলে গেছে। সুতপন ভাবছিল, এমন আঁশটে গন্ধ, মাছমারা ঘরের মেয়ে, বৌদের শরীর থে
পাওয়া যায়। জাদুবলে জয়ন্তী যেন মেছুনি হয়ে গেছে।

এক বোতল বিয়ারে নেশা হয়ে গেল নাকি, এলা বললো, আপনার চোখ দুটো ভীষণ লা
দেখাচ্ছে।

অনেকক্ষণ স্নান করার জের, সুতপন জবাব দিল। কোথাও ঘুঘু ডাকছিল। একটানা ক্লা
স্বর ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

মাথা থেকে জয়ন্তীর ভাবনা ঝেড়ে ফেলে সুতপন সোজাসুজি এলার দিকে তাকালে
বললো, তোমাকে কিছু কথা বলার আছে।

দারুণ এক সুসংবাদ শোনার প্রত্যাশায় এলার দু'চোখের ঘন পাতা তিরতির করে কেঁ
ওঠে। মাত্র কয়েক পলকের জন্যে। সহজ গলয় সে বললো, বলুন।

এখন নয়, জবাব দিল সুতপন, আর একটু পরে। একটু জিন খাও, সুতপন বললো। বিছা
ছেড়ে উঠে সুটকেস খুলে একটা জিন আর একটা হুইস্কির বোতল এনে মাথার কাছে ছে
টেবিলে রাখলো।

সি-বিচে বেড়াতে যাবেন না; এলা জিজ্ঞেস করলো।

নিশ্চয় যাবো, সুতপন বললো, সূর্য ডুবলে বের হবো। জল মেশানো জিনের গ্লাসে চুমু
দিয়ে এলা বললো, কি বাজে!

আমি লাইম আনতে বলছি, সুতপন জানালো এবং কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল
দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে দীপু হুকুম শোনার জন্যে সুতপনের দিকে তাকালো।

বাইরে করিডোরে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ, মেয়েলি গলার হাসি ভেসে উঠলো। সুতপ
বললো, লাইম আর সোডা চাই।

শেষ বিকেলে বাড়িটা জেগে উঠেছে। বোঝা গেল, প্রায় সব ঘরে মানুষজন আছে
পানশালায় গিয়ে বসেছে কেউ কেউ। একতলার বাগান থেকে কচি গলার ডাক শোনা যায়,ম
তাড়াতাড়ি এসো। সন্ধে হয়ে গেল যে!

ফরমাস মতো জিনিস নিয়ে দীপু ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলো, রাতে কি খাবেন?

এলার দিকে তাকালো সুতপন।

এলা বললো, ভাত।

মাছ, ভাত, তরকারির অর্ডার দিয়ে সুতপন বললো, ন'টার সময় খাবো।

দীপু চলে গেল।

ঘরে অন্ধকার ঘন হয়েছে। পাখির কলরবে ঝমঝম করছে প্রকৃতি।

দুটো ডেক চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছে দু'জন। সালোয়ার কামিজ পরা এলার মুখ ফি
অন্ধকারে রেখাচিত্রের মতো দেখাচ্ছে। আরাম করে লাইম মেশানো জিনের গ্লাসে সে চুমু

চ্ছে।

দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে, সুতপন বললো।

লজ্জা পেয়ে এলা হাসলো। পাট করা ওড়নাটা বুকের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে এলা বললো, ালোটা জ্বেলে দিন।

কেন?

ভয় করছে।

সুতপন শব্দ করে হাসলো। বললো, কম আলোই তো ভালো।

এলা জবাব দিল না। তার খালি গ্লাসে জিন ঢালতে ঢালতে সুতপন বললো, আলোকিত থিবীতে যা দেখা যায়, তার সবটা সঠিক নয়। এলা বুঝতে পারলো না সুতপনের কথা। ্রসিংটেবিল থেকে চিরুণি নিয়ে এলা তার লম্বা চুল আঁচড়াতে শুরু করলো। বহুদিন ধরে পে রাখা এক অতৃপ্ত আকাঙ্খা সুতপনের রক্তের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকলো। লার নরম যৌবনকে নিঃশেষে শুষে নেওয়ার তাড়না শরীরে পাক খেতে লাগলো। সেই ড়নাতে এতো দূর আসা। এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। চিরুণি রেখে চেয়ারে বসে এলা স তুলে নিল। সুতপন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মদির চোখে এলা দেখলো সুতপনকে। তপনের কানে শুভেন্দু গুপ্ত ফিসফিস করলো, বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ো। চেটেপুটে খেয়ে াও। দেখ, এলার শরীরে ঢেউ ভাঙছে।

সুতপনের শ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন। এলার পেছনে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো।

এলা জিজ্ঞেস করলো, আমার দাদা কি বাঁচবে?

প্রশ্ন শুনে সুতপন কাঠের পুতুলের মতো স্থির হয়ে গেল। একেবারে চলচ্ছক্তিহীন। অসুস্থ, ীর্ণ সেই মানুষটার পাণ্ডুর মুখ তার মনে পড়লো। ফণা তোলা কামনা তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে মুখ ্কোলো। মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে আতঙ্কে ঘরের আলো জ্বেলে দিল সুতপন। দুটো জোরালো ালোয় ঘর ভেসে গেল।

চেয়ারে ফিরে সুতপন নতুন করে গ্লাসে হুইস্কি ঢাললো। বেশ অনেকটা, পরিমাণের চেয়ে বশি। সামান্য জল মিশিয়ে এক চুমুকে প্রায় অর্ধেক গিলে নিল। সব মানুষই নিজের জীবনকে ীষণ ভালোবাসে, স্বগতোক্তির মতো কথা বলছিল এলা, এটাই স্বভাবিক। জীবন তো একটাই। কন অপচয় করবে?

এলা এসব কথা কি প্রসঙ্গে বলছে, সুতপন ধরতে পারছিল না। এলার মুখের দিকে সে চয়ে থাকলো। সুতপনের চোখের সামনে খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল আলো, অন্ধকার এক ঘুগতি নাগরদোলায় ঘুরে যাচ্ছিল। এলা বললো, জীবনটা নিজের মতো আমি চালাতে পারছি । কেন? স্নেহ, সেবায় আর কতো দিন নিজেকে বিকিয়ে দেবো?

তুমি কি দাদার মৃত্যু কামনা করছো, নিষ্ঠুরের মতো প্রশ্ন করলো সুতপন।

একটুও বিহ্বল না হয়ে শান্ত গলায় এলা জবাব দিল, কারো মৃত্যু কামনা করি না। সকলে স্থ থাকুক, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকুক। আমিও বাঁচতে চাই।

নিজে বাঁচতে পরমাত্মীয়ের জীবনকে কি তুমি উৎসর্গ করতে পারো, সুতপন জিজ্ঞেস রলো।

কি জানি, উদাসীন গলায় এলা বললো, সেরকম পরিস্থিতি এলে হয়তো করে ফেলতে ারি। মানুষ স্বার্থপর নয়, কিন্তু তার পুঁজিও তো অফুরন্ত নয়।

সুতপন কথা বললো না, পৃথিবীর কোলাহল মুছে গিয়ে নৈঃশব্দ নেমেছে। বাতাসে অবির্া ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ।

আট

অন্ধকারে বিশ্বচরাচর ডুবে গিয়েছিল। নেশায়, অথবা অন্য কোন চিন্তায় বুঁদ হয়ে বসেছি সুতপন। কথা বলার উৎসাহ নেই তার। জাগতিক পৃথিবী এবং ব্যক্তিগত নানা তাগিদের কথ তার মন থেকে মুছে গেছে। সারা দিনের দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, সুদূর অতীতের ঘটনা। সব মনে করতে পারছিল না।

তার মুখ থেকে কিছু গোপন ও জরুরি কথা শোনার জন্যে এলা মুহূর্ত গুনছিল। সুতপ কি বলতে চায়? অদম্য কৌতূহলে এলা ছটফট করছে। সুতপন ঝিম মেরে গেছে। এমন প্রাণবান সজীব মানুষটা কেন প্রায়ই বিমর্ষ, উদাসীন হয়ে পড়ে, এলা বুঝতে পারে না। তার মনে হয় কোন অকথিত কাহিনীর ভারে সুতপন পীড়িত হচ্ছে। কিছু বলার তাড়নায় উসখুস করছে কিন্তু বলে না। আরো মৌন, গম্ভীর হয়ে যায়।

এলা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি যেন বলতে চাইছিলেন?

সুতপনের চারপাশের পৃথিবী টলমল করছিল। আধবোতল হুইস্কি প্রায় শেষ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুতপন বললো, চলো, সমুদ্রের ধার থেকে একটু ঘুরে আসি।

ঘরের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে এলার নেই। তবু ছোট্ট হাই তুলে বুকের ওপর উড়ুনি গুছিয়ে অলস পায়ে উঠে দাঁড়ালো। তারও মাথা ঘুরছিল। শরীরে শিথিল ভাব। কোথাও দ্রুত কি গলে যাচ্ছে।

সদর দরজার ডানদিকে, একতলায় একটা গোলাকৃতি ঘরে টুরিস্ট হাউসের পানশালা দুপুরে ঢোকার সময় সুতপন লক্ষ্য করেনি। এখন দেখলো। ফিকে আলোয় সোফা কৌচ মোড়া সাজানো বারে কয়েকজন মদ্যপান করছে। পুরুষ সঙ্গীদের সঙ্গে বসে আছে দু'জন মহিলাও স্বপ্নাতুর, মেজাজি পরিবেশ। সুতপনের আর ভয় করছিল না। সে ঠিক করলো, সমুদ্রর ধা থেকে ফিরে এখানে বসবে।

হাল্কা আলোয় বাগানের মধ্যে এলা একা দাঁড়িয়েছিল। সুতপন সেদিকে এগিয়ে গেল পা'দুটো সামান্য টলছিল। অন্ধকার পথ টপকে বালিয়াড়ি ভেঙে তারা সমুদ্রের দিকে এগিে চললো। পায়ের নিচে পথ পরিষ্কার দেখা যায় না। আকাশে চাঁদ নেই। নক্ষত্রের আলোয় অন্ধকা ধূসরতর হয়ে আছে। ঝাউবন ভেদ করে বাতাসের একটানা সাঁইসাঁই শব্দ উঠছে। বন শে হতে তারা দিকদিশাহীন সমুদ্রের মুখোমুখি হয়ে গেল। দিগন্তবিস্তৃত ঘন কালো জ ফসফরাসের আলোয় ঝকঝক করছে। ঢেউয়ের গুমগুম ধ্বনিতে ঝাউবীথির মর্মর শোনা যাচে না। ধুধু সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সুতপন কেঁপে উঠলো। তার শরীর ঘেঁষে, সমুদ্রের দিকে চে এলা দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়ে সেও স্তব্ধ হয়ে গেছে। এলার কাঁধে হাত রেখে সুতপন টের পে তার লোমকূপ শক্ত হয়ে উঠেছে।

আমি কি তোমার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করেছি, সুতপন প্রশ্ন করতে এলা এক অবাক হয়ে জবাব দিল, নাতো।

ঝোড়ো হাওয়ায় এলার খোলা চুল আর উড়ুনি এলোমেলো উড়ছিল। সব একসে

সামলাতে অসুবিধে হচ্ছিল তার। এলাকে এক পলক দেখে সুতপন আবার জিজ্ঞেস করলো, আমার আচরণে তুমি কি কখনো আঘাত পেয়েছো?

না।

আমি কি তোমার ওপর কখনো সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছি?

না।

সমুদ্র নয়, আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দাও, সুতপন বললো।

অভিভূতের মতো এলা ঘাড় ফেরালো সুতপনের দিকে। চারপাশে বড় বেশি অন্ধকার। এলার অচেনা লাগছিল সুতপনকে। শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল সূক্ষ্ম ভয়। সাদা ফেনার ঢেউ ছলছল শব্দে হেসে উঠছে।

সুতপন বললো, আমার নাম সুতপন সেন, শুভেন্দু গুপ্ত নয়।

জানি, এলা জবাব দিল।

আমি বিবাহিত, আমার একটা ছেলে আছে, সুতপন বললো।

এসবই তো আপনি বলেছেন আমাকে, এলা জানালো।

সুতপনের পায়ের নিচে অন্ধকার বালিয়াড়ি, চারপাশের ঝাউবন, মহাসমুদ্র নাচতে শুরু করেছে। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। কি বলছে এলা? সুতপন নিজের দুটো কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না।

এলার মুখের দিকে চেয়ে সুতপন বললো, আমি ভুয়ো পরিচয়ে তোমার সঙ্গে এতো দিন মিশেছি। ভাঁওতা দিয়ে তোমাকে ভোগ করার মতলব ছিল আমার। আমাকে তুমি মাপ করো।

এলা হতবাক। সুতপনের হলো কি? এসব কথা সে বলছে কেন? এতো অল্প খেয়ে তো সুতপনের নেশা হয় না।

সুতপনের দিকে এলা এক পা এগিয়ে এল। নরম, স্নিগ্ধ গলায় বললো, আপনি কোন মিথ্যে কথাই বলেননি। আপনার সত্য পরিচয় কখনও গোপন করেননি আমার কাছে।

সুতপন অবাক হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, তাহলে শুভেন্দু গুপ্ত কে?

জানি না, পরিষ্কার গলায় এলা জবাব দিল, ও নাম কখনো শুনিনি। ওটাই হয়তো আপনার আসল নাম।

সুতপনের মনে হলো, অন্ধকার বড় বেশি অতল হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের ঢেউ এখনি বালিয়াড়ি, ঝাউবন, তটভূমি ভাসিয়ে দেবে। সমুদ্রের টানে মানুষ, ঘরবাড়ি, রাস্তা ভেসে যাবে। মুছে যাবে সব কিছুর আলাদা পরিচয়। সব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একাকার হয়ে যাবে। সুতপন, শুভেন্দু, এলা, জয়ন্তী এবং হাজার, লক্ষ মানুষকে কোন পরিচয়ে চিহ্নিত করা যাবে না। এ কোন্ প্রহেলিকায় সুতপন জড়িয়ে পড়লো? নিজের পরিচয়ে এতো দিন এলার সঙ্গে মিশেও কেন আত্মঘাতী বিভ্রমে সে ভুগছিল? এটা কেন হলো? অন্ধকারে এলা কয়েক হাত সরে গেছে। অনেকদূর থেকে গোড়ালিডুব সমুদ্রজল ধরে হেঁটে আসছে এক ছায়ামূর্তি।

সুতপনের হঠাৎ মনে হয়, তার আসল নাম শুভেন্দু গুপ্ত নয় তো? তার স্ত্রী, ছেলে, আত্মীয়, বন্ধুরা, তাকে কোন্ নামে চেনে? ভাবার চেষ্টা করলো সুতপন। স্মৃতি জট পাকিয়ে গেছে। সঠিক কিছু হদিশ করতে পারলো না। পরিচিত অনেক নাম তার মাথার মধ্যে ছিন্ন ফুলের পাপড়ির মতো উড়তে থাকলো। উদয়ন রায়, অভিজিত ভট্টাচার্য, সৌম্য বোস এবং আরো অসংখ্য কিশোর, যুবক, বয়স্ক সকল মানুষের মুখ তার মনে পড়লো। স্কুল জীবন থেকে, এই সব নামের

কোন একটা গ্রহণ করে, সে সফল হতে চেয়েছে। পারেনি। সত্যি কি পারেনি? সফলতা কাকে বলে? ব্যর্থতা কি? উদয়ন ছিল স্কুলের সেরা ছাত্র, ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়েছিল। অভিজিতের মতো সাহসী ছেলে সুতপন কখনো দেখেনি। অভিজিত ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উনিশশো সত্তরে তিলজলায় অভিজিত খুন হয়েছিল। সৌম্য বোস, তার কর্মক্ষেত্র, নামি বহুজাতিক সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এতো অল্প বয়সে সৌম্য বোসের সাফল্য চোখে পড়ার মতো ঘটনা। কিন্তু শুভেন্দু গুপ্ত কে? অথবা সুতপন সেন? গোড়ালিডুব জল মাড়িয়ে যে ছায়ামূর্তি পশ্চিম থেকে হেঁটে আসছিল, অন্ধকার তরল জলরাশির মধ্যে সে মিলিয়ে গেছে।

এলা বললো, এবার ফেরা যাক।

কোথায়, সুতপন জানতে চাইলো?

ডেরায়, এলা জবাব দিল। তারপর নিচু গলায় যোগ করলো, ঘরে।

ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে সন্তর্পণে হাঁটার সময় এলা বললো, অনেক দিন আগে একবার বিষ্ণুপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মূর্তিগুলো অসাধারণ। পোড়ামাটির একজোড়া কালো হাতি, একজোড়া লাল রঙের ঘোড়া, একটা গণেশ আর একটা বিশ্বকর্মার মূর্তি কিনে চটের থলিতে যত্ন করে ভরে বাসে উঠলাম। মূর্তিগুলো আস্ত রাখতে খুব সতর্ক ছিলাম। কলকাতায় ফিরে থলি খুলে দেখলাম, তার ভেতরে হাতি, ঘোড়া, দেবমূর্তি কিছু নেই। লাল এবং কালো রঙের কয়েক মুঠো ধুলো পড়ে রয়েছে।

ঝাঁকড়া ঝাউগাছের তলায় অন্ধকারে সুতপন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শক্ত হয়ে গেল তার শরীর। শ্বাসরুদ্ধ গলায় সে প্রশ্ন করলো, কি বলছো তুমি?

ঠিক বলছি, এলা জবাব দিল, সব নাম, সব পরিচয় শেষ পর্যন্ত একমুঠো লাল বা কালো রঙের ধুলো হয়ে যায়। তবু মূর্তি গড়া হয়। নির্দিষ্ট নাম, পরিচয়ে, সেই মূর্তি মানুষের আদর কাড়ে। তারপর মাটিতে মিশে যায়।

সুতপন কথা বলতে পারে না। অন্ধকার ঝাউবনের পেছনে আলোকোজ্জ্বল টুরিস্ট হাউসের দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

****

কাহিনী শেষ করে ডান দিকের সোফার ওপর নজর ফেলে মীনাক্ষিকে উৎপল দেখতে পেলো না। মনে হলো, সোফাটা খালি, অন্ধকার ছাড়া সেখানে কিছু নেই। উৎপলের সামনে টেবিলের ওপর জোরালো আলো জ্বলছে। দালানের ঘড়িতে ঢংঢং শব্দ তুলে রাত বারোটা বাজলো। চারপাশের পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দ চরাচর। হঠাৎ হাই তুলে মুখের সামনে গোটা দুই তুড়ি বাজিয়ে সোফা থেকে মীনাক্ষি উঠে দাঁড়ালো। তার মুখে ক্লান্তি। সামান্য বিরক্তিও ঠাহর করলো উৎপল। উৎপল বুঝতে পারলো, তার নতুন লেখাটা স্ত্রীকে খুশি করেনি।

উৎপল প্রশ্ন করলো, কেমন লাগলো?

ব্যাজার মুখে মীনাক্ষি বলল, তুমি যে বললে প্রেমের উপন্যাস, এ কেমন প্রেম-কাহিনী?

কি জবাব দেবে উৎপল ভেবে পেল না। সে বুঝতে পারলো, নতুন উপন্যাস শোনার জন্যে সন্ধে সাতটা থেকে আটকে গিয়ে মীনাক্ষি চটেছে। উপন্যাস শুনে হতাশ হয়েছে।

মীনাক্ষি বললো, তোমার দ্বারা প্রেমের গল্প লেখা হবে না। প্রেম সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই।

নির্মম অভিযোগ। অভিযোগ খণ্ডন করার ক্ষমতা উৎপলের নেই।

বিছানার দিকে কয়েক পা এগিয়ে মীনাক্ষি বললো, তুমি যে কি করে আমাকে বিয়ে করলে, ভেবে আশ্চর্য লাগে।

মীনাক্ষির মুখ করুণ হয়ে ওঠে। উৎপল দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে মীনাক্ষি বললো, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো।

উৎপল টেবিল ল্যাম্পের সুইচ্ টিপতে ঘর অন্ধকারে ডুবে যায়। শব্দহীন অন্ধকারে বসে উৎপল ঘরের খাট বিছানা, মীনাক্ষিকে দেখার চেষ্টা করে।

ঘুম জড়ানো গলায় মীনাক্ষি জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? সুতপন, না শুভেন্দু গুপ্ত?

উৎপল বলতে পারলো না, আমি উৎপল। •

স্বধর্ম

এক

দিকচিহ্নহীন অন্ধকার ফুঁড়ে ঝমঝম শব্দে বোম্বে মেল ছুটে চলেছে। শীতের জন্যে কামরার প্রায় সব জানলার কাচ নামানো। কাচের ওপাশে ঘন কুয়াশায় মোড়া গ্রাম নগরের মিটিমিটি আলো। খুঁটিনাটি নানা আলোচনা শুনে অনন্য কেমন বিহ্বল হয়ে যায়। কোটি কোটি পুণ্যার্থীর পদভারে টলমল এলাহাবাদ শহরটা পরিষ্কার দেখতে পায়। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। ঘর বাড়ি ছাদ দালান থেকে মানুষজন উপচে পড়ছে। পৌষের এই হাড়-কাঁপানো তীব্র শীতে রাস্তায় রাত কাটানোর কথা ভেবে অনন্য বিমর্ষ বোধ করে। ঝোঁকের মাথায় এভাবে ট্রেনে উঠে পড়া উচিত হয়নি। ভেবেচিন্তে, সব দিক গুছিয়ে, থাকার জায়গা ঠিক করে, বাড়ি থেকে বেরনো উচিত ছিল। সাবধানী লোকেরা তাই করে।

ছোটখাট, পাকানো চেহারা, একমুখ দাড়িগোঁফ বেলেঘাটার চক্রবর্তীমশাই দুটো বাঙ্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীদের বলছে, এ এক মহাযোগ। একশো চুয়াল্লিশ বছর পরে মকর, বৃহস্পতি আর চন্দ্র মিলিত হচ্ছেন। মানুষের জীবনে পুণ্যস্নানের এমন সুযোগ সহজে আসে না। পুণ্যার্থীর ভিড়ে এলাহাবাদ ভেসে যাবে।

চক্রবর্তী মশায়ের মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধা মাফলার উত্তেজনায় ভেঙে পড়ে। চক্রবর্তীমশাই, স্বামী তেজেশানন্দের ঘনিষ্ঠ শিষ্য। কামরার প্রায় সব যাত্রী, স্বামীজীর শিষ্য। গুরুর সঙ্গে চলেছে প্রয়াগে, পূর্ণকুম্ভের স্নানে। কামরায় অনন্য এবং আরও দু-চারজন বাইরের যাত্রী আছে। ঘটনাচক্রে এখানে জায়গা পেয়েছে। দু'জন শিষ্য নিয়ে স্বামী তেজেশানন্দ আছেন ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে।

অনন্যর ডানপাশে মাঝবয়সি এক দম্পতি, এলাহাবাদের খাবার-দাবার নিয়ে খোস গল্প জুড়েছে। স্ত্রীটি বোধ হয় পুরনো এলাহাবাদবাসিনী। সুন্দরী। বলল, বেনীঘাটের কচৌরির তুলনা নেই। সরুচাকলির সঙ্গে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট মেশালে যেমন হয়, তাই। কী মোলায়েম আর খাস্তা! সঙ্গে হিঙের গন্ধ।

লোভাতুর চোখে স্বামী বলল, জিলিপিটাও ভালো।

স্ত্রী জবাব দিল, জিলিপি নয়, জেলেবি। জেলেবির বাবা হলো জেলেবা আর তার বাবা, প্রায় কুমোরের চাকার মতো সাইজ, তার নাম হচ্ছে জেলেবো। একটা গরম জেলেবো খেলে রাতের খাওয়া হয়ে যায়।

ভোজনরসিক এই দম্পতি স্বামীজীর শিষ্য না হলেও তাঁর ভক্ত। সব খবর মন দিয়ে অনন্য শোনার চেষ্টা করে। একটা জেলেবো খেয়ে যদি রাতের মতো পেটের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলা যায়, তাহলে পয়সাকড়ির অনেক সাশ্রয় হয়। দিন সাতেক তাকে এলাহাবাদে থাকতে হবে। অগণিত মানুষের মধ্যে থেকে তুহিনকে খুঁজে বার করতে হলে, সাতদিন, খুব বেশি সময় নয়। প্রয়াগের পথঘাট, সাধুসন্তদের আশ্রম, আখড়া এবং সব সম্ভাব্য জায়গায় তুহিনের খোঁজে আঁতিপাতি সন্ধান চালাবে। হয়তো তুহিনের হদিশ শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। তাকে একা,

তুহিনের বিধবা মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার নিস্তব্ধ মুখ দেখে মাসিমা বুঝবে, নিরুদ্দিষ্ট ছেলের কোনো খবর মেলেনি। দমবন্ধ নীরবতায় বাতাস ভারী হয়ে উঠবে। তারপর একসময় মাথা নিচু করে সে চুপচাপ ফিরে আসবে। এমন ঘটনা আগেও কয়েকবার ঘটেছে। তুহিনের ওপর কী এক রাগে মাঝে মাঝে অনন্য তেতে ওঠে। বিধবা মাকে ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া যে কোনো ছেলের পক্ষে অপরাধ। দুজন দিদি থাকলেও তুহিন তার মায়ের একমাত্র পুত্রসন্তান। এই ছেলেকে ঘিরে মাসিমা কত কল্পনার মিনার বানিয়েছে। এসব কথা ভাবলে অনন্যর সঙ্কোচ হয়, মনে কুণ্ঠা দানা পাকায়। যন্ত্রণায় সে গুটিয়ে যেতে থাকে। তুহিনের বিবাগী হওয়ার পেছনে তার কিছুটা দায়িত্ব আছে। স্মৃতির মধ্যে সেই ধূসর থমথমে সন্ধ্যা আর মৃত শিবুর ফ্যাকাশে মুখটা জেগে ওঠে। তার দুহাতের আলিঙ্গনের মধ্যেই তো শিবু মরে কাঠ হয়ে গেল! পাঁচ বছর আগের সেই দুর্ঘটনার ছবি, আজো দিনরাত, এমন কি গভীর রাতে, ঘুমের মধ্যেও দুঃস্বপ্নের মতো চেতনায় হানা দেয়।

উনিশশো একাত্তর সালের শেষদিকে এক সন্ধ্যেতে মিলিটারি, সি আর পি-তে হাতিবাগান পাড়া ঘিরে ফেলেছিল। পাশের পাড়ায় এক গলিতে শিবনাথের বাড়ির দোতলার ঘরে সেই বিকেলে অনন্য, তুহিন আর শিবু বসেছিল। ঘেরাও-এর খবরে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তিনজন। হাতিবাগানে সেই রাতে একটা মিটিং-এ অনেকের আসার কথা ছিল। কেউ কেউ এসে গিয়েছিল। পার্টির অনেক মূল্যবান কাগজপত্র লুকনো ছিল সেখানে। সব ধরা পড়ে যাবে। অস্থির মাথায় দিনান্তের ঘোলাটে অন্ধকারে ফৌজি বেষ্টনীকে ওরা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

অনন্যর চেয়ে বয়সে শিবু, তুহিন, বছর দু, তিনের ছোট। শিবু বলেছিল, অনুদা, তুমি একটু বসো, আমি আর তুহিন একচক্কর ঘুরে অবস্থাটা বুঝে আসি। শত্রুর দুর্বলতম জায়গায় ঘা মারতে হবে।

বাড়ি থেকে শিবু, তুহিন বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট দুই পরে অনন্য রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল। চেনা পাড়া। অফিস-কাছারি থেকে লোকজন ফিরছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। কুয়াশা ঢাকা প্রথম শীতের সন্ধ্যের আকাশ গলির মাথায় থমকে আছে।

অনন্য ভেবেছিল, ওদের পাঠানো কি ঠিক হলো? তুহিন, শিবুর সঙ্গে তারও যাওয়া উচিত ছিল। গলি থেকে গ্রে স্ট্রিটের দূরত্ব দুশ গজও হবে না। সে ভাবছিল, ছেলে দুটো এত দেরি করছে কেন?

বোমার প্রচণ্ড শব্দে অনন্য চমকে উঠেছিল। ওরা কি অ্যাকশন শুরু করে দিল? অনন্য ভেবেছিল, খালি হাতে গিয়েছে দু'জন। একদল কাক তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠল। তারপর চারপাশ নিথর, নিঝুম। তখনি আবার কটকট করে গুলির শব্দ শোনা গেল।

অনন্য ঘাবড়ে গিয়েছিল। শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে গেল ঠাণ্ডা জলের স্রোত। বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। তখনই আবছা অন্ধকারে, ফাঁকা রাস্তা ধরে শিবু আর তুহিনকে ছুটে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল অনন্য। প্রায় সমান তালে ছুটে আসছে দু'জন। তাদের পেছনে কেউ নেই। অনন্য ভেবেছিল, ছুটোছুটি না করে ওরা হেঁটে এলেই পারতো। অনন্যর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিবু বলেছিল, অনুদা, আমার বুকের বাঁদিকে কী একটা লাগল। দেখ তো! দুহাতে শিবুর দুটো কাঁধ ধরে তার বুকের বাঁদিকে নজর করার সঙ্গে সঙ্গে সে ঢলে পড়ল। অনন্যর মনে হয়েছিল, শিবুর গোটা শরীর তার বুকের ওপর ভেঙে পড়েছে। সটান,

শক্ত শরীর। বুকের বাঁদিকে একটা রক্তাক্ত ফুটো।

কী হয়েছে শিবুর, তুহিন জিজ্ঞেস করেছিল।

অনন্য জবাব খুঁজে পেল না। শিবুর কাঠ হয়ে যাওয়া শরীরের ভারে তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

তুহিন তখনও কী ঘটেছে, বুঝতে পারেনি। বলছিল, আমাদের দিকে একজন সি আর পি রাইফেল দেগেছিল। অল্পের জন্য লাগেনি।

অনন্য পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। শিবুর পরিণতি বুঝতে অসুবিধে হয়নি। রাইফেলের গুলি ঠিক জায়গায় লেগেছে। দুজনে ধরাধরি করে শিবুকে পাড়ার এক ডাক্তারের বাড়িতে হাজির করেছিল। অল্পবয়সী ডাক্তার অনন্যর বন্ধু। শিবুকে একপলক ছুঁয়ে বলেছিল, এক্সপায়ার্ড। সে-ই ডাক্তারই মৃত শিবুর দায়িত্ব নিয়ে পুলিশ, হাসপাতাল ইত্যাদি যাবতীয় ঝামেলা মিটিয়েছিল।

অনন্য আজো ভেবে পায় না, হৃৎপিণ্ডে গুলি নিয়ে কিভাবে শিবু দু'শো গজ দৌড়েছিল? আসন্ন মৃত্যুকে শিবু কি একদম বুঝতে পারেনি? মানুষের বাঁচার আগ্রহ, কী রহস্যময়ভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করে যায়, শিবুকে না দেখলে অনন্য জানতে পারতো না। চোখের সামনে শিবুকে মরতে দেখে তুহিন বোবা মেরে গিয়েছিল। তারপর নিরুদ্দেশ হলো। বাড়ি ছাড়ার আগে কয়েকবার মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিল। মানুষের আত্মা, জীবন, মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। মাসিমার ধারণা, তুহিন সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। কোথাও সাধুসন্ত সমাগম হলে মাসিমা খুব উতলা হয়। ভাবে সেখানে তুহিন আছে। চেনা লোকজন, ছেলের বন্ধুদের কাছে গিয়ে তুহিনের খোঁজ করার জন্যে তাগাদা দেয়। অনন্যর ধারণা ছেলের চিন্তায় মাসিমার মাথা বিগড়ে গেছে। খুব স্বাভাবিক। অনন্যর নিজেরও পাগল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সে হয়নি। শহিদ, সন্ন্যাসী, পাগল, কিছুই তার হওয়া হয়নি। কিছু হওয়ার জন্যে যে যোগ্যতা দরকার, তার নেই। আত্মীয়স্বজনের চোখেও সে ব্যর্থ, ভবঘুরে মানুষ। যার অনেক কিছু হওয়ার কথা ছিল, অথচ কিছুই হয়নি, মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে মানুষটা কিভাবে তাল বজায় রেখে চলে, সেটাও এক বিস্ময়! চারপাশের ধিক্কার যখন তাকে অস্থির করে তোলে, তখনই সে শুনতে পায় শিবুর অন্তিম প্রশ্ন, অনুদা আমার বুকে কি লাগল বলো তো?

রক্তের মধ্যে সেই মুহূর্তে কিছু চনমন করে উঠলে, অনন্য বুঝতে পারে, জীবন কখনো পুরোপুরি নিঃশেষ হয় না। এখনো অনেক, অনেকদিন তাকে জাগ্রত, সচেতন থাকতে হবে।

তাই সাতসকালে তুহিনের মা এসে যখন প্রয়াগে যাওয়ার কথা পাড়ল, অনন্য না করতে পারেনি। পাড়ার বিশ্বনাথদা, বেসরকারি সংস্থার বড় অফিসার, সেই সন্ধেতে অফিসের কাজে বোম্বে যাওয়ার কথা ছিল। বোম্বে মেলের ফার্স্ট ক্লাসে, বিশ্বনাথদার সঙ্গে তার এক সহকর্মীর যাওয়ার কথা ছিল। তার ছিল থ্রি টায়ার স্লিপারের টিকিট। সে যেতে পারছে না। তার টিকিটে অনন্য এলাহাবাদ চলে যেতে পারে। বুদ্ধিটা মাসিমাকে বিশ্বনাথদা দিয়েছিল। বিশ্বনাথদা আরো বলেছিল, দেশের সব সাধুকে কুম্ভমেলায় পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে তুহিনও নিশ্চয় আসবে।

ট্রেনের গতি কমে আসছে। চক্রবর্তীমশাই বলছে, দেশের সাধুমুনিরা ঝেঁটিয়ে এখানে আসবে। কুম্ভমেলা হলো সাধুদের মহাসম্মেলন। আগামী বারো বছরের জন্যে এই সম্মেলন থেকে সাধুসমাজের সংবিধান আর আচরণবিধি তৈরি হবে।

বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন থামলো। বিশ্বনাথদার সঙ্গে অনন্যর রাতের খাবার হুকুম করা ছিল খাবার আনার জন্যে অনন্যর উঠতে ইচ্ছে করলো না। মাসিমার মুখ মনে পড়লো। কী করু চেহারা। কলকাতা ছাড়ার আগে মাসিমাকে অনন্য আশ্বাস দিয়েছে, তুহিনকে না নিয়ে ফির না।

এই একটা কথাতে মহিলার দুটো নির্জীব চোখে অলৌকিক খুশি ফুটে উঠতে অনন্য শাি পেয়েছিল। নিজের মায়ের কথা অনন্যর মনে পড়েছিল। কোন্ ছেলেবেলায় মা মারা গেছে মাথায় সিঁদুর মাখানো মায়ের মৃতদেহ খাটিয়ায় তুলে নিয়ে যাওয়ার আবছা স্মৃতি এখনো ম আছে। মা হাসলে গালে টোল পড়তো। মা বলতো, আমি যদি মরে যাই, তুই আমাকে ভু যাবি না তো?

প্রশ্ন শুনে শিশু অনন্য কেঁদে আকুল হতো। গালে টোল ফেলে মা হাসতো। মায়ের মু আজ অনেক চেষ্টাতেও সে মনে করতে পারে না। ভাবে, ভাগ্যিস মা মরে গিয়েছিল!

কী বাছা, খাবেন কী, চক্রবর্তীমশায়ের প্রশ্নে অনন্য সজাগ হয়।

বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি, অনন্য মিথ্যে কথা বলল।

চক্রবর্তীমশাই ছাড়লো না। কলাপাতায় এক বাণ্ডিল লুচি আর আলুর তরকারি এগি দিয়ে বলল, ঠাকুরের প্রসাদ। না বলতে নেই।

কত রাত হলো কে জানে! নিস্তব্ধ অন্ধকারে ট্রেনের চাকার ঝমরঝমর শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে অনন্য নিজের জায়গায় এসে বসলো। বালিশে গোটা শতরঞ্চি পেতে এবার শোয়া দরকার। টানটান হয়ে অনেকে শুয়ে পড়েছে।

চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করে, এলাহাবাদে থাকবেন কোথায়?

অনন্য বলল, পৌঁছে ঠিক করব।

চক্রবর্তী দমে গেল। বলল, অসুবিধে হলে আমাদের ডেরায় চলে আসবেন।

কামরার শেষ প্রান্তে হঠাৎ জনমেজয়বাবুকে দেখে অনন্য অবাক হলো। জনমেজয় তা কলেজের ক্যাশিয়ার। ছাত্রজীবনে জনমেজয়ের কাছ থেকে নানা কাজে সাহায্য পেয়েছে জনমেজয়কে কোনোদিন ধর্মীয় লাইনের লোক মনে হয়নি।

অনন্যকে দেখে জনমেজয় কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, অনন্য তো কেমন আছো? চললে কোথায়?

এলাহাবাদ, অনন্য বলল।

তাহলে ধর্মে তোমার মন গেছে। দেখে ভালো লাগল। আমারও ধর্মে মতি হয়েছে জনমেজয় জানাল, তেজেশানন্দ স্বামীর কাছে মন্ত্র নিয়েছি। চক্রবর্তীমশাই আমার গুরুভাই

চক্রবর্তী মুচকি হাসে। জনমেজয় খেয়াল করে না। নিজের মনে বলল, এমনিতে আ চিরকুমার, বিয়ে করিনি, সন্ন্যাসী। পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে যেতে ভাবলুম, এবার আশ্রয় দরকার গুরু কৃপাহি কেবলম। গুরু ছাড়া আশ্রয় নেই।

ধুতি, পাঞ্জাবি পরা সৌম্যদর্শন, স্বাস্থ্যবান মানুষটা অনেক কথা বলে যায়। অনন্যা দেখিয়ে চক্রবর্তীকে জানায়, ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। হায়ার সেকেন্ডারিতে স্টার পেয়েছিল অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষা দিল না। সব কেমন গুবলেট হয়ে গেল

অনন্য নিশ্চুপ বসে থাকে। জনমেজয় বলল, আমাদের সঙ্গে তুমি থাকতে পার।

কামরার অনেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অনন্য বিব্রত বোধ করে। নিচু গলা

[জ]নমেজয়কে বলল, ঠিকানাতো রাখলুম, অসুবিধে হলে, আপনাদের কাছে যাব।

কামরার আলো অধিকাংশ নিভে গেছে। জ্বলে উঠেছে ঘুমপাড়ানি আলো। আবছা সবুজ [আ]লোয় ডুবে আছে চারপাশ। বাঙ্কের ওপর শতরঞ্চি পেতে অনন্য শুয়ে পড়ল। তুহিন ছাড়া [আ]রও একটা জিনিস তাকে খুঁজে পেতে হবে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে সেই বস্তুটার [প]রিচয় জোর গলায় দিতে পারত। এখন পারে না। কী এক বিভ্রমে সে নিজেই এলোমেলো, [দি]গ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে। সুপ্ত অথচ উন্মুখ এক বীজ, আজও সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই তাড়নাতে [চ]লে আছে।

দুই

সোয়েটার, অলেস্টারে সর্বাঙ্গ ঢেকে দারুণ ঠাণ্ডায় কেষ্টনগরের কর্তা ঠকঠক করে [কাঁ]পছিল। মোটাসোটা ফর্সা গিন্নি তামাশা করে ছড়া কাটল, "আজ বড়ো জার, বুড়োর ভাঙে [হ]াড।"

কর্তার ব্যাজার মুখ অনন্য দেখতে পেল না। বিছানা, বালিশ গুটিয়ে রেখে মুখ ধোয়ার [জ]ন্যে স্টেশনের কলের দিকে সে গেল। বিশাল এলাহাবাদ স্টেশনের ওয়েটিংরুম ছোট নয়। [ল]ম্বা, খোলামেলা হল্ ঘরে, আলো হাওয়া খেলে। কেষ্টনগরের দম্পতি বিস্তর লেপ, কম্বল নিয়ে এসেছে। তারা দুটো কম্বল ধার দেওয়ায় শীতের কামড় থেকে অনন্য রেহাই পেয়েছে। ওয়েটিংরুমে প্রথম রাতটা অনন্যর ভালো কেটেছে। ওয়েটিংরুমে তাকে থাকার বুদ্ধি বিশ্বনাথদা দিয়েছিল। বলেছিল, এমন পরিষ্কার সরকারি দালান থাকতে অন্য জায়গায় যাবি কেন? এখান দিয়ে সব যাত্রী, সাধু-সন্ন্যাসী শহরে ঢুকবে। তাদের ওপর নজর রাখলে তুহিনকে খোঁজার কাজ অনেক সহজ হবে।

বিশ্বনাথদার পরামর্শ অনন্যর মনে ধরেছিল। ওয়েটিংরুমে তখনও বিশেষ যাত্রী সমাগম হয়নি। ঘরের মধ্যে দেওয়াল ঘেঁসে অনন্য আসন পেতেছিল। সেখানে পরিচয় হলো কেষ্টনগরের দম্পতির সঙ্গে। অনন্যর প্রায় মুখোমুখি ট্রাঙ্ক, বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে তাদের বিরাট সংসার , কর্তা-গিন্নি ছাড়া সংসারে তৃতীয় কেউ নেই।

মুখ, হাত ধুয়ে অনন্য ওয়েটিংরুমে ফিরল। দিন সাতেক বাদে বোম্বে থেকে ফেরার সময় বিশ্বনাথদা তাকে তুলে নিয়ে যাবে। আপাতত এক হপ্তা নিরুদ্বিগ্ন। অসুবিধে একটাই। স্টেশন থেকে মেলাশহর তিন-চার মাইল দূর। ঠাণ্ডায় হাঁটতে ভালো লাগে। কিন্তু বেশি হাঁটলে নিদারুণ খিদে পায়। ক্ষুধা নিবৃত্তির বাড়তি পয়সা তার নেই। সে ঠিক করেছে বিনা প্রয়োজনে বেশি হাঁটবে না। সকাল-সন্ধে তুহিনকে খোঁজার পরে শুয়ে বসে কাটাবে।

গতকাল ওয়েটিংরুমে ডেরা গেড়ে, কিছু পরেই মেলা দেখতে বেরিয়েছিল। মেলার আয়তন দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে। পঁচিশ হাজার একর জুড়ে মেলা বসেছে। ধুলো, বালির স্থায়ী মেঘ মেলার আকাশে থমথম করছে। শহরের মুখে কুম্ভদ্বার। মাইল তিনেক পেরিয়ে গঙ্গাদ্বীপ। গঙ্গাদ্বীপের নাম হয়েছে, সাধুকল্প। দেশের যাবতীয় সাধু সেখানে আখড়া খুলে বসেছে। তাদের অনেকের সঙ্গী হয়েছে গৃহী শিষ্যশিষ্যা, ভক্তের দল। তারা কল্পবাসী। লাইনবন্দী সংখ্যাহীন কুটির আর তাঁবু দেখে অনন্য দিশেহারা হয়ে যায়।

কাল অনন্য সাধুকল্পে ঢোকেনি। মেলার জায়গাটা চেনার চেষ্টা করেছিল। কুম্ভদ্বার ছেড়ে

লাল সড়ক ধরে এগোলে চারদিকে খেলনার দোকান। পুতুলনাচওয়ালা ননদ-ভাজের খ
দেখাচ্ছে, 'সীতাবো গুলাবো কী তামাশে'। পুজোর জিনিসের দোকান, সিনেমা, ম্যাজি
চলেছে সমুদ্রতীরে, বালির ওপরে। রাস্তায় অসংখ্য মানুষ, পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক, মেলা কর্মী
অফিস গমগম করছে। 'ভুলা ভাটকা' অফিস থেকে হারিয়ে যাওয়া মেয়ে, পুরুষের নাম মাই
ঘোষণা করা হচ্ছে। ছোট ছোট নিরামিশ হোটেল, দুধের দোকান, হাসপাতাল, পুলিশ না
চারিদিকে ছড়ানো। 'নাকা' মানে থানা। মেলায় ঢোকার মুখে রেলের বুকিং অফিস অ
ডাকঘর। এলাহি ব্যবস্থা। অনন্য শুনলো সামরিক কর্তৃপক্ষ মেলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে
এত বড় মেলা, পিলপিল করছে পুণ্যার্থী, এর মধ্যে তুহিনকে খোঁজার কাজ, কোথা থে
কিভাবে শুরু করবে, অনন্য ভেবে পেল না।

ঘুম থেকে উঠে অনন্য টের পেয়েছিল কাল বিস্তর হেঁটে কোমর আর দু'পায়ে ব
হয়েছে। পায়ের পাতা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত টনটন করছে। অনন্য ঠিক করল, এ বে
বেরোবে না। কেষ্টনগরের স্বামী-স্ত্রী মেলায় যাওয়ার জন্যে তৈরি। অনন্য বেরোচ্ছে না শু
খুশি হয়ে গিন্নি বলল, আমাদের মালপত্র তোমার জিম্মায় রেখে গেলুম।

কম্বল বিছিয়ে অনন্য আবার শুয়ে পড়ল। তখনি এক সাধু আর সাধুনিকে ওয়েটিংরু
ঢুকতে দেখে সে চমকে গেল। চমকালো সাধুকে দেখে। মনে হলো, দাড়িগোঁফে মুখ ঢে
গেরুয়া বসনে তুহিন হাজির হয়েছে। তুহিনের মতো একহারা রোগা চেহারা, ফর্সা রঙ, গভী
চোখে নিষ্পাপ দৃষ্টি। তুহিন ছাড়া কে হতে পারে! কিন্তু না, তুহিন নয়। কোথায় যেন তুহি
সঙ্গে ফারাক আছে। দু'জনের বয়স অল্প। সাধু একবারে কচি। সাধুনি হয়তো সামান্য ব
ত্রিশের মধ্যে। অনন্যর পাশে এক চিলতে খালি জায়গায় তারা আস্তানা গাড়ে। অনন্য চো
বুজে আর এক দফা ঘুমের চেষ্টা করে। মাথার মধ্যে বিভ্রম পাক খায়। তুহিনকে খুঁজতে এসে
তার মুখ পরিষ্কার মনে করতে পারছে না। পাঁচ বছরের ব্যবধানে স্মৃতি থেকে তুহিন মু
গেছে। তুহিনকে সে কোনোদিন খুঁজে পাবে না। হতাশায় টনটন করে উঠলো অনন্যর বু
এরকম নিষ্ঠুর, সত্যকে মেনে নিতে সে রাজি নয়। তুহিনকে খোঁজার জন্যে সে প্রাণপণ চে
করবে। প্রতিটা আখড়ায় গিয়ে তুহিনের নাম ধরে ডাকবে। তুহিন যদি কোথাও থাকে, ত
ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবে না। অনন্য মনে বল পায়। তুহিন তাকে এড়াতে পারবে
এমন ধারণা তাকে চাঙ্গা করে। তখনি সে এক নিরঙ্কুশ সত্যের মুখোমুখি হয়। অ
বোঝে, তুহিনের নাম করে সে নিজেকেই খুঁজতে এসেছে। কয়েকবছর আগের অনন্য না
এক প্রাণবন্ত যুবককে আজকের বাউণ্ডুলে অনন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে পুরনো অভি
কোনোমতে ভুলতে পারছে না। অনন্য জানে, যে কোনো তরুণ সাধুকে দেখে তার তুহি
মনে হবে। তবু তুহিনকে খোঁজার কাজে ফাঁকি দেবে না। তুহিনকে তার মায়ের কাছে পৌঁ
দিতে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঝাপসা চিন্তার মধ্যে অনন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার কানের কাছে কেউ বলল, কি
খাওয়া-দাওয়া হবে না?

অনন্য ধড়ফড় করে কম্বলের ওপর উঠে বসে দেখলো, সাধুনি তার দিকে তাকিয়ে হাস
সাধুর চোখে কৌতুকের ঝিলিক।

অনন্যর ঘুমজড়ানো চোখের দিকে তাকিয়ে সাধুনি বলল, দেখছ কি? খেতে এস।

সকালে আমি খেয়ে নিয়েছি, অনন্য জানালো।

কী খেয়েছ, হাওয়া? সাধুনি খিলখিল করে হাসে।

ওয়েটিংরুমের সকলে তাকিয়ে আছে। মহারাষ্ট্রের সদানন্দজী বলল, মাতাজী কী প্রসাদ, খা লিজিয়ে বাবু।

অনন্য কথা না বাড়িয়ে সাধুযুগলের সঙ্গে খেতে বসে গেল। খিদে কম পায়নি। উল্টোদিকে কেষ্টনগরের দম্পতি পরিপাটি করে সাজিয়ে খেতে বসেছে। সরু চাল, গাওয়া ঘি থেকে শুরু করে ছড়া তেঁতুলের আচার, পাতের সামনে সাজানো।

সংকোচ নিয়ে সাধু সাধুনির সঙ্গে অনন্য খেতে বসল। এক পলক দেখে, কী করে তার হাভাতে অবস্থা সকলে বুঝে যায়, অনন্য ধরতে পারে না। মাথা নিচু করে আলু, ফুলকপি, কড়াইশুঁটি মেশানো জমাট খিচুড়ি মুখে তুলতে থাকে। অসাধারণ রান্না। নিমেষে অনন্যর পাত খালি হয়ে যায়। অনন্য ভাবে, ট্রেনে চাপার পর থেকে বারবার মুখের সামনে কী রকম অবলীলায় খাদ্য এসে যাচ্ছে! এতোটা সে প্রত্যাশা করেনি। অনন্য জানে, মানুষের সঙ্গে থাকলে মানুষ মরে না। অনেক দুঃসময়ে মানুষ তাকে আশ্রয় আর খাবার দিয়ে বাঁচিয়েছে। পৃথিবীতে এখনো এরকম মানুষ আছে।

খাওয়ার মধ্যে সাধুদম্পতির সঙ্গে অনন্যর পরিচয় কিছুটা ঘন হলো। সাধুর নাম তড়িৎ, সাধুনির আলো, আলোমা। আসছে, আসাম থেকে। মকর সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে সঙ্গমে তাদের স্নান করার আদেশ দিয়েছেন গুরু। গুরু আর আশ্রম সম্বন্ধে তাদের সব কথা অনন্যর কানে যায় না। শুধু মাঝে মাঝে তাদের দু'চোখে এক আশ্চর্য দীপ্তি দেখে সচকিত হয়। বিশেষ করে আলোমার অনবদ্য হাসিতে অনন্যর হৃৎপিণ্ড নড়ে ওঠে।

হাত মুখ ধোয়ার সময় আলোমা বলল, এই ক'টা দিন তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে।

অনন্য বলল, ভীষণ লজ্জা করবে আমার।

আলোমা আবার হাসে। বিদ্যুৎ চমকানোর মতো সেই হাসি। আলোমা বলল, সাধুসন্তের সঙ্গে লজ্জা কী! 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।'

বিনা পয়সায় খেতে পেয়ে অনন্যর সিগারেট ফুঁকতে ইচ্ছে হলো। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানার সময়ে কেষ্টনগরের গিন্নির সঙ্গে দেখা হলো।

কী বাছা, খাওয়া হলো, গিন্নি জিজ্ঞেস করলো।

অনন্য বলল, হ্যাঁ।

বিকেলে আমাদের সঙ্গে খেও, নিমন্ত্রণ করে গিন্নি বলল, আমরা থাকতে তুমি আনকা জায়গায় খাবে কেন? তাছাড়া এক সঙ্গে ট্রেনে আমরা এসেছি।

হাতে পানের বাটা থেকে সুন্দর করে সাজা এক খিলি মিঠে পান মহিলা এগিয়ে দিল। অনন্যর মনে হলো, জাদুবলে তার ভাগ্য খুলে গেছে। অজানা দূরদেশে এতো খাতির পাওয়ার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

আলোমা যে বিকেলে খেতে বলছে, সঙ্কোচের সঙ্গে অনন্য জানাল।

বড় বড় চোখ করে মহিলা অনন্যর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নিচু গলায় বলল, ভেক ধরলেই সন্নিসি হয় না। পোড়াকপালি মেয়েটাকে দেখেই বুঝেছি, ওরা জাল সন্নিসি। ওদের জাতপাতের ঠিক নেই।

অনন্য হতভম্ব। কথা খুঁজে পেল না।

তিন

ওয়েটিংরুমে ফিরে অনন্য দেখলো তড়িৎ বই পড়ছে। নাম, সৎগুরু প্রসঙ্গ। ছুঁচ, সুতো হাতে একটা গেরুয়া চাদর নিয়ে আলোমা বসেছে সেলাইয়ে। কেষ্টনগরের দুই মূর্তি মাথা পর্যন্ত কম্বল ঢেকে শয্যাশায়ী। কর্তা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। গিন্নি কম্বল ফাঁক করে নজর রাখছে আলোমার ওপর। অনন্যর সঙ্গে চোখাচোখি হতে নিমেষে মাথায় কম্বল চাপা দিল। বিছানা গুটিয়ে রেখে অনন্য বেরোবার জন্যে তৈরি হলো। নীল আকাশ। রোদের তেজ বাড়ার সঙ্গে শীতের ধার কমেছে। পেতলের থালায় কামানের গোলার মতো ছাতুর তাল আর টকঝাল আচার নিয়ে সদানন্দজী খেতে বসেছে। অনন্যকে ইসারায় খেতে ডাকল।

অনন্য হাসে। সদানন্দজী ছড়া বলল, পাও ভর শতুয়া / আধ পাও গুড় / আওয়ল হোকি / যাওয়বা দূর।

অন্যন্যকে আলোমা জিজ্ঞেস করলো কতদূর যাবে?

মেলা পর্যন্ত, অনন্য জানালো।

কাল একসঙ্গে বেরবো, আলো মা বলল।

অনন্য রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। স্বামী তেজেশানন্দের ডেরা ছুঁয়ে সাধুকল্পে যাবে সে। জনমেজয় আর চক্রবর্তীমশাই-এর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত। স্বামী তেজেশানন্দের আশ্রম আর ভক্তদের সম্পর্কে তার কৌতূহল আছে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বারবার আলো মা-র মুখ মনে পড়ছে। বিশেষ করে আলো মা-র উজ্জ্বল চোখ, সাবলীল ভঙ্গি, তাকে মুগ্ধ করেছে। অল্প বয়সে এই দু'জন মানুষ হঠাৎ বৈরাগী সাজল কোন দুঃখে? দেখে তো মনে হয়, নববিবাহিত দম্পতি। অথচ হনিমুনে না গিয়ে গেরুয়া পরে সন্ন্যাস নিয়েছে। রহস্যময় জীবন। হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় হয়তো তুহিনের মতো ওদের অস্তিত্বেও ভাঙচুর ঘটে গেছে। বিবাহিত জীবন পার্থিব সুখ বিস্বাদ লেগেছে। জীবন, মৃত্যু আর আত্মার গূঢ়তত্ত্ব উন্মোচনের জন্যে সংসার ছেড়ে বিবাগি হয়েছে। দু'জন যে নিছক তীর্থযাত্রী নয়, অনন্য বুঝতে পেরেছে।

সিটি রোড, গান্ধী রোড, চৌকে পিলপিল করছে মানুষ। হুলুস্থুল পড়ে গেছে সেখানে। বাদামি ধুলোর ঝড় উঠেছে। হাজার হাজার গ্রাম্য জোয়ান, শাদা কুর্তা পরে, মাথায় শাদা পাগড়ি বেঁধে দূর-দূরান্তের গাঁ-গঞ্জ থেকে এসে জড়ো হচ্ছে। কাঁধে লাঠি, লাঠির ডগায় ছোট বোঁচকা ঝুলছে। সব একরকম সাজ। কেউ কেউ পায়ের নাগরা কাঁধের লাঠিতে বেঁধে নিয়েছে। নাগরার আকারও দশাসই।

গান্ধী রোডের শেষ প্রান্তে লাল সড়ক আর কালী সড়ক মোড়ের একটু আগে বাঁ-হাতি গলির মধ্যে যে বাড়িতে শিষ্য-ভক্ত নিয়ে তেজেশানন্দ ডেরা গেড়েছে, সেটা খুঁজে বার করতে অনন্যর অসুবিধে হলো না। বাড়িটা পুরনো, দরজার পাশে খোলা ড্রেনে ভনভন করছে মাছি। চারপাশের বাড়িগুলোর হতশ্রী চেহারা দেখে বোঝা যায়, নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়া। বাড়ির ভেতর থেকে খোল-করতাল সহযোগে সমবেত গলায় কীর্তনের শব্দ আসছে। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনন্য দ্বিধায় পড়ল। দরজার পাশে কয়েকজন লোক গল্প করছে। সবাই অচেনা। অনন্যকে দেখে একতলার ছাদে, পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো, নানা বয়সি একঝাঁক তরুণী। তাদের চোখে চোখে বার্তা ছড়িয়ে গেল। অনন্যর মনে হলো ট্রেনের কামরায় দু-একজনকে

দেখেছে। স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যাদের মেয়ে, বোন, ভাইঝি, বোনঝির দল। কীর্তনের আসরে কিছু সময় কাটিয়ে এলাহাবাদের আকাশে পৌষের সন্ধ্যে দেখার জন্যে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে। আধডজন তরুণীর দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে অনন্য ঘামছিল।

ভায়া যে, কতক্ষণ? চেনা গলা, চেনা মুখ চক্রবর্তীমশাইকে দেখে অনন্য ধাতস্থ হলো। ছাদের ওপর বহু কণ্ঠের কলকল শব্দ বয়ে চলেছে। চক্রবর্তীমশাই-এর সঙ্গে অনন্য কীর্তনের আসরে এসে দাঁড়াল। ধূপ-ধুনো ফুল-চন্দনের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে আছে।

লম্বা-চওড়া, গৌরবর্ণ স্বামী তেজেশানন্দের পোশাকে, আচরণে রাজকীয় ভঙ্গি। দামি সিল্কের গেরুয়া বসন, দু'হাতে জড়োয়ার অলঙ্কার, জটাজুট শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, দু'চোখের দৃষ্টিতে তীব্র সম্মোহন।

চক্রবর্তী নিঃশব্দে আঙুল তুলে জনমেজয়কে দেখাল। দু'চোখ বুজে মাথা নিচু করে জনমেজয় বসে আছে। কীর্তনের করুণ সুর ভক্ত হৃদয়ের গভীরে আছড়ে পড়ছে।

বছর বাইশ-তেইশের একজন ছেলের ভর হয়েছে। আসরের মধ্যে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মানিনী রাধা হয়ে গেছে সে। তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। চোখ মুখের ভাবভঙ্গি, দেহের উচাটন কাঁপুনিতে বোঝা যায় সে বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আধবোজা চোখ, দু'হাতে সোনার ছোট খঞ্জনি নিয়ে স্বামীজী কীর্তনে গলা দিয়েছে। তন্ময়, সমাহিত মূর্তি। মাথা ধীর ছন্দে দুলছে। স্বামীজীর ডান পাশে, দরজার মুখোমুখি বসে এক মহিলা হাপুস নয়নে কাঁদছে। বুদ্ধিদীপ্ত, ফর্সা চেহারা, শরীরে সবে মেদ জমতে শুরু করেছে। বছর চল্লিশ বয়স। কালোপাড় সাদা তাঁতের শাড়িতে মোড়া শরীরে স্নিগ্ধতা। মহিলার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। হাতে একগাছা সোনার বালা আর পুরুষদের ঘড়ি। পলকহীন চোখে স্বামীজীর দিকে সে তাকিয়ে আছে। জলে ভেসে যাচ্ছে দু'চোখ। এত আন্তরিক আবেগ অনন্য আগে দেখেনি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে। রাধাভাবাবিষ্ট ছেলেটা হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে যেতে শিষ্যরা হরিধ্বনি দিল। কেউ উঠলো না। তরুণীদের মধ্যে জনাতিনেক ছাদ থেকে কীর্তনের আসরে ফিরে এসেছে। ভাবাবিষ্ট রাধাকে দেখে মুখ আড়াল করে একজন মুচকি হাসতে অনন্যর ঘোর কেটে গেল। জনমেজয় চোখ খুলে অনন্যকে দেখে হাতের ইঙ্গিতে দাঁড়াতে বলল।

দিন শেষ হয়ে আবছা অন্ধকার নামছে। ঘরের আলো অনন্য আসার আগে থেকে জ্বলছে। সন্তর্পণে ভিড় ঠেলে জনমেজয় অনন্যর সামনে এসে দাঁড়াল। বয়স্কা এক মহিলা বেহুঁশ ছেলেটার মাথা কোলে তুলে নিয়ে চুলে হাত বুলোচ্ছে।

কোথায় উঠেছ, জনমেজয় জানতে চাইল।

স্টেশনের ওয়েটিংরুমে, অনন্য বলল।

চক্রবর্তী কোথাও সরে পড়েছে। জনমেজয়ের সঙ্গে অনন্য ছাদে এসে দাঁড়াল। চকমেলানো বিরাট ছাতের অর্ধেক জুড়ে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। আকাশে চাপচাপ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

জনমেজয়কে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। প্রয়াগতীর্থের অমৃত খেয়ে লোকটা যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

গান শুরু হয়েছে আসরে। অন্ধকার ঘন হচ্ছে। এক মিনিট দাঁড়াও, আসছি, বলে জনমেজয় ভেতরে চলে গেল।

অনন্য নজর করে, ছাদের কোণে মেয়ের দল একভাবে জটলা করছে। জনমেজয় চলে

যেতে মেয়েদের গলার শব্দ, হাসি জোরালো হলো। শ্যামলা এক তরুণীর চোখে অনন্যর চো
পড়তে মেয়েটির সখিরা হেসে উঠল। অস্বস্তিতে ছাদ ছেড়ে অনন্য সরে যেতে চাইল
জনমেজয় সেই যে গেছে, পাত্তা নেই। ডানদিকে সরু বারান্দা, লোকজন নেই। অনন্য
বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আলো না থাকায় ধোঁয়াটে অন্ধকারে চারপাশ ঝাপসা দেখাচ্ছে।
পাশে বাথরুম, কলঘর আছে। সাবেক আমলের ছড়ানো বাড়ি। ডানহাতে এক চিলতে প
ধরে অনন্য দু'পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। বাঁপাশে দরজাবন্ধ ঘর। বন্ধ ঘরের সামনে জনমেজ
অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভিতর কেউ ফুলে ফুলে কাঁদছে। মেয়েলি গলা
ফোঁপানি। অনন্য বিস্মিত, নির্বাক। বন্ধ দরজায় জনমেজয় ধীরে ধীরে টোকা দিল। অনন
দাঁড়াতে ভরসা পেল না। ঘটনাটা অদ্ভুত লাগল। কে কাঁদছে, কেন কাঁদছে, বুঝতে পারলে
না। অবিবাহিত জনমেজয়ের সঙ্গে মহিলার সম্পর্ক কী। গুটিগুটি অনন্য আবার কীর্তনে
আসরে এসে দাঁড়াল।

চোখ বুজে তেজেশানন্দ স্থির হয়ে বসে আছে। শাদা তাঁতের শাড়ি মহিলা আসরে নেই
ভাবাবিষ্ট ছেলেকে ধরে বয়স্কা মহিলা শুশ্রূষা করছে।

শাদা তাঁত শাড়ি মহিলা ঘরে ঢোকে। ফোলাফোলা দু'টো চোখে জলের চিহ্ন নেই। ধো
মোছা মুখ চোখ। তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। পেছন থেকে অনন্যর কাঁধ কেউ স্পর্শ করল
অনন্য দেখল জনমেজয়। বন্ধ ঘরে অদেখা মহিলাকে সনাক্ত করতে তার অসুবিধে হলো ন
তাজ্জব হয়ে গেল সে।

জনমেজয় বলল, তোমার সঙ্গে আমি মেলায় যাব।

চার

ভারতীয় রেলের বিশাল প্যাভিলিয়নের সামনে দাঁড়িয়ে জনমেজয় বলল, চল, বুকি
কাউন্টারে একবার ঢুঁ দিয়ে আসি।

কলকাতায় ফিরবেন কবে, অনন্য জানতে চাইল।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সংক্রান্তির স্নান করবেন না?

উত্তর না দিয়ে জনমেজয় অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কাউন্টারে লোকজন কম। নতুন বুকি
অফিসের খবর পুণ্যার্থীরা এখনো পায়নি। জনাদশেক লোকের পিছনে জনমেজয় দাঁড়ি
যায়। শুকনো চেহারার মাঝবয়সি এক বাঙালি ভদ্রলোক কাউন্টারে বসেছে। বড় শ্লথ ত
কাজের গতি। লাইন যেন এগোতে চায় না। অনন্য অধৈর্য বোধ করে। তুহিনকে খোঁজার কা
এখনি শুরু করা উচিত। অপচয় করার মতো সময় হাতে নেই। তেজেশানন্দের শিষ্য হওয়
লোক তুহিন নয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও যারা অচ্ছুৎ, হৃতসর্বস্ব, প্রোলেতারিয়েত, এমন দলে
সঙ্গে তুহিনের মিশে থাকার সম্ভাবনা বেশি। তবু সব সম্প্রদায়ের আখড়াতে খোঁজ করে
হবে।

জনমেজয়কে টিকিট দিতে দিতে বুকিংবাবু নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছে, পাঁচ
ডিসেম্বর থেকে স্রেফ পুরি আর সবজি খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল। ভাতের মুখ দেখিনি
চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দিচ্ছি। এক হপ্তা হয়ে গেল, তবু কর্তারা দ্বিতীয় লোক পাঠায়নি। ভো

খুন অবস্থা।

এলোমেলো রুক্ষ চুল, শুকনো চেহারা, কোটরে বসা চোখ, অসহায় মানুষটাকে দেখে নন্যর মনে হলো, তার কথায় একবিন্দু মিথ্যে নেই। নানা জাতের সাধু চলেছে সাধুকল্পের কে। বাঁদর কাঁধে সাধু, ভালুকের বাচ্চা কোলে সাধু, মাফলারের মতন গলায় পাইথন সাপ ড়ানো সাধু, সাধুর ছড়াছড়ি। দুই ঠ্যাঙে দড়ি বাঁধা 'টানা পাখা' সাধু ঝুলছে আমগাছের ালে। পা ওপরে, মুণ্ডু নিচে, করে শাঁখ বাজাচ্ছে। গাছের তলায় গনগনে আগুন জ্বলছে। তার লায় দড়ি বেঁধে এক চেলা দূরে বসে টানা পাখার মতো দোল খাওয়াচ্ছে, আর বলছে, সাধু জাওয়ে শঙ্খ।

এ সাধু হেঁট মুণ্ডেই লুচি এবং পায়েস খায়। চেলা খাইয়ে দেয়।

জনমেজয় চুপচাপ। অনন্য বলল, আপনাদের গুরুজীর বয়স বোধহয় খুব কম। তাই না?

বিয়াল্লিশ, জনমেজয় জানাল, গুরুজী অঙ্কে এম. এস. সি। কলকাতার এক কলেজে কিছুদিন পড়িয়েছেন।

অনন্য অবাক হলো। দুজনে চুপচাপ হাঁটছে। বন্ধ দরজায় জনমেজয়ের টোকা দেওয়ার কারণ জানতে অনন্য সুযোগ খুঁজছে।

ভদ্রমহিলা কাঁদছিলেন কেন? আনাড়ির মতো প্রশ্নটা অনন্য পেড়ে ফেলল।

জনমেজয় গম্ভীর হলো, না বোঝার ভান করল। জানতে চাইল, কোন মহিলা?

কালোপাড়, শাদা শাড়ি, অনন্য বলল।

জনমেজয় বলল, বাসবী। গুরুজীর পুরনো শিষ্যা। কীর্তন শুনলে নিজেকে সামলাতে পারে না।

জনমেজয় কথা শেষ করল।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জনমেজয় বলল, বাসবী ছিল গুরুদেবের সহপাঠিনী। কলেজে একসঙ্গে পড়ত।

অনন্য শুনে যায়। এক মুহূর্ত চুপ থেকে জনমেজয় বলল, বাসবী এখন আমাদের কলেজে গ্রন্থাগারিক। তোমরা কলেজ ছাড়ার বছর দুই বাদে চাকরিটা পায়। কলেজে আমিই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলুম।

ওনার সুবাদেই কি দীক্ষা নিলেন, অনন্য প্রশ্ন করে।

থতমত খেয়ে জনমেজয় বলল, কিছুটা তাই। আমি তখন একটা আশ্রয় খুঁজছিলুম। সব মানুষের একটা আশ্রয় দরকার। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম এমনকি, স্ত্রী ছেলেমেয়ে, মানুষের আশ্রয়। কিছু আঁকড়ে বেঁচে থাকার নামই আশ্রয়, অবলম্বন। অবলম্বনহীন মানুষ শূন্য হয়ে যায়।

জনমেজয় বলল, বাসবী আমার গাঁয়ের মেয়ে। দু' পরিবারে বন্ধুত্ব ছিল। তারপর দেশভাগ, ছাড়াছাড়ি। মেয়েটার জীবনে অনেক দুঃখ গেছে। কলকাতায় এসে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিল। তারপর বিয়ে হয়। স্বামীর নাম অবিনাশ। অবিনাশ অদ্ভুত, বিয়ের মাস তিন বাদে, খবর না দিয়ে উধাও হলো। অবিনাশের দেশের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে বাসবীর বাড়ির লোক জানতে পারল, সেই নামে গাঁয়ে কেউ কোনদিন ছিল না। স্বামী বস্তুটা প্রায় ভোজবাজির মতো বাসবীর জীবনে এসে নিমেষে মিলিয়ে গেল। বাসবী খুব ঘা খেয়েছিল। তার জীবনের প্রচলিত নক্সা সেই থেকে বদলে গেল। গুরুজী ছাড়া এখন কাউকে বিশ্বাস করে না।

আপনাকেও নয়? অনন্যর মুখ ফসকে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

জনমেজয় সম্বিত ফিরে পেল। বেশি কথা বলে ফেলার জন্যে লজ্জায় চুপ হয়ে গেল। প্রশ্নটা না শোনার ভান করে, দু'সারি আখড়ার মাঝখানের বালি ঢাকা পথ ধরে চুপচাপ হাঁটতে থাকল। অন্ধকার ঘন হতে আখড়াগুলোতে জমজমাট ভিড় লেগেছে। জটাজুটধারী ভস্মলোচন সাধুদের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে অনন্যর বুক ছমছম করছে। বদরাগী দুর্বাসা আর হিংসুটে নারদের কাহিনী বোধহয় এর কারণ। প্রত্যেকটা আখড়ার সামনে অনন্য দাঁড়াচ্ছে, সন্ধানী চোখে আখড়ার ভেতরে খোঁজ করছে। তার দৃষ্টির অর্থ জনমেজয় বুঝতে পারে না। শুধু দেখে প্রত্যাশায় টলমল করছে অনন্যর চোখ। সন্ন্যাসী আখড়া, বৈবাগী আখড়া, নির্মোহী আখড়া, উদাসীন আখড়া পেরিয়ে দু'জন হাজির হলো নিরঞ্জনী আখড়ার সামনে। এটা নাগা সন্ন্যাসীদের আড্ডা। বিশাল ধুনি থেকে ছড়িয়ে পড়ছে হলুদ আলো ধুলো, ছাই মাখা উলঙ্গ সাধুদের অলৌকিক দেখাচ্ছে। ছন্নছাড়া নাগা সন্ন্যাসীদেব দেখে অনন্য মনে জোর পায়, তুহিনের হদিশ হয়তো এবার পাওয়া যাবে। মোটা মোটা কাঠের ধুনিতে ধিকিধিকি জ্বলছে আগুন। ধুনি ঘিরে বসে আছে পাঁচ সাতজন নাগা সাধু। কারো পরনে এক টুকরো কৌপিন, বেশিরভাগ উদাম, উলঙ্গ। একজন সন্ন্যাসীর লিঙ্গের মুখ রুপো দিয়ে বাঁধানো। শরীর নিরাবরণ হলে কী হবে, অনেকের কবজিতে হাতঘড়ি বাঁধা। মাথার কাছে ট্রানজিস্টর খুলে এক নাঙ্গা বাবা, বিবিধভারতীতে ছায়াছবির গান শুনছে। বিচিত্র ঘটনা আর দৃশ্যে অনন্য বুঁদ হয়ে যায়। অপার্থিব এই পৃথিবীতে কোথাও তুহিন আছে, এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তুহিনের মুখ অনেককাল পরে স্পষ্টভাবে মনে আনার চেষ্টা করে। রোগা, লম্বা চেহারা, ছুঁচলো চিবুক, পাতলা ঠোঁট, সরু দু'চোখে গভীর দৃষ্টি, সুখে দুঃখে কত দিন রাত তুহিনের সঙ্গে কেটেছে হিসেব নেই। তুহিনের মুখ আজ স্মৃতিতে পরিষ্কার আনতে পারছে না। ঘোলাটে, ঝাপসা হয়ে গেছে সেই মুখ। তুহিনের বাঁ গালে কি একটা বড় জরুল ছিল? দুচোখের জমি ছিল ফিকে বাদামী? অনন্যর ভাবনা তালগোল পাকিয়ে যায়। বিদ্যুৎচমকের মতো মনের মধ্যে সংশয় ঝিলিক দেয়। তুহিন বেঁচে আছে তো? মাঝখানে একবার পাড়ায় গুজব রটেছিল, তুহিন মারা গেছে। কোথায় যেন বেওয়ারিশ লাশের মধ্যে তুহিনের মৃতদেহ ছিল। কিন্তু তুহিনের মৃতদেহ আজ পর্যন্ত চেনাজানা কেউ দেখেনি। অনন্যর ধারণা, তুহিন মরেনি। যার মৃত্যু নিয়ে এত গুজব রটে, সে সহজে মরে না।

এক নাগা সন্ন্যাসীকে ঘিরে বিরাট আসর বসেছে। মাথায় জটা, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ নিয়ে সাধু অজিন আসনে বসে আছে। ছাই মাখা লম্বা, রোগা শরীর অদৃশ্য ঢেউ লেগে ক্রমাগত দুলছে। সাধুর গলায় হাড় আর রুদ্রাক্ষের মালা। দর্শনার্থীদের ভিড়ের বহর দেখে ধরা যায় সাধুটি বড় মাপের যোগী। ঘোর লাগা দু'চোখের জমি টকটকে লাল।

চেলারা জায়গা করে জনমেজয়, অনন্যকে আসরে বসিয়ে দিল। আখরোটের মতো চেহারা, খয়েরি রঙের একটা শক্ত বস্তু ভেঙে কলকে সাজা হচ্ছে। নিচু গলায় জনমেজয় বলল, হাসিস্।

চারপাশের সাধু সন্ন্যাসীদের অনন্য খুঁটিয়ে দেখছে। অচেনা এই ভিড়ের মধ্যে তুহিনের চেনা মুখটা কি কোথাও লুকিয়ে আছে? গুরুর এক চেলার একটা পা আমূল কাটা। রাশি রাশি চারমিনার সিগারেট সামনে নিয়ে সে বসে আছে। সিগারেটের মশলা বার করে তার মধ্যে গাঁজা ঠাসছে।

এক চেলা ছিলিমে আগুন দিয়ে বাবাজীর হাতে তুলে দিল। মারো দম, লাগাও গম, গুরু চিৎকার করে উঠলো। তারপর কষে টান লাগালো। কলকের মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। একজন মাঝবয়সি হিন্দুস্থানি অনন্যর কানে মুখ রেখে বলল, যব গাঁজড়চি সাধু বড়ি জোরসে ছিলিম পিতা হায়, তব ফটসে ছিলিম ফাট যাতা হ্যায়।

কথাটা ঠিক। অনন্য দেখলো ধুনির চারপাশে লম্বা, ফাটা ছিলিম পড়ে আছে। গুরুর প্রসাদি ছিলিম হাতে হাতে ফিরছে। জনমেজয়কে হাসিস টানতে দেখে অনন্য অবাক হলো। জনমেজয়ের হাত থেকে ছিলিম গেল ল্যাংড়া চেলার কাছে। দলে দলে সাধারণ মানুষ এসে গুরুজীকে প্রণাম করছে। গুরুর সামনে নোট আর খুচরো পয়সার পাহাড়। দু'আঙুলে এক চিমটে ধুনির ছাই নিয়ে গুরুজী দিচ্ছে ভক্তদের হাতে। পরম ভক্তিভরে বুকে কপালে ছাই ঠেকিয়ে কেউ খাচ্ছে, কেউ পকেটে পুরছে। গুরুর হাতে গাঁজা ভর্তি সিগারেট দিল চেলা। সামনে জড়ো করা প্রণামীর স্তূপ থেকে একটা দশ টাকার নোট তুলে ধুনির আগুনে সেটা জ্বেলে গুরু সিগারেট ধরালো। আধপোড়া নোট ফেলে দিল জ্বলন্ত ধুনিতে। গাঁজা, হাসিসের গন্ধে আখড়ার বাতাস নেশাতুর হয়ে ওঠে।

গুরুর সামনে যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে কোট, প্যান্ট, টাই পরা এক কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল।

গুরুকে প্রণাম করে যুবতী নিচু গলায় কিছু বলল। মহিলার পিছনে দাঁড়ানো স্বামীর দিকে অর্ধমুদ্রিত চোখে তাকিয়ে গুরু হাঁক পাড়ল, তু মরদ হো?

ঘাবড়ে গিয়ে স্বামী তোতলাতে থাকলো। দু'হাত জুড়ে কিছু বলল। তার কথায় সন্ন্যাসী কান দিল না। শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় বলল, প্রজনঃ সর্বভূতানাম উপস্থ অধ্যাত্মম উচ্যতে। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে উপস্থই সংযোগের সেতু। ধুনির একমুঠো ছাই যুবতীর হাতে দিয়ে বলল, খা লেও। বাদ প্রয়াগ মে নাহানে পড়েগা।

মুঠিভর্তি ছাই মেয়েটি গপ করে গিলে ফেললো। অনন্য দেখলো মেয়েটির চোখে প্রত্যাশা ঝিকমিক করছে। আসন্ন এক জাতকের কলকণ্ঠ বোধহয় শুনতে পাচ্ছে।

নেশা আর আগুনের তাপে জনমেজয় ঘামছে। ধোঁয়ার চিকে ঢাকা আখড়া এখন রহস্যময় লাগছে। অলৌকিক শক্তি পুণ্যার্থীদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। দেশকাল, পৃথিবী, মানুষ, গ্রহনক্ষত্রখচিত পৃথিবীকে অনন্যর মায়া ভাবতে ইচ্ছে হয়। ধুনির লকলকে হলুদ শিখায় নাগা সন্ন্যাসীকে অপার্থিব দেখাচ্ছে।

জপের মালা হাতে সন্ন্যাসী হাঁক ছাড়ে, অলখ।

তারপর টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় ভজন শুরু করে। 'হিমালয় মে শঙ্কর ধ্যান করতা হুঁ, গুরু দত্তাত্রিজী নাম করতা হুঁ।' চেলারাও ডমরু, পিনাক নিয়ে তৈরি হয়ে গুরুর সঙ্গে সুর মেলাল।

একঘেয়ে সুর বাজনার থেকে ঝিমুনি এসে অনন্যর চেতনা আচ্ছন্ন করে দেয়। সুরের সঙ্গে ধীর চালে জনমেজয় দুলতে থাকে।

কয়েক মিনিট পরে জনমেজয়কে ভেতরে রেখে অনন্য আখড়ার বাইরে এসে দাঁড়াল। একা হাঁটতে ভালো লাগছে। সামনে পাঞ্জাবি সন্তদের আখড়া। সন্তদের বিশাল ভুঁড়ি, গদার মতো হাত পা, লাল দু'চোখে ভ্রূকুটি। জনাচারেক সন্ত ধুনি জ্বেলে বসেছে। হাতের চেটোয় গাঁজা ডলছে একজন। মুখ আটকানো সাত আটটা চটের বস্তার দিকে ভাল করে নজর চালিয়ে

অনন্য বুঝতে পারে, সেগুলো আসলে বস্তাবন্দী সন্ত। বস্তার বাইরে শুধু মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। রাত বেড়েছে। আরো দু'চার জায়গায় হারানো বন্ধুর তল্লাশ চালিয়ে অনন্য স্টেশনে ফেরা ঠিক করল। বিকট ঠাণ্ডায় খোলা রাস্তাতে অসংখ্য মানুষ ঘুমোচ্ছে। বিছানা বলতে পুরনো কাঁথাকানি ছাড়া কিছু নেই। স্রেফ গামছা বিছিয়ে তাল পাকিয়ে অনেকে নাক ডাকছে। গাদাগাদি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে শীত আটকাচ্ছে। ঘুমন্ত মুখে পাপমুক্তির নিবিড় প্রশান্তি। ভিখিরিরা জেগে আছে। মেলার অর্ধেক লোক ভিখিরি, নিরন্ন মানুষ।

পাঁচ

অন্ধকার থাকতে অনন্য বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। চারপাশ নিঝুম, চুপচাপ। তিন দিনে ওয়েটিংরুমে ভিড় বেড়ে প্রায় গাদাগাদি অবস্থা। আলো-মার বিছানার দিকে তাকিয়ে অনন্য আশ্চর্য হলো। ঘরের উজ্জ্বল আলোর নিচে নিজের বিছানায় বসে আলোমা ধ্যানমগ্ন, পদ্মাসনে, ঋজু, দীপ্ত ভঙ্গি। ঘন কালো এলো চুলের জটা বুকে পিঠে ছড়ানো। গেরুয়া ঢাকা শান্ত শরীর দেখে মনে হয় তপস্বিনী পার্বতী কঠিন ব্রতে ডুবে আছে। অনন্য নিঃশব্দে বাইরে এসে দাঁড়াল। ধুধু ফাঁকা লম্বা প্ল্যাটফর্ম, অসহায়ের মতো পড়ে আছে। অনন্যর বুকের ভেতরটা অকারণে মুচড়ে উঠলো।

শরীরে কম্বল জড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দাঁড়াল সে।

কাল রাতে স্টেশন চত্বরে পাথরের বেদির ওপর বসে তড়িৎ আর আলোমার সঙ্গে অনেক সময় গল্প করেছে। প্রথম দু'দিনের জড়তা কমে গেলেও অনন্য পুরোপুরি সহজ হতে পারেনি।

সারাদিন তেজেশানন্দের আখড়ায় পড়ে থাকো কেন, হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিল আলোমা।

সারাদিন তো থাকি না, অনন্য কৈফিয়ৎ দিয়েছিল, বেশি সময় কাটে মেলাতে।

কী জানি বাপু, তোমার নজর দেখে মনে হয়, তেজেশানন্দের আখড়ায় মনের মানুষকে রেখে এসেছো, আলোমা বলল।

ধ্যাৎ, অনন্য বলল, সব মহিলার এক রা। সন্ন্যাসিনী হয়েও রেহাই নেই।

আলোমা দমলো না। জিজ্ঞেস করলো, বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

সত্যি কথাটা অনন্য বলতে পারল না। পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনিই বা সন্ন্যাসী হলেন কেন?

তড়িৎ গম্ভীর হয়ে গেলেও চিবুকে টোল ফেলে হেসে আলো মা বলল, সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা বলতে নেই।

বেশ মজা, অনন্য খোঁচা দিল, গৃহীদের সব কথা শুনে নেবেন। অথচ নিজেদের সম্পর্কে কিছু ভাঙবেন না।

অন্ধকারে আবার আলোমা-র হাসির শব্দ শোনা গিয়েছিল। আলোমা বলেছিল, তা নয়। বড় কিছুর জন্যে যারা সংসার ছাড়ে, তাদের পুরনো কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। স্মৃতির মায়া না কাটালে অভীষ্ট মেলে না।

বানানো কথা, অনন্য তর্ক তুলেছিল, বুকের মধ্যে মায়া না থাকলে পৃথিবীতে আমি একদিনও বাঁচতে চাই না। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ মায়া।

আলোমা-কে রাগাবার জন্যে অনন্য জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনার সংসার করতে ইচ্ছে

করে না?

উদাস চোখে অনন্যর দিকে আলোমা একপলক তাকাল। সামান্য সময়। তারপর চোখে হাসির ঝিলিক তুলে বলল, দুষ্টু ছেলে। বড় বুদ্ধি তোমার।

প্রসঙ্গ পাল্টে আলোমা জিজ্ঞেস করল, তোমার ব্যাপারটা কী? দু'দিন ধরে শুধু আপনি, আজ্ঞে করে চালিয়ে যাচ্ছ। আলোমা বলতে কি খুব কষ্ট হবে?

কথাটা ঠিক। সমবয়সি কোনো মহিলাকে মা বলতে অনন্যর অস্বস্তি ছিল। আলোমা নিজেই পথ বাৎলে দিল। বলল, তুমি বরং আমাকে আলোঠাকরুন বলে ডেকো। আপনি বাদ দাও।

অনন্য বেঁচে যায়। আলোঠাকরুন তড়িৎ গাছতলা ছেড়ে চলে গেল।

সুরেলা গলায় সদানন্দজী তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ শুরু করতে অনন্য সজাগ হলো। ওয়েটিংরুমে ফিরে দেখল আলোঠাকরুন, তড়িৎ, কৃষ্ণনগরের দম্পতি এবং অন্য যাত্রীরা স্নানের জন্যে তৈরি হচ্ছে। পাঁচটার আগে তেজেশানন্দের আখড়ায় অনন্যকে পৌঁছোতে হবে। সেখান থেকে দল বেঁধে সঙ্গমে স্নান করতে যাবে। ঠাকরুন বলেছিল, বড় যোগের স্নানে একসঙ্গে যাওয়া ভালো।

ঠাকরুনের নির্দেশে চক্রবর্তীমশাই-এর সঙ্গে অনন্য যোগাযোগ করেছিল। স্নানে যাবার ব্যবস্থা সে ভাবে হয়েছে। ওয়েটিংরুমের পুণ্যার্থীরাও তেজেশানন্দের সঙ্গী হবে। ভোররাতে অনন্য স্নান করবে না। পুণ্য সংগ্রহে তার আগ্রহ কম। মুমুক্ষু মানুষের ভিড়ের টানে অনন্য আলোঠাকরুনের সঙ্গী হলো। আলোঠাকরুনের দলবলের সঙ্গে অনন্য যখন তেজেশানন্দের ঠিকানায় এসে পৌঁছলো, ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে স্বামীজী তখন রাস্তায় নেমেছে। চক্রবর্তী খাতির করে আলোঠাকরুন আর তড়িৎকে মিছিলের মাথায় জায়গা করে দিল। হিহি ঠাণ্ডায় সকলে কাঁপছে। দু'জন সখীসহ সেই শ্যামলা তরুণী রয়েছে অনন্যর ঠিক পিছনে। পেছনে না তাকিয়েও পিঠের চামড়ায় সূচিভেদ্য অনুভূতি অনন্য টের পাচ্ছে। তার প্যান্টের পকেটে সেই কাগজটা এখনো রয়েছে। কাল সকালে তেজেশানন্দের আখড়ার ছাত থেকে টুপ করে কাগজের একটা ছোট্ট পুরিয়া পায়ের কাছে পড়তে অনন্য চমকে উঠেছিল। ছাতের ওপর তরুণীরা তখন হাসছিল। কাগজের গুলিটা ছোঁয়া উচিত ছিল না, তবু অনন্য সেটা তুলে নিয়েছিল।

সাদা কাগজে গোটা গোটা ছাঁদে নিরীহ যে কয়েকটা শব্দ লেখা ছিল, তা হলো, আমাদের সঙ্গে আপনি কথা বলেন না কেন? ঘাড় তুলে তাকিয়ে অনন্য দেখেছিল ছাদের পাঁচিল ফাঁকা, সেখানে কেউ নেই। কিছু সময় অনন্য বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েগুলো তাকিয়ে থাকলে বুকের মধ্যে এক অচেনা অনুভূতি রিনরিন করে বাজতে থাকে। তখনও তাই হচ্ছে। কম্বলে অনন্য মাথা ঢেকে নিল। মহাত্মা গান্ধী রোডে পা দিতে মনে হলো গোটা এলাহাবাদ শহর রাস্তায় নেমে পড়েছে। নানা বয়সি স্ত্রী পুরুষ মিলে তাদের দলে রয়েছে শ'দেড়েক লোক। কাতারে কাতারে স্নানার্থীর প্রবাহে বিন্দুর মতো দলটা মিশে গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো মানুষের মিছিল এগিয়ে চলেছে সঙ্গমের দিকে। বয়স্কা মহিলা, মাসিমা পিসিমাদের দেখাশোনা করছে চক্রবর্তী। কোনো দলের সঙ্গে চলেছে কীর্তনের আসর। ঘন ঘন ধ্বনি উঠছে, হরহর বোমবোম। নমো, হরি শ্রীনারায়ণ। অভিভূতের মতো অনন্য হাঁটছিল। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের দূরদূরান্ত থেকে মানুষের মহাসমুদ্র কিসের আকর্ষণে এখানে আছড়ে

পড়ছে, ভেবে দিশা পেল না। মিছিলের অটল গাম্ভীর্য, সমাহিত ভাব তাকে নির্বাক করে দিল। ছেঁড়া জামাকাপড়, খালি পা সাধারণ মানুষ, কৌপিন পরা সাধু, নাগা সন্ন্যাসী, ভিখিরি, সকলেই ভাবাবিষ্ট। তীব্র শীত, জীবনযাপনের দুঃসহ কষ্ট, তাদের কাবু করতে পারেনি। সহজাত বৃত্তিগুলো মানুষ কী অনায়াসে অতিক্রম করে যায়! অনন্যর আধমরা বিস্ময় অনেকদিন পর এক অদৃশ্য শক্তির টান অনুভব করল।

দারাগঞ্জের মধ্যে দিয়ে ঘুরপথে প্রায় চার মাইল হেঁটে দলটা যখন সঙ্গমে পৌঁছল, আকাশে আলো ফুটছে। অন্ধকার কাটেনি। মাথার ওপর টিপটিপ করছে এক ঝাঁক তারা। জোরালো বৈদ্যুতিক আলোয় চারপাশ দিনের মতো পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

গুরুগম্ভীর প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র বলছে পুরোহিত,

হরহর গঙ্গা পার্বতী

পাপ না রহে একরতি।

কোনো মহাপাতককে নিয়ম অনুযায়ী বরফগলা জলে বারংবার ডুব দেওয়ার জন্যে পণ্ডিত নির্দেশ দিচ্ছে, বুড়কি মারো। বুড়কি মারো।

পাপীর ভেউ ভেউ কান্না আর প্রশ্ন, পণ্ডিতজী বুড়কি মারে ফিন?

গঙ্গার ওপারে নৈনির সীমারেখা অন্ধকারে অস্পষ্ট চোখে পড়ছে। স্নানের এলাকা জুড়ে নহবৎখানার মতো উঁচু কয়েক ডজন মঞ্চ বানানো হয়েছে। দূরবীন হাতে পুলিশ বসেছে সেখানে। মুখে মাইক লাগিয়ে মাচা থেকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে। সাধারণ স্নানার্থী আব সাধুসন্তের জন্যে আলাদা স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা মিছিল করে এগিয়ে আসছে পুণ্যস্নানে। তিরধনুক, ছোরা, কৃপাণ নিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে এল অলখ দরবারের নাগা সন্ন্যসীরা। চারপাশে লক্ষ লক্ষ মানুষের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রথমে তারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র স্নান করাল। তারপর শুরু হলো বলিদান। লেবু, পেয়ারা, কুমড়ো। বলিদান পর্ব চুকলে ছাইমাখা নগ্ন শরীর কয়েকশো সাধু, পাহাড়ের মতো একটা সবুজ জলস্রোতে একসঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ল। আঁজলা ভর্তি জল পরস্পরের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে তারা শিশুর মতো খেলা করছে। আধমাইল রাস্তা ডিগবাজি দিয়ে একজন নাগাবাবাজী জলে বসে পড়ল।

হরহর বোমবোম শব্দে তটভূমি মুখরিত।

জরির কাজ করা ভেলভেটের ছাতার তলায় রয়েছে সন্ন্যাসী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর। পেছনে কয়েকশো শিষ্য। তাদের পেছনে গ্রন্থসাহেবের অনুসারী বৈরাগী আখড়ার সাধুরা।

পথের দুপাশে অসংখ্য সাধারণ মানুষ। মুঠোমুঠো টাকাপয়সা ছুঁড়ছে। উদাসীন সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় নরম বেলেমাটিতে যাবতীয় অর্থ, বিত্ত ডুবে যাচ্ছে। তাদের চলার পথের একমুঠো মাটি নেওয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি করছে মানুষ।

গঙ্গায় চড়া পড়লেও কল্লোলিনী যমুনা তরতর করে বয়ে চলেছে। লাউড স্পিকারে উঁচু মাচা থেকে স্নানার্থীদের নির্দেশ দেওয় হচ্ছে। সঙ্গমে ডুব দেওয়ার জন্যে মানুষের ভীষণ আগ্রহ বেশি। নৌকোর মাঝিরা যাত্রী তোলায় ব্যস্ত। বুড়কি মারো, বুড়কি মারো, তারা যাত্রীদের তাগাদা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে হিমশীতল জলে নিজেরা বারবার ডুব দিয়ে তুলে আনছে পয়সা, পেয়ারা, আপেল, সমুদ্রে দেওয়া যাত্রীদের অর্ঘ্য। সবুজ জলে যাত্রীরা ঘটি ঘটি দুধ ঢেলে দিচ্ছে। দুধে জল মেশানোর প্রথা অনন্য শুনেছে। জলে দুধ জল মেশানো হয়, এটা জানতো

না। খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার হয়তো এটাই নিয়মমাফিক প্রায়শ্চিত্ত। তুহিনের খোঁজে হাজার হাজার সন্ন্যাসী আর অপরিচিত মানুষের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে অনন্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এতো মানুষ, এতো মুখ দেখে টনটন করছে দু'চোখ। তবু অনন্য থামেনি। প্রতিটি সন্ন্যাসীর মুখ, চোখ, সতর্কভাবে নজর করছে। তিন-চারদিনে কতো মানুষ দেখল। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই! কোনো একজন, দ্বিতীয়জনের মতো নয়। মাথার মধ্যে তুহিনের মুখটা মাঝে মাঝে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তখন তুহিনকে কিছুতে মনে পড়ছে না। দু'চোখ বুজে কিছু সময় ভাবার পরে তুহিনের মুখের টুকরো অংশগুলো জোড়া লেগে সমগ্র তুহিন স্মৃতিতে জেগে উঠল। আলোঠাকরুন কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, অনন্য খেয়াল করেনি।

পূব আকাশে জবাকুসুম রঙের সূর্য উঠেছে। সূর্যের আলোয় ধুলো আর কুয়াশার রঙ বদলে গেছে। সঙ্গমে স্নান করার জন্যে মেয়েরা নৌকো ভাড়া করল। তাদের মধ্যে ছিল আলোঠাকরুণ। নৌকোতে ঠাকরুণ ডেকে নিল অনন্যকে। আলোঠাকরুনের সঙ্গে অনন্য নৌকোয় উঠে বসলো। বাসবী এবং তেজেশানন্দের কয়েকজন শিষ্যা আগেই নৌকোয় উঠে বসেছে। অনন্যকে দেখ বাসবী হাসল। অনন্য দেখলো স্বামী তেজেশানন্দের পাশে একবুক জলে দাঁড়িয়ে তড়িৎ মন্ত্র জপছে। তাদের পাশে চক্রবর্তী, জনমেজয় এবং ভক্তের দল। ঘোলা জলে থিকথিক করছে মানুষের মাথা। সাঁইসাঁই করে উত্তুরে হাওয়া বইছে। অকথ্য শীত। তবু কারো মুখে বিকার নেই। মেয়ে পুরুষ, সকলে প্রায় আদুল শরীর। অথচ কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। মানুষ যেন মহামানব হয়ে গেছে। সঙ্গমের জলে ধীর ছন্দে নৌকো দুলতে থাকে। নানা বয়সি জনা সাতেক মহিলা নৌকোয় বসে চিত্তসুখে কথা বলছে। আলো ঠাকরুন একটা গামছা হাতে অনন্যর সামনে এসে দাঁড়াল। দু'চোখে কৌতুক নিয়ে মহিলারা চুপ করে বসে আছে।

আলো ঠাকরুন বলল, তোমার চোখ বেঁধে দেব।

ঠাকরুনের মুখে স্মিত হাসি।

অনন্য একটু অবাক হলেও কারণটা বুঝতে পারল। আলো ঠাকরুন শক্ত করে চোখ বেঁধে দিতে তার চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। ডাইনে, বাঁয়ে, পায়ের কাছে ঝুপঝাপ জামাকাপড় পড়ার শব্দ শুনছে সে। খলখলিয়ে কেউ হাসছে। অদৃশ্য পৃথিবী থেকে গম্ভীর নিনাদ উঠতে থাকে। অনন্যর মনে হয়, ভূগর্ভের গভীরতম স্তরে সে পৌঁছে গেছে। চারপাশে অশান্ত জলস্রোত, বিস্ফোরণের শব্দ। তার কানে তালা লেগে গেল। দশ মিনিট বাদে তার চোখের বাঁধন আলোঠাকরুন খুলে দিতে প্রথমে সে কিছু দেখতে পেল না। দৃষ্টির ঝাপসা ভাব কেটে যেতে দেখল আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। অনন্যর লাল দু'টো চোখ দেখে আলোঠাকুরন বলল, বেচারা!

স্নান করে ফেরার পথ আলাদা। কিছুটা এগিয়ে খোয়া বিছানো রাস্তা শুরু হয়েছে। মেলার জন্যে বানানো হয়েছে এসব পথ। দলবল সমেত স্বামী তেজেশানন্দ গুরুগম্ভীর চালে এগিয়ে চলেছেন। এক বৃদ্ধা এসেছে খালি পায়ে। ধারালো খোয়াতে ভিজে পা কেটে যেতে তার মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে। চক্রবর্তী দিশেহারা। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তেজেশানন্দের কীর্তনের আসরে বেহুঁস ছেলের মাথা কোলে নিয়ে এই বৃদ্ধাকে অনন্য বসে থাকতে দেখেছে।

বৃদ্ধা বলল, তুমি তো আমার শঙ্করের সমবয়সি।

শঙ্কর কে, অনন্য জানতে চাইল।

আমার ছেলে, বৃদ্ধা বলল, কেত্তনের আসরে তাকে দেখেছ। গান শুনলেই দশা হয়।

অনন্য কথা বলল না। বৃদ্ধা নিজেই বকে যাচ্ছে, ধর্মকর্মে ওর বিশ্বাস ছিল না। আমি ছিলাম আশ্রমবাসী। দু'বছর আগে পুরীতে আমাদের আশ্রমে এসেছিল, আমাকে সংসারে ফিরিয়ে নিতে। তারপর নিজেই আশ্রমে থেকে গেল। কলকাতায় ওর বৌ-মেয়ে, সংসার সব আমার ঘাড়ে চেপেছে। কবে যে ছেলেকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব, কে জানে?

দমকা কান্নায় শঙ্করের মায়ের গলা বুজে গেল। ভুলা ভাটকা থেকে নারীকণ্ঠ ঘোষণা করছে, নবজাত একটি শিশুকে আজ ভোর রাতে কালী সড়কের মুখে পাওয়া গেছে। শিশুটির মা, বাবা আমাদের দপ্তরে এখনি খোঁজ করুন। আলোঠাকরুন বিড়বিড় করল, কোন হতভাগিনী সন্তান ফেলে দিয়ে গেল?

দিনের আলোয় শরীরে কম্বল জড়িয়ে ভূতের মতো তেজেশানন্দের আশ্রমে যেতে অনন্যর লজ্জা করছিল। স্টেশন থেকে জামাকাপড় বদলে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসার ইচ্ছে ছিল। শঙ্করের মা ছাড়ল না। আমাদের ওখানে বাল্যভোগ খেয়ে যাবে, বলে এমন চাপাচাপি করল, যে অনন্য নড়তে পারলো না।

জনমেজয় বলল, ভালো হয়েছে ভোগের পরে গুরুজীর সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেব।

বাসবীর সঙ্গে মেয়ের দল চোখের আড়ালে চলে গেছে। চক্রবর্তী এখন অনেকটা তফাতে। জনমেজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনন্য কিছু দেখার চেষ্টা করলো। কাল রাতে বেশ কয়েক ছিলিম গাঁজা, হাসিস খেয়ে জনমেজয় এমন সব গূঢ়, গোপন কথা বলেছে, যা সহজ অবস্থায় বলতে পারতো না। অনন্য ধরতে পেরেছে, জনমেজয় নেশাখোর নয়। কোন এক অশান্তিতে বেপরোয়া ছিলিম টানছে। কয়েকদিনে শুকিয়ে গেছে মুখ। দু'চোখের তলায় কালি জমেছে। জীবনের পঁয়তাল্লিশটা বছর একা কাটিয়ে দেওয়ার পর হঠাৎ বাসবীর জন্যে জনমেজয় কেন উতলা হলো, এটাই রহস্য। জনমেজয়ের ওপর বাসবীর দুর্বলতা আছে। গুরু তেজেশানন্দের প্রভাব কাটিয়ে বিয়ের কথা বাসবী ভাবতে পারছে না। তেজেশানন্দ তার ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন। তাছাড়া আরো কিছু গোপন প্রত্যাশা বাসবীর আছে। জনমেজয় জানে না।

ভাঙা গলায় কাল রাতে জনমেজয় এসব তথ্য অনন্যকে শুনিয়েছিল। ধুলো, ধোঁয়া-ঢাকা মেলার জনারণ্যে জনমেজয়কে ভীষণ আর্ত দেখাচ্ছিল। ক্লান্ত শরীরে অনন্য প্রায়ই ভুলে যাচ্ছিল, কার খোঁজে উদভ্রান্তের মতো সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীতে তুহিন নামে কেউ কি বেঁচে আছে, কোনো দিন ছিল? অথবা তুহিন নামে সেই যুবকটি হাজার লক্ষ টুকরো হয়ে এই মেলার সঙ্গে মিশে গেছে?

জনমেজয় বলছিল, বড় বেসামাল হয়ে গেছি অনন্য। শরীর, মনে ভীষণ কষ্ট। জীবনে এত যন্ত্রণা পাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বাসবী হয়তো কলেজ জীবন থেকে স্বামীজীকে ভালোবাসত।

স্বামীজীর মনের খবর কী, অনন্য জানতে চেয়েছিল।

নেশার ঘোরে গুরু প্রসঙ্গে জনমেজয় তদগত হয়ে ছিল। কপালে দু'হাত তুলে নমস্কার করে বলেছিল, ঈশ্বর না হলেও আমার গুরু মহামানব। এ সব তুচ্ছ, সাধারণ বিষয়ে গুরুকে

জড়ানো পাপ।

গুরুর অনুমতি নিয়ে আপনারা বিয়ে করতে পারেন, অনন্য পরামর্শ দিয়েছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জনমেজয় বলেছিল, সে কারণেই আমার এখানে আসা। বাসবীও বলেছিল এলাহাবাদ গিয়ে দু'জনে একসঙ্গে গুরুকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইবো। এখন সে প্রসঙ্গ তুললে কেঁদে আকুল হয়। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আশ্রমের সামনে এসে অনন্য বুঝতে পারে, ভেতরে বিপুল কর্মতৎপরতা, হাঁকডাক শুরু হয়ে গেছে।

জনমেজয় বলল, কলে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও। এখনি ভোগ শুরু হবে। শঙ্করের মা অনন্যর হাত ধরে বাড়িতে ঢুকল।

ছাদের ওপর মুখোমুখি দু'পংক্তিতে শিষ্য ভক্তরা বসেছে। তাদের সঙ্গে অনন্য বসে গেল। কলাপাতায় গরম লুচি, আলুর দম, হালুয়া। এর নাম বালভোগ। ব্রেকফাস্ট।

লালপেড়ে গরদের শাড়ি পড়ে বাসবী তদারক করছে। ভিজে চুলের আলগা খোঁপা ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়েছে। বুদ্ধিদীপ্ত, লাবণ্যময়ী চেহারা। সামনে কয়েকটা আসনে সেই তরুণীর ঝাঁক। নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করে চাপা গলায় কথা বলছে।

অনন্যর পকেটের ভেতর থেকে কাগজের টুকরোটা বলে ওঠে, আমাদের সঙ্গে তুমি কথা বলো না কেন?

চোখ তুলে তাকাতেই শ্যামবর্ণা তরুণীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। তুহিনের মতো সরু, তীক্ষ্ণ চোখ, চোখের দুটো মণি সেইরকম ঘন কৃষ্ণবর্ণ। ঘাড় উঁচু করে দেখার সাহস পেল না অনন্য। খাওয়ার মাঝখানে শঙ্করকে নিয়ে এলো তার মা। ফ্যাকাশে চেহারা শঙ্করের চোখ দুটো দারুণ উজ্জ্বল। অনন্যর সঙ্গে দু'চার কথা বিনিময় হলো। গত কয়েকদিনে আশ্রমের অনেকের সঙ্গে অনন্যর পরিচয় হয়েছে। তবু সম্প্রদায়ের বাইরের লোক হিসেবে তার জড়তা কাটেনি। খাওয়া শেষ হতে জনমেজয় বলল, গুরুজীর সঙ্গে আলাপ করবে চল।

অনন্য ঘাবড়ে গেল। আধ্যাত্মিক মার্গের এরকম জাঁদরেল মানুষের সঙ্গে কী কথা বলবে, ভেবে পেল না। ঈশ্বর সম্পর্কে তার কোনো কৌতূহল নেই। ভগবানের কাছে সে কিছু প্রত্যাশা করে না। তখনি মনে পড়ল, গৃহত্যাগের আগে মানুষের আত্মা, অস্তিত্ব, জীবন, মৃত্যু সম্পর্কে তুহিন জানতে চেয়েছিল। তুহিনের অজ্ঞাত উত্তরগুলো সে নিজেও স্বামীজীর কাছে জানতে চাইতে পারে।

জনমেজয়ের সঙ্গে অনন্য স্বামীজীর ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে ফুল, চন্দনের মিষ্টি গন্ধ। ভেতর দিকের ঘর। আলো কম। ভেলভেটের নরম আসনে স্বামী তেজেশানন্দ বসে আছেন। স্বামীজীর পাশে এক চৌকির ওপর পেতলের সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। দু'চারজন ভক্ত ঘিরে আছে গুরুকে।

পরিচয় শেষ হতে অনন্য জিজ্ঞেস করল, মানুষ কেন সাধু হয়?

স্বামীজী বলল, কম বিনিয়োগে বেশি লাভ করা হলো অর্থনীতির মূল তত্ত্ব। সামান্য জীবন মূলধন করে সাধুরা অনেক বড় জিনিস পেয়ে যায়।

আপনি পেয়েছেন?

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বলল. পাকা হিসেব এখনও তৈরি হয়নি। মনে হয়, লোকসান করিনি।

স্বামীজী প্রশ্ন করল, এখানে আশা হয়েছে কেন? পুণ্যস্নানে?

না, অনন্য বলল।

পাপ ধুতে?

মোক্ষম সময় বুঝে অনন্য কথাটা বলে ফেলল। বলল, হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে খুঁজতে এসেছি। তুহিনের বিবরণ তেজেশানন্দকে সে শোনালো। অনন্যর কথায় দুচোখ বুজে স্বামীজী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল।

একঘর ভক্ত চাপা অস্বস্তিতে উশখুশ করছে। অনন্য সংকুচিত হয়ে আছে। স্বামীজী দু'চোখ খুলে সোজাসুজি অনন্যর দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বলল, বন্ধুকে পাবে। সত্যের জ্ঞানও হবে। অনেক কাল খুঁজতে হবে। বড় কষ্ট আর ত্যাগের পথ। ঘরছাড়া, পাগল হয়ে যায় মানুষ। এটাই নিয়ম। সব কঠিন প্রশ্নের জবাব এভাবেই মানুষ পায়। তুমি বন্ধুপ্রেমী। তুমি বিফল হবে না।

হারমোনিয়াম, খোল, করতাল নিয়ে কীর্তনীয়ারা ঘরে ঢোকে। অনন্য বোঝে, নামগানের আসর বসবে। কথা না বাড়িয়ে সে নিঃশব্দে উঠে আসে। স্বামীজীর একটা কথা তার মাথায় ক্রমাগত ওঠাপড়া করছে। বড়ো কিছু খোঁজার জন্যে মানুষ ঘরছাড়া, পাগল হয়ে যায়। কথাটা ঠিক। তা না হলে তুহিন কেন বিবাগী হয়ে গেল? অভীষ্ট প্রশ্নের উত্তর পেতে যেখানে তুহিনকে সর্বস্ব ত্যাগ করে দুঃখের জীবন বেছে নিতে হয়েছে, সেখানে অনায়াসে, বিনা সাধনায় একই প্রশ্নের জবাব সে কিভাবে প্রত্যাশা করে? কিন্তু এইসব অজাগতিক দর্শনে সে বিশ্বাস করে না। পৃথিবী এবং মানুষকে বাদ দিয়ে তৈরি যে কোনো তত্ত্বের সে বিরোধী। সমাজ সংসারের মঙ্গল আর উন্নতিতে যে ধর্ম, দর্শন অকেজো, তার কোনো মূল্য তার কাছে নেই তবু মনের মধ্যে সন্দেহ কাজ করে। সমাজকল্যাণে একদা সে নিজেও সক্রিয় ছিল। ত্যাগ, আন্তরিকতাতে ঘাটতি ছিল না। তবু সব কিছু অপ্রাপ্য, অলভ্য থেকে গেল। নিষ্ঠুর সেই অতীতও আজ অলীক মনে হয়। তুহিনের খোঁজে এসে সে নিজেও সংকটে পড়ে গেছে তুহিনের বিরুদ্ধে বুকের মধ্যে ধিকিধিকি রাগ। অনন্য মনে মনে তুহিনকে বলল, কেন তুই আমার সঙ্গে শত্রুতা করছিস? কোটি কোটি মানুষের ঘূর্ণির মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে তোর লুকোচুরি খেলার মানে কি? তোকে খুঁজতে গিয়ে আমি নিজেও তছনছ হয়ে যাচ্ছি। আত্মা, জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি ধোঁয়াটে প্রশ্ন নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকার কি? তোর আধপাগল মা আর সমুদ্রের মতো এই জনসমাবেশ, দুনিয়ার যাবতীয় আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তবু তোকে খুঁজতে এসে তোর প্রশ্নগুলো আমার মাথার মধ্যে জোঁকে বসেছে। সর্বনাশা চক্রের মধ্যে কেন আমাকে টেনে আনলি তুহিন?

আশ্রমের সামনের গলিপথ ধরে কয়েক পা হাঁটলে বড় রাস্তা। দুটো খাটিয়া গলির মুখে পাশপাশি পাতা। খাটিয়ার ওপর সকালের রোদ লুটিয়ে আছে। জনমেজয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে অনন্য একটা খাটিয়ায় বসে আছে। জনমেজয় দোকানে গেছে। দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরবে। আশপাশের সব বাড়িঘর মানুষে বোঝাই হয়ে গেছে। তিল ধারণের জায়গা নেই কোথাও। বাড়ির ছাদ পর্যন্ত সামিয়ানা খাটিয়ে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। পৌষের চমৎকার রোদে বসে অনন্যর ঝিমুনি লাগল। কার খাটিয়া, কে মালিক, কিছু না ভেবে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ল সে। সতর্ক, সজাগ দৃষ্টি নড়ল না। হাজার হাজার মানুষ ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চলে যাচ্ছে। এত দ্রুত, সকলের মুখ দেখা সম্ভব নয়। চোখের মণি উত্তেজনায় ছিটকে বেরিয়ে

াসছে। তবু রেহাই নেই। ভিড়ের মধ্যে কোথাও দাড়ি গোঁফ আর ভেকের আড়ালে তুহিন াত্মগোপন করে থাকতে পারে। তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

রোদের তাপ বেড়েছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল জনমেজয়ের পাত্তা নেই। লোকটা হঠাৎ ্যাপার মতো আচরণ করছে। অনন্য দেখল আশ্রমবাড়ির ছাদের পাঁচিল খালি। তাকে কথা লবার জন্যে যারা কাগজের পুরিয়া ফেলেছিল, তাদের কেউ নেই। অনন্য ভাবল, স্টেশনে ফেরা উচিত। বিকেলে জনমেজয়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে। আলোঠাকরুন হয়তো তার জন্যে ভাগ নিয়ে অপেক্ষা করবে। বেলা কম হয়নি। রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। অনন্যর দুচোখ ন্ত্রণায় টনটন করছে।

কুলির মাথায় ঝাঁকা বোঝাই তরিতরকারি, তেল, মশলা চাপিয়ে জনমেজয় বাজার থেকে ফিরতে তার দেরি হওয়ার কারণ অনন্য বুঝতে পারল। আশ্রমের দরজায় চক্রবর্তীর জিম্মায় ুলিকে গছিয়ে দিয়ে জনমেজয় এসে খাটিয়ায় অনন্যর পাশে বসল। জনমেজয়ের কপালে মনমিনে ঘাম।

জনমেজয় বলল, চক্রবর্তীমশাইকে বললুম, দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।

কবে ফিরছেন, অনন্য জিজ্ঞেস করল জনমেজয়কে।

পরশু টিকিট করেছি, জানি না কি হবে। তুমি কাউকে বলো না, নিচু গলায় জনমেজয় ানাল।

স্টিলের ছোট থালায় দু'কাপ চা নিয়ে বাসবী হাজির হলো। ইতিমধ্যে চুল শুকিয়ে গেছে। ানটান করে খোঁপা বাঁধা। ফর্সা, সরু কপাল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এক পলক বাসবীকে দেখে জনমেজয় বলল, পরশু চলে যাচ্ছি।

কেন, বাসবী জানতে চাইল।

শরীরটা ঠিক নেই।

ডাক্তার দেখান।

ডাক্তা সারাতে পারবে না।

বাসবীর মুখ গম্ভীর হয়। আনমনা ভঙ্গিতে পথের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। চায়ে চুমুক ল অনন্য।

অনন্য একটা প্রশ্ন করছিল, জনমেজয় বলল।

কথাটা না শোনার ভান করল বাসবী।

প্রশ্নটা তোমার সম্পর্কে, জনমেজয় যোগ করল।

আমার সম্পর্কে, কথাটা বলে অনন্যর দিকে বাসবী তাকালো।

অস্বস্তিতে অনন্য ঘামছে। বাসবীকে নিয়ে জনমেজয়ের কাছে কী প্রশ্ন সে করেছিল, ভেবে পল না।

জনমেজয়ের মুখের দিকে বাসবী তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

জনমেজয় ধীরে ধীরে বলল, অনন্য জানতে চাইছিল, তুমি আমায় বিশ্বাস কর কিনা?

বাসবীর শরীর শক্ত হয়ে গেল। দুটো ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে।

চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, এতো লোক থাকতে হঠাৎ আপনাকে প্রশ্ন করল কেন?

শীতের দিনেও অনন্য ঘেমে উঠছে। দু'জন মানুষের জীবনের এমন জটিল সংকটে এভাবে

জড়িয়ে যাওয়ার মানে হয় না। এটা সে চায়নি। নিছক কথার পিঠে প্রসঙ্গটা পেড়েছিল। সে
সূত্র ধরে জনমেজয় তাকে পথে বসিয়ে দেবে, ভাবতে পারেনি।

বাসবীর খরদৃষ্টির সামনে অনন্য মাথা নিচু করে বসে থাকল।

বাসবী কোনো কঠিন কথা বলল না।

জনমেজয় বলল, তুমি যা আশা করছ, সেটা অন্যায়।

কী বলতে চান আপনি, বাসবীর গলা কেঁপে উঠল।

আরো স্পষ্ট করে না বলা ভালো, জনমেজয় জবাব দিল।

ছি ছি, বাসবী আর কথা বলতে পারল না। দু'হাতে কান ঢাকল। স্তব্ধ মুখে জনমেজয় ব
আছে।

জনমেজয়কে লক্ষ্য করে বাসবী বলল, আপনি আমাকে মাপ করুন। আমি আর পার
না।

অনন্যর মনে হলো দমকা কান্না গিলে নেওয়ার জন্যে বাসবী প্রাণপণ লড়াই করছে। হয়ে
এখনি তুমুল কান্নায় ভেঙে পড়বে। খালি কাপ দু'টো নিয়ে বাসবী আশ্রমের দিকে চলে গেল

জনমেজয় খাটিয়া ছেড়ে রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

অনন্য পাথর হয়ে গেছে। স্টেশনে ফেরার কথা মনে নেই।

কয়েক মিনিট বাদে অচেনা এক বাঙালি ভদ্রলোক এসে অনন্যকে জিজ্ঞেস কর
জনসনগঞ্জ কোথায় বলতে পারেন?

ভদ্রলোক একটা বাড়ির নম্বর বলল।

অনন্য জবাব দিল, এলাহাবাদের কিছুই আমি জানি না।

মাঝবয়সি ভদ্রলোক বিরস মুখে এগিয়ে এক রিক্সাওয়ালার কাছে হদিশ চাইল। দু'এক
কথা বলে তার রিক্সায় উঠে বসল। আশ্রমের ছাদে, পাঁচিলে বুক দিয়ে বাসবী তাকিয়ে আছে
অচেনা লোকটা চলে যাওয়ার দু'মিনিটের মধ্যেই বাসবী হাজির হলো। অনন্যর মনে হলো চা
উত্তেজনায় বাসবীর শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছে। চোখ, নাক, ভরাট পুষ্ট দু'গালে লালচে ছোপ
তার ঝোড়ো নিঃশ্বাসের শব্দ অনন্য শুনতে পেল।

অনিশ্চিত আশঙ্কায় অনন্য গুটিয়ে যাচ্ছে। আবার কী হলো, বুঝতে পারছে না। উত্তেজি
গলায় বাসবী জিজ্ঞেস করল, ওই ভদ্রলোক কে?

কার কথা বাসবী জানতে চাইছে, অনন্য বুঝতে পারল না। তার চোখের দিকে তাকি
বাসবী বলল, এইমাত্র যার সঙ্গে কথা বলছিলে, সে কে?

চিনি না, অবাক অনন্য জানাল, ভদ্রলোক একটা ঠিকানা খোঁজ করছিলেন।

বাসবী স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। উত্তুরে হাওয়ায় তার কপালের চুল উড়ছে। তা
বুকের ওঠাপড়া দেখে ভেতরের আলোড়ন অনন্য টের পেল।

ঠিকানাটা কী, বাসবীর গলার স্বরে হাওয়ার শব্দ। অনন্যর মুখে ঠিকানাটা শুনে বাসবী বলল
আমার সঙ্গে তোমাকে এখনি একবার সেখানে যেতে হবে।

অনন্য বিহ্বল, কৌতূহলে ফুটছে। সাইকেল রিক্‌শা ডেকে বাসবীর পাশে সে বসল।

বুঝতে পারলো, বাসবী অস্থির, অধৈর্য হয়ে পড়ছে। বাসবীর মুখের দিকে আড়চোখে
একবার তাকাল। বাসবীর মুখ চোখে ফুটে উঠেছে কিশোরীর লাবণ্য। লাজুক দৃষ্টি, চালচলনে

একরোখা, জেদি ভাব।

অনন্য কথা বলার সাহস পেল না। চারপাশে নাটক ঘটে চলেছে। চর্মচক্ষে দেখা এই পৃথিবী, মানুষজন, তাদের সুখ দুঃখ সব যেন জলরঙে আঁকা ছবি। জীবনের মূল নক্‌সা এতো গভীর আর গোপন, সাদা চোখে দেখা যায় না। কাঁচা, অস্থায়ী রঙে ছোপানো জীবনের ওপরকার একসেট আবরণ মানুষ দেখতে পায়। সেই দেখাতে খুশি থাকে। নিজের তুচ্ছতায় অনন্য করুণা বোধ করে। নানা পথ ঘুরে জনসনগঞ্জে পৌঁছোতে প্রায় আধঘন্টা লেগে যায়। নম্বর মিলিয়ে নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে গিয়ে রিক্‌শা থামে। গায়ে গা লেগে থাকায় বাসবীর শরীরের কাঁপুনি সে টের পাচ্ছে। তার মুখের দিকে বাসবী সোজাসুজি তাকাল। বাসবীর চোখের মণিদুটো ঘন কালো হয়ে গেছে। অনন্যর ডান হাতটা তুলে নিয়ে বাসবী দু'হাতে চেপে ধরল। বাইরে এতো উত্তেজনা সত্ত্বেও বাসবীর হাতের দুটো নরম পাতা বরফের মতো ঠাণ্ডা। অনন্যর বুকের ভেতর শিরশির করে। বাড়ির সামনে থেকে কিছুটা এগিয়ে রিক্সা দাঁড় করিয়ে নিচু গলায় বাসবী বলল, আমার একটা কাজ তোমাকে করতে হবে ভাই।

বাসবীর এমন গাঢ় কণ্ঠস্বর অনন্য শোনেনি।

বাসবীর দু'হাতের মধ্যে তার হাত কাঁপছে।

বাসবী বলল, এই বাড়িতে যে ভদ্রলোক এখনই এসেছে, তার নাম অবিনাশ সান্যাল। তাকে একবার বাইরে ডেকে আনো।

অনন্যর বুকের রক্ত চলকে ওঠে। দু'কানের পাশে রক্তবাহী শিরায় ঝিঁঝিঁ ধ্বনি বাজতে থাকে। বাসবীর অবস্থা আরও শোচনীয়। মনে হয় অসহ্য উত্তাপে এখনি মাখনের মতো সোনালি ধারায় গলে পড়বে।

আচ্ছন্নের মতো রিক্‌শা থেকে নেমে বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে অনন্য দাঁড়াল। দরজার ওপর উত্তরপ্রদেশ সেচ দপ্তর লেখা সাইনবোর্ড। বন্ধ দরজার কড়া নেড়ে অবিনাশ সান্যালকে ডাকা ঠিক হবে কিনা, অনন্য ভেবে পেল না। গলার কাছে উদ্বেগ দলা পাকাচ্ছে। পেছনে না তাকিয়েও সে বুঝতে পারছে রিক্‌শায় বাসবীর বুকের পাঁজর ফেটে হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে আসতে চাইছে।

রাস্তাটা শহরের বাইরে। লোকজন কম। সরকারি অফিসে কাজের কোনো লক্ষণ অনন্যর চোখে পড়ল না। অনন্য শুনেছে, গ্রামদেশে অধিকাংশ সরকারি অফিসের এই হাল। কাজ হয় না। অনন্য দরজার কড়া নাড়ল। মাঝদুপুরের নির্জনতা সেই আওয়াজে চিড় খেল। দরজা খুললো না। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়ার শব্দ আরো জোরালো হতে অনন্য চমকে উঠলো। খোলা ড্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছাগলছানা ছুটে পালালো। ভেতর থেকে পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। চাকর গোছের একজন লোক দরজা খুলে অনন্যর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো।

অবিনাশ সান্যাল আছেন, পরিষ্কার বাংলায় অনন্য জিজ্ঞেস করতে লোকটা আরো বোকা বনে গেল। অনন্য টের পেল, তার কথার একটা বর্ণ লোকটা বোঝেনি। তাকে দাঁড়াতে বলে সে ভেতরে চলে যায়। অনন্য দেখে রিক্‌শার পেছনের পর্দা ফাঁক করে বাসবী তাকিয়ে আছে।

লম্বা, চওড়া, দশাসই চেহারার এক ভদ্রলোক, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, তার ওপর

রঙিন লুঙ্গি আর লক্ষ্ণৌ পাঞ্জাবি পরে সামনে এসে দাঁড়াল। শুঁয়োপোকার মতো গোঁফ। বিশু হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

অনন্য বলল, অবিনাশ সান্যাল।

অবাক হয়ে অনন্যর আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে নিরীহ মার্জিত রুচির মানুষটি জানাল, আমার নাম রামশরণ ঝা, আমি সেচবিভাগের সহকারি ইঞ্জিনীয়ার। এটা আমার বাসস্থান, সপরিবারে থাকি। আগে এই বাড়িতে ছিল দপ্তর। নতুন বাড়িতে দপ্তর চলে যাওয়ায় এটা এখন আমার বাসা। বছর পাঁচেক আছি। অবিনাশ সান্যাল নামে কেউ এখানে থাকে না।

হতাশ অনন্য রিক্‌শায় ফিরে এল। সব শুনে বাসবী গুম হয়ে যায়। ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখায় তাকে। অনন্যর মনে হয়, ঠিকানাটা হয়তো ভুল শুনেছে। কিন্তু এমন ভুল কখনো হয়নি। তার স্মৃতি আর সপ্রতিভতার সুনাম আছে। তবু মনে হলো কোথায় একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে

ফেরার পথে সারা রাস্তা বাসবী কথা বলল না। রিক্‌শা থেকে নামার সময় নিচু গলায় অনুরোধ করল, ঘটনাটা কাউকে বলো না।

বাসবী আশ্রমের মধ্যে ঢুকে যেতে অনন্য দেখল ছাদের ওপর থেকে জনমেজয় উদাস চোখে তাকিয়ে আছে।

সাত

ওয়েটিংরুমে ঢুকে দারুণ হৈচৈ, কান্নাকাটির মধ্যে অনন্য পড়ে গেল। ঝালগাঁওয়ের সদানন্দজী কপাল চাপড়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলছে, আর ফুলে ফুলে কাঁদছে। বাকি সবাই চুপচাপ, স্তব্ধ। আলোঠাকরুন, তড়িৎ শান্ত করার চেষ্টা করছে সদানন্দকে। কেষ্টনগরের গিন্নি ভ্রূ কুঁচকে মুখ ভার করে বসে আছে। মুখভর্তি পান চিবোতে ভুলে গেছে। কিছু আগে সূর্য মাঝ আকাশ ছুঁয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। হট্টগোল, উত্তেজনার কারণ অনন্য বুঝতে পারলে না। সদানন্দের মতো একজন সরল, প্রৌঢ় মানুষ, এমন হাপুস নয়নে কাঁদে কেন?

বিড়ি টানতে টানতে কৃষ্ণনগরের কর্তা ভেতরে ঢুকল। তার মুখে অনন্য ঘটনাটা শোনে সকালে স্নান থেকে ফিরে সদানন্দজী তুলসিদাস নিয়ে বসেছিল। দুপুর গড়াতে খাওয়ার আয়োজন শুরু করে। ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে বুঝতে পারে, সেখান থেকে যথাসর্বস্ব টাকাকড়ি, এমন কি ফেরার টিকিট সমেত কাপড়ের ছোট বটুয়াটা উধাও। চোখের পলকে হৃতসর্বস্ব হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে সদানন্দ সেই থেকে গোঙাচ্ছে। অনন্য দেখে কাঁসার থালায় নৈবেদ্যর মতো সাজানো একরাশ ছাতু। মাখা হয়নি। পেতলের লোটা ভর্তি জল, কানায় কানায় টলমল করছে। সদানন্দের দু'চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরছে। ও এখন খায় কী করে।

আলোঠাকরুন বলল, কোনো চিন্তা নেই সদানন্দ ভাই। আমরা তো আছি। অসুবিধে হবেনা দেশে ফেরার টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আলোঠাকরুনের কথায় সান্ত্বনা ঝরে পড়ে। সদানন্দের শোকের কিছুটা উপশম হয়। তার গোঙানি থামে। থেকে থেকে ফোঁপাতে থাকে।

আলোঠাকরুন অনন্যর দিকে তাকাল। মুচকি হেসে বলল, আমি ভাবলুম তুমি বোধহয় আশ্রমে পাকাপাকি আসন পাতলে।

দেরি হয়ে যাওয়ার জন্যে অনন্য লজ্জা পাচ্ছিল। বলল, সত্যি, দেরি হয়ে গেল।

অন্যদিনের মতো অনন্য বেশ পরিপাটি করে খেল। ঘি সহযোগে ভাতে ভাত। পাশে বসে দারক করল আলোঠাকরুন।

ঠাকরুনের চাপাচাপিতে সদানন্দজীও ছাতুর তাল নিয়ে বসেছে। ওয়েটিংরুমের আবহাওয়া হজ, স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তবু বুকচাপা অস্বস্তিতে অনন্য অস্থির হয়। হলঘরের পশ্চিমের ানলায় বাদামি রোদে লালচে রঙ ধরেছে। এক ঝাঁক পাখি; সম্ভবত বুলবুলি, জানলার বাইরে িচিরমিচির করছে। পাখিরা দিনান্তের গন্ধ পায়।

অনন্যর বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। বেলাশেষে যমুনার পাড় ধরে আকবর বাদশার তৈরি কল্লা পর্যন্ত একচক্কর হাঁটতে ইচ্ছে হয়। ওপাশটায় ভিড় নেই। মেলার মধ্যে থেকে যারা র্জনতা চায়, তাঁদের কাছে এলাকাটা আদর্শ।

অনন্য বেরোবার মুখে আলোঠাকুরন বলল, দাঁড়াও, আমিও যাবো।

গেরুয়া চাদর গায়ে জড়িয়ে ঠাকুরন এসে অনন্যর পাশে দাঁড়াল। কর্তার দিকে বাঁকা চোখে কালো কেষ্টনগরের গিন্নি।

রাস্তায় এসে অনন্য দেখলো রোদ মরে এলেও শুকনো হাওয়ায় তাপ আছে। পোশাক বদলে য়েছিল সে। মেলায় না গিয়ে সন্ধ্যের আগে ওয়েটিংরুমে ফিরে আসবে ভেবে সুতির হাফশার্ট রেছিল। গরম জামা নেয়নি। অনন্যর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে আলো ঠাকরুনের ফর্সা খ লাল হয়ে গেছে। ঘাম জমেছে কপালে।

অনন্য গতি কমাল। ঠাকরুন বলল, কোনো মহিলার সঙ্গে কখনো হাঁটোনি?

কেন, অনন্য প্রশ্ন করল।

একজন মহিলার সঙ্গে হাঁটার সময়ে তাকে পেছনে ফেলে যেতে নেই, হাসতে হাসতে কুরন জানাল।

পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো অনন্য বার করে ঠাকরুনের হাতে দিল।

লেখা পড়ে ঠাকরুন কিছুই বুঝতে পারল না।

অনন্য বলল, কাল আশ্রমের কয়েকজন মেয়ে ছাদ থেকে এটা আমায় উপহার দিয়েছে।

অনন্যর গলায় গর্বের সুর।

আলোঠাকরুন শব্দ করে হাসল। বলল, এতোক্ষণে বুঝলুম, কেন তুমি ওখানে সারাদিন ড়ে আছো!

তারপর গলা গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করল, কারো সঙ্গে আলাপ করেছো?

কী যে বলো, প্রশ্নটাকে অনন্য উড়িয়ে দিতে চায়।

আলো ঠাকরুনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেঁটে যমুনায় পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যায়। ি পাটে বসেছে। যমুনার জলের ঘন সবুজ রঙ সূর্যাস্তের আলোয় ঝলমল করছে। তরল উয়ের মধ্যে বহু বর্ণের খেলা। হুহু হাওয়ার সঙ্গে স্রোতের ছলছল শব্দ শোনা যাচ্ছে। শরীর । জুড়িয়ে যায়। আলো ঠাকরুন মুগ্ধ চোখে যমুনার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাঁ পাশে পাথরের রি বিরাট কেল্লা। তারপর যতোদূর চোখ যায়, শুধু তাঁবুর সারি। দিনের আলোয় উল্টোদিকে নিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেখানেও কম তাঁবু পড়েনি। পাথরে বাঁধানো সুঠাম সিঁড়ি যমুনার ল পর্যন্ত চলে গেছে। চারপাশে মৌনতার মধ্যে যমুনার ছলছল শব্দ, অনেক স্মৃতি, স্বপ্ন বয়ে

নিয়ে যায়।

তুমি সারাদিন টো টো করে কী খুঁজে বেড়াচ্ছ বলো তো, আলোঠাকরুনের প্রশ্নে অন
প্রথমটা একটু থিতিয়ে গিয়ে, পরের মুহূর্তে বলে, কিছু না তো।

আলোঠাকরুনের মুখ গম্ভীর হলো। বলল, মিথ্যে বলো না। তুমি কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে
তোমার চোখ দেখলে বোঝা যায়।

আলোঠাকরুন একদৃষ্টে অনন্যর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাল্কা হেসে অনন্য বলে, মনের মানুষ খুঁজে বেড়াই।

তুমি খুব সোজা ছেলে নয়, স্নেহের ছলে আলোঠাকরুন রাগ দেখাল।

ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে ঠাকরুন জলের কাছে নেমে গেছে। একজন মাঝি বলছে, চলি
মাতাজী, সঙ্গমসে থোড়া ঘুমকে আইয়ে।

ছোট বড় অনেকগুলো নৌকো পাশাপাশি সাজানো। অনন্য দেখে মাঝির সঙ্গে ঠাকর
দরদস্তুর করছে। ভাড়া রফা করে ঠাকরুন হাতছানি দিয়ে অনন্যকে ডাকতে অনন্য একদৌ
নৌকায় গিয়ে উঠল। ঠাকরুনের হাত ধরে নৌকোয় উঠতে সাহায্য করল তাকে। মাঝি ল
ঠেলতে জলের ওপর নৌকো পিছলে গেল। ঢেউয়ের মাথায় পড়ন্ত সূর্যের আলো নাচে
এক ঝাঁক টিয়া চিৎকার করে নৈনির দিকে উড়ে গেল।

অনন্য বলল, ঠাকরুন তোমার অনেকগুলো টাকা গচ্চা যাবে।

খুব হয়েছে, ঠাকরুন ধমক দিয়ে তাকে থামাল।

পাড়ের চেয়ে নদীর ভেতরে হাওয়া অনেক শীতল। দু-পাশ দিয়ে ভেসে চলেছে অগুণ
নানা আকারের নৌকো। আকাশে মিশে আছে শেষ বেলার আলো।

অনন্য বলল, তড়িৎকে নিয়ে আসলে ভালো হতো।

অনন্যর দিকে ঠাকরুন তাকাল। জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে?

দারুণ, অনন্য জবাব দিল, এখন মরে গেলেও দুঃখ থাকবে না।

সূর্যের আলো কমে ছায়া ঘন হতে চারপাশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যমুনার হিম হাওয়া তিরে
মতো অনন্যর গায়ে বিঁধছে। শুধু একটা হাফশার্ট পরে আসা উচিত হয়নি।

শীত একবার শুরু হলে, ক্রমশ হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। অনন্যর শরীরের ভেতর থে
কাঁপুনি উঠে আসে।

আলোঠাকরুন নানা টুকিটাকি প্রশ্ন করে অনন্যকে বোঝার চেষ্টা করছে। তার ঘর-বা
আত্মীয়-স্বজনের খবর আগ্রহ নিয়ে শুনছে। অনন্য ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে শু
ঠাকরুনের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য ঠাকরুনকে জানিয়েও অন
যা গোপন করে গেল, তা অব্যক্ত। সেই অব্যক্ত কাহিনী কাউকে বলা যায় না। বুকের ম
শুধু তার নিভৃত বুনন চলতে থাকে। সেই বুনুনিতে তৈরি হয় এক অপরূপ নক্সা। তার আকর্ষ
মানুষ নানা অনুসন্ধানে মেতে ওঠে।

এক ধূসর সন্ধ্যায় ফুসফুসে গুলি খেয়ে শিবু দুশো গজ দৌড়ে এসে বেঁচে থাকার খ
দিয়ে পলকের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। মৃত্যুর সঙ্গে শেষপর্যন্ত পাঞ্জা লড়ার শপ
করেও প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু দেখে তুহিন উদাসীন হয়ে সংসার থেকে চলে গিয়েছিল। জীবন, মৃত্যু
গভীরতর নিয়ম জানার জন্যে হয়তো আজো ঘুরে বেড়াচ্ছে! খোঁজার শেষ কোথায়, কে বলে

ারে! হয়তো সমাপ্তি আছে, হয়তো নেই। তবু সোনালি নক্সাটা কখনো ছেঁড়ে না। আকাশ থকে টাঙানো মোহময় শিল্পকর্মের মতো পৃথিবীতে ঝুলতে থাকে। অনন্য জানে, মালোঠাকরুনও এই জালে বাঁধা। তবু প্রহেলিকার ব্যাখ্যা ঠাকরুনকে বোঝানো সম্ভব নয়। াকরুন শুধু তার দু'চোখের মণি দুটো দেখে বিস্মিত হচ্ছে।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও কেন, ঠাকরুন প্রশ্ন করল।

বাড়িতে ভালো লাগে না, অনন্য বিড়বিড় করল। বুঝতে পারল তার শরীরের রামকূপগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে। দেহে শিহরণ খেলছে। দু'হাত মুড়ে শক্ত সোজা হয়ে বসেও ীত আটকাতে পারছেনা।

ঠাকরুন এতক্ষণে অনন্যর পোশাকের কৃশতা লক্ষ করল।

বলল, বেশি বাহাদুরি, গরমজামা আনতে কী হয়েছিল?

অনন্য সাড়া করল না। নৌকোয় দুজনে মুখোমুখি বসেছিল। ঠাকরুন নিজের জায়গা ছেড়ে নন্যর পাশে এসে গায়ের গেরুয়া চাদর অনন্যকে দিয়ে বলল, জড়িয়ে নাও।

তুমি কী গায়ে দেবে, অনন্য বিব্রত হয়।

অর্ধেকটা দাও, ঠাকরুন বলল।

চাদরটা দু'জনে আধাআধি ভাগ করে নেয়। চন্দনের মিঠে গন্ধ জড়িয়ে আছে চাদরে। কিছু াগে যমুনার গভীরে সূর্য তলিয়ে গেছে। জলের রঙ ক্রমশ কালচে হচ্ছে। চন্দনের সুবাসের ঙ্গে মোলায়েম উষ্ণতা অনন্যর শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

ফিকে অন্ধকারে, কল্লোলিনী যমুনা, পুণ্যার্থী প্লাবিত সঙ্গম, অনেক মহৎ আকাঙ্খা তার ক্তের মধ্যে ঢুকে ভয়ানক তালগোল পাকাতে থাকে। মানুষ বোধহয় এই জন্যেই বাঁচে। সত্যি ক তাই?

আলোয়ানের তলা দিয়ে ঠাকরুনের ডান হাত, তার বাঁ হাতের কবজিটা ধরতে সে চমকে ঠে।

ইস, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, আলোঠাকুরন বলল, মুখ দেখে ঠিকই আন্দাজ করেছি।

অনন্য নিজেও এই ভয় করছিল। মুখে বলল, কিছু নয়, জ্বরে মানুষ মরে না।

পাকামি করো না, ঠাকরুন থামাল। তারপর আলতো হাতে কবজি ধরে বসে থাকলো। াকঘন্টা শেষ হওয়ার আগেই মাঝি ঘাটে নৌকো ভেড়াল। অনন্যর দু'চোখ জ্বলছিল। জলে রে যাচ্ছিল চোখের জমি। জ্বর হলে এমন হয়।

ঠাকরুনের ফর্সা কপালে কয়েকটা রেখা জেগে আছে। স্টেশন পর্যন্ত ঠাকরুন হাঁটতে দিল । তাকে। রিক্সায় বসে বলল, ভোররাতে ঠাণ্ডা লেগেছে।

স্টেশনে পৌঁছে রিক্সার ভাড়া মেটাল ঠাকরুন। কেষ্টনগরের দম্পতি মেলায় বেরোচ্ছিল। নন্যর জ্বরের কথা শুনে গিন্নি সরু চোখে কর্তার দিকে তাকাল। থমথমে মুখে জিজ্ঞেস করল, কে নেওয়া আছে তো? শুনছি, এখানে মায়ের দয়া শুরু হয়েছে।

শুধু মায়ের দয়া নয়, কলেরার কেসও পাওয়া গেছে, কর্তা জানাল।

অনন্য সাড়া না করে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এক মস্ত সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছি, ঠাকরুনকে কর্তা বলল, এবার মুস্কিলআসান হবে।

আমার পরামর্শটা একটু মনে রাখবেন, আলোঠাকরুন নরম গলায় স্বামী-স্ত্রীকে বলল, তাতে

মঙ্গল হবে।

নোংরা ব্যাপারে আমরা নেই, কর্তা জবাব দিল। তারপর স্ত্রীর দিকে সমর্থনের আশা তাকালো। গিন্নি গম্ভীর হয়ে যায়। গিন্নির হাত ধরে কর্তা গটগট করে ওয়েটিংরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

জ্বরতপ্ত অনন্যর মুখের দিকে তাকিয়ে আলোঠাকুরন বলল, তড়িৎ আর আমি মেলায় ফেলে যাওয়া সেই শিশুটাকে পোষ্য নেওয়ার কথা দুপুরে বলছিলুম ওদের। গিন্নি উৎসাহ দেখিয়ে বলল, বাচ্চাটাকে আমি নিতে পারি। কর্তা চটে গিয়েছিল। কর্তাকে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করছিলুম। কাজ হয়নি। কর্তা সেই থেকে গিন্নিকে আগলে রেখেছে। আমাদের ছায়া মাড়াতে দিতে রাজি নয়। অথচ পুত্রকামনা বুকে নিয়ে দুজন কুম্ভমেলায় এসেছে। সাধুসঙ্গ করে বেড়াচ্ছে। বাইরে দজ্জাল হলেও গিন্নি মানুষটা খারাপ নয়। কর্তাটি অন্য রকম। খোলা মনে কথা বলতে চায় না।

আলোঠাকরুনের গলার স্বর অনন্যর কানে ক্রমশ আবছা হয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে জড়তা। হঠাৎ করে মেলায় আসার জন্যে টিকে নেওয়া হয়নি। স্টেশনের বাইরে অবশ্য সামজকল্যাণ দপ্তরের কর্মীরা প্রতিটি যাত্রীকে পাকড়ে ইনজেকশন দেওয়ার চেষ্টা করছিল। দিয়েছেও অনেককে। সে নেয়নি। জ্বরতপ্ত শরীর এখন আনচান করছে। জ্বর বাড়ছে, অনন্য বুঝতে পারে। স্টেশনের বাইরে থেকে তড়িৎ চা খেয়ে ফিরলো। অনন্যর জ্বরের কথা শুনে ম্লান হয়ে গেছে তার মুখ।

তড়িতের ফিসফিস কথা অনন্য শুনতে পেল। তার আধবোজা চোখ দেখে থমথমে হয়ে উঠছে আলোঠাকরুনের মুখ।

অনন্যর কপালে হাত রেখে তড়িৎ বলল, একশো তিন চার ডিগ্রি তো হবেই।

তড়িতের দুচোখে উদ্বেগ ঘনাল। গেরুয়ার আড়ালে তাকে শিশুর মতো দেখাচ্ছে। ওয়েটিংরুম প্রায় খালি। ঘরের অন্যপ্রান্তে কেউ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়। আলো ঠাকরুন তড়িৎকে বলল, তুমি একাই পরমানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এস। আমি কাল যাব।

তড়িৎ উঠে দাঁড়াল। গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে অনন্য বোঝে যে তার অসুস্থতার জন্যে আলোঠাকরুনের নির্ধারিত কোথাও যাওয়া হলো না। তা কেন হবে? সামান্য জ্বরে কাহিল হওয়ার পাত্র সে নয়।

অনন্য নিজেকে চাঙ্গা করতে চাইল। বলল, ঠাকরুন, তুমিও যাও। কয়েক ঘন্টা ঘুমোলে আমি ঠিক হয়ে যাব।

আমারও তাই ধারণা, তড়িৎ সায় দিল।

রুগি ফেলে আমি যাব না, ঠাকরুনের গলার দৃঢ়তা অনন্য বুঝতে পারে।

তড়িৎ উঠে যায়। তড়িতের দিকে অনন্য তাকাতে পারে না।

অনন্যর মাথার মধ্যে ঘন সবুজ জলস্রোত বইতে থাকে। ধীর, গম্ভীর সেই স্রোত। অবিরাম ছলছল শব্দ হচ্ছে। দিন শেষের আলোয় ভাসছে যমুনার জল। অনন্যর চেতনায় জগঝম্প বাজছে। দু'চোখ বুজে সে ভাবে, আমি কে? কোথা থেকে, কেন এখানে এলুম? কাকে খুঁজছি? তুহিন চ্যাটার্জী, অবিনাশ সান্যাল, অনন্য গুহ, কাউকে তো আমি চিনি না। নিজের সঙ্গেই আমার

পরিচয় হয়নি। তার মগজের কোটরের চারপাশের পৃথিবী, ছাব্বিশ বছরের জীবন, নানা স্মৃতি, সাধ, সাফল্য, ব্যর্থতা, মায়াময় গোধূলির আলোতে ঢুকে পড়ে। সব কিছু বিষণ্ণ আবছা করে দেয়।

অনন্যর মনে হয়, যমুনার জলে একটা নৌকোয় সে দুলছে। পাশে আলোঠাকুরন। ঠাকরুনের আলোয়ানের চন্দনসুবাসে ভরে উঠছে তার বুক।

অনন্য, কষ্ট হচ্ছে, ঠাকরুনের গলার শব্দে তার চটকা ভাঙে।

অনন্য চোখ মেলে দেখে, তার মুখর ওপর আলো ঠাকুরন ঝুঁকে রয়েছে। মাথার কাপড় খসে গেছে। একরাশ লালচে লম্বা চুল পিঠ আর বুকের ওপর লুটিয়ে রয়েছে। দু'চোখে বরাভয়।

অনন্যর দু'চোখ আবার বুজে যায়। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসে। ইঞ্জিনের শব্দ, যাত্রীদের কথাবার্তা, গুঞ্জনের মতো তার কানে এসে লাগে। গোটা পৃথিবী, পাহাড় পর্বত সমুদ্র, অরণ্য তার দিকে প্রলয়ের মতো ছুটে আসতে থাকে। বাতাসে কান ফাটানো হাহাকার। জলোচ্ছ্বাসে সে কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। আতঙ্কে চোখ খুলে অনন্য দেখল, সামনে পদ্মাসনে বসে আছে আলো ঠাকুরন। ঋজু, সটান শরীর, ধ্যানমগ্ন। দু'চোখ মুদ্রিত। দু'হাতে জপের মুদ্রা, ঠোঁট দুটো সামান্য নড়ছে। উজ্জ্বল দীপশিখার মতো ঠাকরুনের জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। অনন্য আর তাকাতে পারে না।

বোধহয় মাঝরাতে তার ঘুম ভাঙল। ওয়েটিংরুমে সারি সারি ঘুমন্ত মানুষ। চোখের দু'টো পাতা খুলে রাখতে তার কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ সে খেয়াল করে ঠাকরুনের বিছানা খালি। ঘরের মধ্যে কোথাও ঠাকরুন নেই। মাঝরাতে গেল কোথায়? ঘোলাটে মাথায় অনন্য কিছু ভাবতে পারলো না। মাথার মধ্যে সোনার সুতোয় বোনা নক্সাটা দুলতে থাকে। সে ভাবে, এখানে আমাব আসার কথা নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ যে টানে এসেছে, আমি তার শরিক নই। তবু এই মানুষগুলো আমাকে টানছে কেন? কোথা থেকে এল আলোঠাকরুন? তার বৈরাগ্য, সাধনসঙ্গী যুবক সাধু, চন্দনগন্ধের দুর্ভেদ্য আড়াল, কেন আমাকে আলোড়িত করছে? ছাব্বিশ বছরের অকিঞ্চিৎকর জীবনে অনন্য ঝড়ের শব্দ শুনতে পেল। যমুনার সবুজ জলে আকাশচুম্বী ঢেউ ফুলে ফুলে উঠতে থাকে।

কলঘর থেকে আলোঠাকরুনকে বেরোতে দেখে অনন্য বুঝলো, পৌষের মাঝরাতে ঠাকুরন আবার স্নান করল। চুলে, কপালে ফোঁটা ফোঁটা জল লেগে আছে। মুখচোখে ক্লান্তির চিহ্ন নেই।

ঠাকরুন আসতে সদানন্দজী নিজের বিছানায় উঠে বসলো। সদানন্দর ওপর অনন্যকে দেখার ভার দিয়ে ঠাকরুন স্নানে গিয়েছিল। সদানন্দ ঘুমোয়নি। বৃদ্ধ মানুষটা ঠাকরুনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। সদানন্দর মাথায় হাত রেখে দু'চোখ বুজে আলো ঠাকরুন উচ্চারণ করলো নমো শ্রী নারায়ণঃ।

দু'জনে নিচু গলায় গল্প শুরু করল।

সদানন্দ বলল, মাতাজী, টাকার শোকে আমি কাঁদিনি। এই মহাতীর্থের হাল দেখে জল পড়েছিল আমার চোখ থেকে। পাপীতাপী, গরিব লোকে আমাদের গাঁ ভর্তি, সেখানেও চুরি হয় না। আর পুণ্যাত্মার এই সমাবেশে এমন হয় কী করে?

আলোঠাকুরন হাসলো না। অবাক চোখে সদানন্দকে দেখে বললো, তুমি সত্যিকারের ভক্ত।

পরদিন সকালে আলো ঠাকরুন, তড়িৎ কোথাও বেরিয়েছিল। বিস্বাদ মুখ নিয়ে ফাঁকা ওয়েটিংরুমে শুয়ে অনন্য সাত পাঁচ ভাবে। ঘরের মধ্যে আরো দু'তিনজন মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে। রোদ এসে পড়েছে পূবদিকের প্ল্যাটফর্মে।

বাসবীকে নিয়ে জনমেজয় ওয়েটিংরুমে ঢুকেলো। বিরাট, শূন্য ঘরে ঢুকে বাসবী প্রথম নজর করলো অনন্যকে।

অসুস্থ অনন্যর পাশে কম্বলের ওপর বসে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে তোমার? বাসবীর গলায় উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

অনন্যর বিচারবুদ্ধি পরিষ্কার কাজ না করলেও বাসবী, জনমেজয়ের একসঙ্গে আসার কারণ অনুমান করার চেষ্টা করলো।

বাসবীর মুখে শুনলুম, কাল তুমি অবিনাশ সান্যালকে দেখেছিলে, নিচু গলায় জনমেজয় জানতে চাইলো।

অনন্যর দুর্বল মাথায় প্রশ্নটা কোনো ছাপ ফেলে না।

অচেনা একজন লোক কাল দুপুরে তার কাছে একটা পথের হদিশ চেয়েছিল। তার নাম পরিচয় অনন্য জানে না। লোকটা, অবিনাশ সান্যাল, এমন কথা জোর দিয়ে বলে কী করে

বাসবী বলে, ওর শরীরে বেশ জ্বর। এসব কথা এখন থাক।

ক্লান্ত গলায় অনন্য জবাব দেয়, এমন কিছু হয়নি। সেরে যাবে।

জনমেজয়ের মুখ খুশিতে ঝকঝক করছে। সে বলে, বাসবীকে কথা দিয়েছি যে অবিনাশ যদি জীবিত থাকে, তাকে আমি খুঁজে বার করবই।

বাসবী সাড়া করে না। জনমেজয় বলে যায়, কাল সারা বিকেল, সন্ধে অবিনাশের খোঁজে আমরা দু'জন মেলা চষে ফেলেছি। তারপর সারা সাত জনসনগঞ্জের সেই বাড়িটার ওপর চোখ রেখে রাস্তায় বসে থেকেছি। কিন্তু কোথায় অবিনাশ? গোঁফওলা একজন তাগড়াই চেহারার মানুষ ছাড়া সে বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো পুরুষ দেখিনি।

বাসবী বোধহয় এসব আলোচনায় লজ্জা পাচ্ছিল। জনমেজয়কে থামাতে চাইছিল সে। জনমেজয় থামলো না। বললো,

আসল অসুবিধে হলো, বাসবীর কাছে অবিনাশের কোনো ছবি নেই। বর্ণনা শুনে একজন অদেখা লোককে খুঁজে বার করা মুশকিল। তোমাকে সঙ্গী পেলে হয়তো অবিনাশকে ধরা যেত।

অনন্য বললো, আমি কাল পরশু সেরে যাব। আপনার সঙ্গে তখন ঘুরতে অসুবিধে হবে না।.

জনমেজয় বলে, কাল কিছুটা হেঁটে বাসবী ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়ল। তারপর আমি একাই খুঁজেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে কেমন ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। একসময় যাকে দেখছি, মনে হচ্ছে সেই অবিনাশ। আমার চারপাশে হাজার হাজার অবিনাশ। দু'চোখ বুজে জনমেজয়ের কথাগুলো অনন্য শুনে যায়। পলকের জন্যে দেখা সেই অপরিচিত মানুষটার মুখ ভাবার চেষ্টা করে। মাথার মধ্যে পারদের মতো ভারী রক্তস্রোত ধীর গতিতে বয়ে যায়। অনেক ভেবেও সেই মুখ মনে করতে পারে না। জলজ্যান্ত অবিনাশ তার স্মৃতির মধ্যে কখন যেন হাওয়া

হয়ে গেছে। অবিনাশের জায়গায় ভেসে উঠছে তুহিনের মুখ। স্পষ্ট, নিখুঁত রক্তমাংসের তুহিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জনমেজয় নানা কথা বলছে। সব কথা অনন্য পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও জনমেজয়ের গলার উদ্দীপ্ত স্বর শুনে নতুন লাগে। জনমেজয় যেন মন্ত্রবলে অভীষ্টের সন্ধান পেয়েছে। এইরকম একটা মহৎ দায়িত্ব মাথায় নেওয়ার জন্যে এতদিন সে অপেক্ষা করছিল। মুহূর্তে বাসবীর ওপর সব দাবি ছেড়ে দিয়েছে।

অনন্য ভাবে, এটা কেমন করে হয়? চব্বিশ ঘন্টা আগে যে মানুষ, একজন মহিলার জন্যে অস্বাভাবিক আচরণ করছিল, অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রেমিকার স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে সে কিভাবে এতটা বদলে যায়? প্রেমিকার হারানো স্বামীকে উন্মাদের মতো খুঁজে বেড়ানো এক ধরনের পাগলামি। জনমেজয়কে অনন্য বুঝতে পারে না।

ওয়েটিংরুমের দরজার মুখে আলোঠাকুরন আর তড়িৎকে দেখা যায়। প্রয়াগে স্নান সেরে তারা ফিরছে।

জনমেজয় আর বাসবীকে দেখে ঠাকরুনের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। দরজার সামনে একটু থমকে দাঁড়ায়।

জনমেজয় হাত তুলে ঠাকরুনকে নমস্কার করে।

ঠাকরুন বলে, নমো শ্রীনারায়ণঃ।

হাতের কোষাকুষি থেকে ফুল, বেলপাতা নিয়ে অনন্যর মাথায় হাত রেখে দু'চোখ বুজে ঠাকরুন নিঃশব্দে জপ করে। ঠাকরুনের মুখে স্নিগ্ধ লাবণ্য। মুহূর্ত আগের উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই। ঘরের মধ্যে গভীর স্তব্ধতা।

জপ শেষ করে জনমেজয়, বাসবীর সঙ্গে ঠাকরুন একটা কথাও বলল না। ভিজে কাপড়, গামছা শুকোতে দেওয়ার জন্যে প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে গেল।

বাসবী, জনমেজয় ঠাকরুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনন্যকে আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ বাসবী তোলে না।

ঠাকরুনের অসামাজিক আচরণে অনন্য একটু ক্ষুণ্ণ হয়। এত উদার মহিলা কী করে এমন নিষ্ঠুর হয়, বুঝতে পারে না।

বাসবীকে লক্ষ্য করে অনন্য বলে, সুস্থ হয়ে আপনাদের আশ্রমে যাব।

জনমেজয়, বাসবী চলে যাওয়ার কিছু পরে আলো ঠাকরুন ফিরে এল। অনন্যর জন্যে মিষ্টি কিনে এনেছে।

অনন্য মিষ্টি খেল। ঠাকরুন জিজ্ঞেস করে, ওরা এসেছিল কেন?

বিস্মিত হলেও অনন্য বলল, আমার খোঁজে।

ঠাকরুন দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। অনন্যর মনে খটকা লাগে। ঠাকরুন কেন প্রশ্নটা করল, ধরতে পারে না। অনন্যর খোঁজ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে কি জনমেজয়, বাসবীর আসা সম্ভব? হয়তো সম্ভব। কারণটা অনন্যর জানা নেই। কারণটা কি ঠাকরুন জানে? অনন্যর মুখ থেকে ঠাকরুন হয়তো কারণটা শুনতে চেয়েছিল। অসুস্থ অনন্যর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ঠাকরুনের দিকে তাকায় না।

আটচল্লিশ ঘন্টা পরে অনন্যর জ্বর ছাড়তে ঠাকরুনের মুখে খুশি আর ধরে না। ঠাকরুন

রসিকতা করে বললো, তোমার সব গুপ্ত কথা জেনে গেছি। জ্বরের মধ্যে সব বলে ফেলেছ।

সদানন্দজী ঠাকরুনের খুব নেওটা হয়ে গেছে। সে বলে, বহুত বুরা বিমারসে মাতাজীকো কৃপাসে বাঁচ গয়া।

ঠাকরুনকে তার প্রণামের ঘটা আরো বেড়েছে। সদলবলে স্নানের জন্যে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অনন্যকে আলো ঠাকরুন বলে, আরো একদিন হাঁটাচলা নয়। বিছানায় শুয়ে থাকবে।

সুবোধ বালকের মতো অনন্য ঘাড় নাড়ে।

ফাঁকা ঘরে কম্বলে শুয়ে অনন্য প্রত্যাশা করে, জনমেজয়, বাসবী আবার আসবে। তাদের খোঁজাখুজির ফলাফল জানার জন্যে সে দারুণ ব্যগ্র। মাঝে মাঝে মনে হয় জনমেজয়ের সঙ্গী হলে অবিনাশকে খোঁজার নাম করে সে তুহিনের তল্লাশ চালাতে পারতো। জনমেজয়, বাসবী তার চালাকি ধরতে পারত না। কাজের সুবিধে হতো। এই পৃথিবীতে নিরুদ্দিষ্ট কোনো বন্ধুকে একা খুঁজে বার করা কঠিন কাজ। পাশে একজন সহযোগী থাকলে দুঃসাধ্য কাজও মানুষ অবলীলায় করতে পারে। সঙ্গী পাওয়ার সুযোগও এসেছিল। উটকো অসুখে অনুসন্ধানের কাজটা সাময়িকভাবে আটকে গেল। জনমেজয়, বাসবী, কি অবিনাশের নাগাল পেয়েছে? তাদের সাফল্য আর ব্যর্থতার সঙ্গে অনন্য নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। বিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া স্বামীকে যদি বাসবী খুঁজে পায়, তাহলে সে কেন পাঁচ বছর আগে নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর হদিশ পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে। এই সব মুহূর্তে জনমেজয়ের জন্যে অনন্যর কষ্ট হয়। বেচারি জনমেজয়! ওর কী হবে? লোকটা কি বোকা, না সন্ন্যাসী?

রুপোলি রেললাইনের ওপর লুটিয়ে আছে রোদের ঢেউ। আলোয় ঝকঝকে ধাতব পাতের মধ্যে থেকে রুপোলি কণিকা ঠিকরে বেরোচ্ছে। স্নান সেরে আলো ঠাকরুনের ফেরার সময় হলো। পোস্টকার্ড নিয়ে অনন্য কলকাতায় চিঠি লিখতে বসেছে। কিছু টাকা দরকার। ঠাকরুনের ঘাড়ে চেপে দিন কাটাতে তার লজ্জা করছে। তার ওপর রোগ, জ্বরের ঝকমারি। ওষুধ পথ্যে ঠাকরুনের কিছু টাকা খসেছে। অনন্য ঠিক করেছে, কলকাতায় ফেরার আগে পাঁচিশ, ত্রিশ টাকা ঠাকরুনের হাতে দিয়ে যাবে। ঠাকরুন যদি নিতে না চায়, সেই টাকায় সদানন্দজীর ট্রেনের টিকিট কিনে দেবে। আলো ঠাকরুনের চাপ হালকা করতে পারলে সে একটু স্বস্তি পায়।

সব ঘটনা জানিয়ে কলকাতায় হীরেনের নামে অনন্য চিঠি লিখে ফেললো। টেলিগ্রাম মানিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছে। প্রয়াগ ছাড়ার আগে টাকাটা দবকার। না পেলে কেলেংকারি হবে। অনন্য জানে, তার চিঠি পেলে পঞ্চাশ, একশো টাকা পাঠাতে হীরেন দেরি করবে না। হীরেন কি আজকের বন্ধু! আজন্ম কেটেছে এক পাড়ায়। স্কুল, কলেজে ছাড়াছাড়ি হয়নি। হয়েছে আরও পরে। হীরেন বড় চাকরি করলে কি হবে, তার বন্ধুপ্রীতি কমেনি। চিঠি লেখা শেষ হওয়ার আগে ঘরে ঢোকে কেষ্টনগরের কর্তা। কর্তার হাঁটা চলায় সতর্ক, সন্দেহজনক ভঙ্গি। চিঠির ওপর দু'চোখ রেখে অনন্য বুঝতে পারে, কর্তার খরদৃষ্টি তাকে জরিপ করছে। অনন্য মুখ তোলে না। অবাক হয়। আলোঠাকরুনের সঙ্গে কর্তা গিন্নিও স্নানে গিয়েছিল। কর্তা ফিরে এল, বাকিরা কোথায়? নিজেদের বোঁচকা আর মালপত্রের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে একটা স্টিলের ট্রাঙ্ক খুলে কর্তা কিছু বার করে পকেটে রাখলো। ওয়েটিংরুমের দরজায় চোখ পড়তে অনন্য দেখলো, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কদাকারদর্শন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর বাঁ হাতটা কনুই থেকে কাটা। কপালে লম্বা, গভীর পুরনো ক্ষতের দাগ। দেখে মনে হয়, মাথাটা দু'টুকরো

হয়ে যাওয়ার পরে অনক কষ্টে জোড়া লাগানো হয়েছে। একমুখ দাড়ি গোঁফ। হয়তো গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের আড়ালে আরো ভয়াবহ ক্ষতের চিহ্ন লুকোনো আছে। লাল পোশাক পরা সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ চোখে কর্তার দিকে তাকিয়ে আছে। পিশাচসিদ্ধ জীবটাকে কেষ্টনগরের কর্তা জোটালো কোথা থেকে! এর সঙ্গে কর্তার প্রয়োজন কী? স্টিলের ট্রাঙ্কে চাবি দিয়ে ওয়েটিংরুম থেকে কর্তা বেরোবার সময় অনন্য জিজ্ঞেস করলো, ওরা ফিরবেন কখন?

অনন্যর গলা শুনে কর্তা ভড়কে গিয়ে বললো, দু'দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবে।

বাইরে দাঁড়ানো সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে কর্তা নিচু গলায় জানালো, উনি দারুণ ক্ষমতাবান, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। আমার মুখ দেখে মনের কথা বলে দিলেন।

কর্তা আর দাঁড়াল না। ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে গেল। কর্তার সঙ্গী মহাপুরুষটিকে অনন্যর পছন্দ হলো না। কর্তার আচরণও অদ্ভুত। স্ত্রীকে প্রয়াগের ঘাটে রেখে অচেনা কাপালিকের সঙ্গে কী শলাপরামর্শ করছে, কে জানে! গিন্নির দুঃখের খবর অনন্য জানে। বিয়ের বিশ বছর পরেও নিঃসন্তান। পূণ্যক্ষেত্রের অমৃতে বন্ধ্যাত্ব মোচন হবে, এই বিশ্বাসে গিন্নির হতাশা এই ক'দিনে কেটে গেছে। ঠাকরুনের কথায় এখন গিন্নি ওঠা বসা করে। গিন্নির বিশ্বাস, এই সংকটে একমাত্র ঠাকরুন পথ দেখাতে পারে। মেলা প্রাঙ্গণে ফেলে যাওয়া নবজাত শিশুর খবর ঠাকরুনের মুখে শুনে গিন্নি প্রথমে গম্ভীব হয়েছিল। বাৎসল্যের পাশাপাশি মনে জেগেছিল দ্বিধা আর সংস্কার। নিজের জঠরে সন্তানধারণে যে সুখ আর যন্ত্রণা আছে, মাতৃত্বের অহমিকা আছে, এগুলো বাদ দিয়ে মা হলে নারীত্ব বিচলিত হয়।

আলো ঠাকরুন বুঝিয়েছিল, পেটে ধরলেই সন্তানের মা হওয়া যায় না। স্নেহ, মমতা দিয়ে যে কোনো শিশুকে মানুষ করে তুমি তার মা হতে পারো। গৌরী, পদ্মা, শচী ইত্যাদি ষোড়শ দেবী তাই আমাদের মা।

কর্তা যে রাজি নয়, গিন্নি জবাব দিয়েছিল।

বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল গিন্নিকে। শয্যাশায়ী অনন্য দু'জনের অনেক কথা শুনেছে। গিন্নি বলছিল, ডাক্তার বলেছে, আমার কোনো দোষ নেই। কর্তা সেটা মানতে রাজি নয়। কর্তার ধারণা মেয়েরাই বাঁজা হয়, পুরুষ হয় না।

আমি রাজি করাবো, আলোঠাকুরন বলেছিল।

রক্তবর্ণ পোশাক পরা তান্ত্রিকটার সঙ্গে কর্তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে অনন্য টের পেল, অজ্ঞাতকুলশীল কোনো শিশুকে পোষ্য নিতে লোকটা রাজি হবে না। বড়ো কঠিন ঠাঁই। আলো ঠাকরুনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কর্তার মাথায় কোনো মতলব আছে। দরকার হলে লোকটা মড়ার ওপর চেপে শবসাধনা করতে পিছপা হবে না।

সঙ্গীদের নিয়ে আলো ঠাকরুন ওয়েটিংরুমে ঢোকে। সদানন্দজী বলল, গঙ্গা মাইকী জয়! বাইরের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে হর হর বোম বোম ধ্বনি। আলো ঠাকুরনকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে। সদ্য লেখা পোস্টাকার্ডটা হাতে অনন্য বসে থাকে। আলো ঠাকরুন অনন্যর দিকে তাকাল। পোস্টকার্ডটা নজর করে ঠাকরুনের ঝলমলে মুখ কঠিন হলো। ধারালো দৃষ্টি মেলে অনন্যর সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কাকে চিঠি লিখছ?

ঠাকরুনের গলায় এক ফোঁটা স্নেহ নেই। ঠাকরুনের এতো রুক্ষ কণ্ঠস্বর অনন্য আগে শোনেনি। আশ্চর্য হয়ে সে বলে, এক বন্ধুকে।

হঠাৎ বন্ধুকে চিঠি কেন, ঠাকরুন জানতে চায়।

টাকার ব্যাপারটা ঠাকরুনের কাছে ভাঙতে অনন্য দ্বিধা করে। কয়েক লহমা মাত্র। ছুরির মতো দৃষ্টি মেলে ঠাকরুন তাকিয়ে আছে।

কিছু টাকা পাঠাতে লিখলুম, শান্ত গলায় অনন্য জানালো।

চিঠিটা পোস্ট করতে ওয়েটিংরুমের বাইরে এলো অনন্য। তার মাথার মধ্যে অশান্ত দাপাদাপি চলছে। কোমলপ্রাণা সন্ন্যাসিনী মাঝে মাঝে কেন এমন ভয়ংকরী হয়ে ওঠে? রহস্যের কিনারা পায় না সে।

আট

পুণ্যেযোগের আর আটচল্লিশ ঘন্টাও দেরি নেই। একশো চুয়াল্লিশ বছর পরে মকর, বৃহস্পতি, চন্দ্র আবার মিলিত হবে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রয়াগে স্নান করলে জন্ম জন্মান্তরের পাপ ধুয়ে যায়। রাস্তায় শ্বাসরুদ্ধ ভিড়। পুণ্যার্থীর সংখ্যা বোধহয় এক কোটি পেরিয়ে গেছে। ওয়েটিংরুমে তিলধারণের জায়গা নেই। ঘুম থেকে উঠেই অনন্য ঠিক করেছে, আজ একবার তেজেশানন্দের আশ্রমে যাবে। জনমেজয়, বাসবীর খোঁজ নেওয়া দরকার। অবিনাশ সান্যালেরই বা খবর কী? সেই অদ্ভুত লোকটার কোনো হদিশ কি জনমেজয় পেয়েছে?

তড়িৎ কোথাও গেছে। চিঠি নিয়ে সেই ঘটনার পর থেকে আলোঠাকরুনকে অনন্য এড়িয়ে চলতে চাইছে। ঠাকরুন আগের মতোই সহজ, আন্তরিক। অনন্যর সঙ্গে কথায়, আচরণে এতটুকু গলদ নেই।

আজকের দিনটা বিশ্রাম করলেই তো হতো, ঠাকুরন বলল। রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে এসে অনন্য নিজেও বুঝেছে, তিন দিনের জ্বরে শরীর বেশ কাহিল হয়েছে। মাথা ঘুরছে। তবু খানিকটা জেদের বশে বললো, আমি ভালো আছি। বিশ্রামের আর দরকার নেই।

ওয়েটিংরুমে বন্দী থেকে অনন্য হাঁপিয়ে উঠেছিল। মাথার ওপর আকাশ, চারপাশে থৈথৈ রোদ আর শীতের হাওয়া তাকে চঞ্চল করে তুললো। ঠাকরুনের ওপর অভিমান মনের মধ্যে জমা হয়ে ছিল। কথা না বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে অনন্য রাস্তায় এলো। হাঁটতে শুরু করলো।

অনন্যর সঙ্গ ঠাকরুন ছাড়লো না।

অনন্য যে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালো, সেখানে বিশাল উনুনের ওপর প্রায় আরো বড় এক লোহার হাণ্ডায় দুধ ফুটছে। দোকানের দেওয়ালে ল্যাঙট পরা কয়েকজন পালোয়ানের ছবি। এখানকার দুধ খেয়ে তারা এরকম স্বাস্থ্যবান হয়েছে।

ঠাকরুন বলে, তোমার এখন ভালো পথ্য দরকার। অনন্যর জন্যে ঠাকরুন একপোয়া দুধ হুকুম করলো।

ঠাকরুনকে পয়সা খরচ করাতে অনন্য সঙ্কোচবোধ করে। আজ অথবা কাল হীরেনের পাঠানো টাকা এসে যাবে। টাকাটা পেলে এখানকার ধারকর্জ মিটিয়ে নতুন কোনো ডেরায় গিয়ে উঠবে সে। ইচ্ছে হলে দু'চারদিন স্বামী তেজেশানন্দের আশ্রমে থেকে যাবে। অবশ্য এ জায়গাটা ছাড়ার অসুবিধে আছে। বোম্বে থেকে কলকাতা ফেরার পথে তাকে নেওয়ার জন্যে বিশ্বনাথদা এলাহাবাদে নামবে। হিসেব অনুযায়ী বিশ্বনাথদার এলাহাবাদে আসতে আরো তিন চার দিন দেরি। নিজের অস্বস্তিকর পরগাছা অবস্থাটা, সে মানতে পারছে না। সদানন্দজী এখন আলো

ঠাকরুনের অতিথি। ছাতুর বদলে নিয়মিত খিচুড়িভোগ খাচ্ছে। আলো ঠাকরুনের ওপর চাপ পড়ছে, অনন্য বুঝতে পারে। ক'দিন ধরে তড়িৎ গম্ভীর। কোনো কারণ আছে। এতো ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও এই সাধক যুগলকে অনন্য বুঝতে পারেনি। দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে হেঁয়ালি আছে। হেঁয়ালির কারণ যে ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিকতা নয়, অনন্য নিঃসন্দেহ।

মাঝে মাঝে ঠাকরুনের দু'চোখে গভীর সন্দেহ আর উদ্বেগ জমে ওঠে। থমথমে গম্ভীর মুখ ঠাকরুনের সঙ্গে তখন অনন্য কথা বলার সাহস পায় না। জনমেজয়, বাসবীর সঙ্গে ঠাকরুনের ব্যবহারে সেদিন অভদ্রতা ঢাকা থাকেনি। অনন্যর চিঠি লেখা নিয়েও ঠাকরুন সৌজন্যবোধ হারিয়েছিল। এতো নরম, মিষ্টি স্বভাব। ঠাকরুণের এই দ্বৈত চরিত্রের ব্যাখ্যা অনন্য করতে পারে না।

স্টেশনের মুখে আলোঠাকুরনকে পৌঁছে দিয়ে অনন্য তেজেশানন্দের ডেরার দিকে এগোল।

অনন্যকে দেখে শঙ্কর হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, কয়েকদিন আপনাকে দেখিনি। কোথায় ছিলেন?

জ্বর হয়েছিল, অনন্য জানায়।

ছাদের ওপর তরুণীর ঝাঁক ঘন হয়ে নিচু গলায় কথা বলছে। দিনকয়েক বাদে অনন্যকে দেখে তারা যে উত্তেজিত, বোঝা যায়। এই ঝাঁকের কার সঙ্গে তাকে গেঁথে ওরা স্বপ্নরাজ্য বানিয়েছে, অনন্য ধরার চেষ্টা করে। ভাসা ভাসা চোখ, শ্যামলা, নরম মেয়েটি এই কাল্পনিক নাটকের নায়িকা হতে পারে। অনন্য ভাবে, মেয়েটির সঙ্গে কি জীবনে কথা বলতে পারবো? উদ্যোগ নিয়ে কোনো অপরিচিত তরুণীর সঙ্গে আলাপ করার দুঃসাহস আজ পর্যন্ত আমি দেখাতে পারিনি। জীবনে হয়তো পারবো না। কথা বলার জন্যে তোমাদের আমন্ত্রণলিপিটাও হারিয়ে ফেলেছি। আমি চিরকালের অপদার্থ।

আকাশ পরিষ্কার, ঘন নীল রঙ। কোথাও ছিটেফোঁটা মেঘ নেই। সংক্রান্তির আগে জোর ঠাণ্ডা পড়েছে। চড়া রোদেও শীতলতা মরে না। এতোক্ষণ ধরে চেপে রাখা প্রশ্নটা অনন্য করে ফেললো।

শঙ্করকে জিজ্ঞেস করলো, জনমেজয়বাবু কোথায়?

শঙ্কর থমকে যায়। তাকে গম্ভীর দেখায়। বলে, পরশু বিকেলে জনমেজয়দাকে কমলা নেহেরু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেকি? কী হয়েছিল, অবাক অনন্য প্রশ্ন করে।

শঙ্কর বলল, ডাক্তার সন্দেহ করেছিল নিউমোনিয়া। পরে জানা গেছে ঠিক নিউমোনিয়া নয়, ওই জাতের কোনো রোগ। বাসবীদি সব জানে।

অনন্যর মনে হলো, শঙ্কর আরো কিছু বলতে গিয়ে চেপে গেল।

অনন্য জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ অসুখ হলো কেন?

ছায়া ঢাকা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শঙ্কর জানালো, জনমেজয়দা হঠাৎ খুব অনিয়ম শুরু করেছিলেন। কাউকে কোনো খবর না দিয়ে দু' রাত আশ্রমে ফেরেননি।

শঙ্করের গলার বিরক্তি টের পেতে অনন্যর অসুবিধে হলো না। অনন্যকে দেখে শঙ্করের মা খুশি হলো। বলল, ছাদে চা হচ্ছে। চলো আমার সঙ্গে।

শঙ্কর চা খায় না। তবু অনন্যর সঙ্গী হলো।

বাসবীদি কোথায়, অনন্য জিজ্ঞেস করলো শঙ্করকে।

বোধহয় ঘরে শুয়ে আছে, শঙ্কর বলল, দুপুরে কীর্তনের আসরে হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে গেছলেন। ঘন্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরল। এখন ভালো। ডাক্তার দু'দিন বিশ্রাম নিতে বলেছে।

পর পর চমক লাগানো অনেকগুলো খবর শুনে অনন্য বোবা হয়ে যায়। অবিনাশকে খোঁজার ধকলে দু'জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ধরতে পারে। আশ্রমের কেউ এই গুহ্য খবরের বিন্দুমাত্র জানে না। বাসবীর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্যে অনন্য ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকলো। হাসপাতালে গিয়ে জনমেজয়ের সঙ্গেও দেখা করা উচিত। অবিনাশ সান্যালের খোঁজে জনমেজয় কেন এভাবে নিঃশেষ করে ফেলছে নিজেকে! শুধু কি আবেগে, অথবা বাসবীর ওপর অভিমানে জনমেজয় নিজেকে তছনছ করেছে? জনমেজয় কি প্রতিশোধস্পৃহা মেটাচ্ছে?

অনন্যকে দেখে চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করে, কি ভায়া, অনেক দিন দেখিনি কেন?

অনন্য জবাব না দিয়ে হাসে। আসরে বসেও তার মাথায় জনমেজয়, বাসবী পাক খাচ্ছে। জনমেজয়ের সূত্রে এই আশ্রমের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। আজ জনমেজয় হাসপাতালে শয্যাশায়ী। অথচ তাকে দেখার জন্যে অনন্যর তাড়া নেই। আশ্রমের মানুষগুলো কম অদ্ভুত নয়। তাদের এক গুরুভাই কঠিন রোগে হাসপাতালে পড়ে আছে, এক গুরুভগ্নী অসুস্থ, তবু তাদের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। হাসি, ঠাট্টা, খোসগল্পে দিব্যি সকলে মশগুল। জনমেজয় আর বাসবী কি কোনো কারণে আশ্রমবাসীদের কাছে অচ্ছুৎ হয়ে গেছে! এমন হওয়ার কথা নয়। যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে তেজেশানন্দও তাঁর এই শিষ্য, শিষ্যাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু সেটাই বা কী করে সম্ভব? পাপী-তাপী অধঃপতিত শিষ্যকেও তো কোনো গুরু দূরে ঠেলে দেন না।

শ্যামলা রঙের তরুণী দু'চোখ নিচু করে অনন্যর হাতে এক কাপ চা তুলে দিল। সখিরা চোরা চোখে তাকিয়ে আছে। আশ্রমের আবহাওয়া দেখে অনন্যর মনে হয়েছে, এই মুহূর্তে জনমেজয়, বাসবী সম্পর্কে আগ্রহ দেখানো ঠিক হবে না। কিন্তু জনমেজয়, বাসবী ছাড়া আশ্রম নিয়ে তার উৎসাহ নেই।

আপনারা কবে ফিরছেন, অনন্য জিজ্ঞেস করে শঙ্করকে।

এক লহমা চুপ করে থেকে শঙ্কর বলে, আমি ফিরছি না, মা ফিরবে।

একা?

একা নয়। অনেকে কলকাতায় যাবে।

অনন্য আর খোঁচাতে সাহস পায় না।

শঙ্কর নিজেই বলে, কী আশ্চর্য কাণ্ড! মাকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি আশ্রমে এসেছিলুম। ফল হলো উল্টো। মা সংসারে ফিরে যাচ্ছে, আর সংসার সম্পর্কে আমার সব আসক্তি উবে গেল।

অনন্য কথা বলল না। বুঝতে পারে, শঙ্কর এখন নিজেই কথা বলবে। হলোও তাই। শঙ্কর আবার শুরু করলো, মা ঠিক করেছিল, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি আশ্রমের নামে দানপত্র করে দেবে। আমার ছেলেবেলায় বাবা মারা গিয়েছিল। মায়ের হাতে আমি বড় হয়েছি। মার ধারণা হয়েছিল, বয়সে বাড়লেও আমি মানুষ হইনি। আমার হাতে বাড়িঘর, সম্পত্তি নিরাপদ নয়।

ব নষ্ট হয়ে যাবে। আমার স্ত্রী, এক মেয়ের জন্যে সামান্য মাসোহারার ব্যবস্থা রেখে আশ্রমের নামে উইল পর্যন্ত মা তৈরি করে ফেলেছিল। বৌ মেয়ে নিয়ে আমি পড়লুম বিশ বাঁও জলে। দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না। গুরুদেবের নামে কী গালমন্দ না করেছি! তারপর একদিন পুরীর আশ্রমে মাকে ধরার জন্যে হাজির হলুম। অনেক চাপাচাপিতেও সংসারে ফিরতে মা রাজি হলো না। আমিও নাছোড়বান্দা। মাকে না নিয়ে কলকাতায় ফিরবো না। অনুভব করলুম সংসার সম্পর্কে আমার আগ্রহ ক্রমশ কমে আসছে। বৌ, মেয়ের মুখ স্পষ্ট মনে পড়ছে না। তখনই পরিচয় হলো গুরুদেবের সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিলুম। ব্যস, সংসারের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কয়েকমাস বাদে মা কলকাতায় ফিরে আমার স্ত্রীর নামে সব সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিলো। মা ভাবলো, এবার শঙ্কর নিশ্চয় ঘরে ফিরবে। তা কি আর হয়!

হরহর গঙ্গা শব্দ তুলে একদল সন্ন্যাসী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। ভাবাপ্লুত শঙ্কর। বলল, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, বাস্তব সংসারটা কল্পবাস। ঘরবাড়ি, আত্মীয় পরিজন, সব কিছু অনিত্য, অস্থায়ী। জীবন একটা মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়।

অলৌকিক রোমাঞ্চে শঙ্করের শরীর শিউরে ওঠে। অনন্যর রাগ হয়। স্ত্রী, মেয়ে সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে, পালিয়ে বেড়ানোর আধ্যাত্মিক কৌশলকে মনে মনে সে ঘৃণা করে। পরাজিত মানুষই সন্ন্যাসী হয়। জীবনের কঠিন পরীক্ষায় হেরে যাওয়া মানুষ সংসারকে গাল পাড়ে। শুকনো গলায় অনন্য প্রশ্ন করে, স্ত্রী, মেয়ের কথা আপনার মনে পড়ে না?

পড়ে, বিনা দ্বিধায় শঙ্কর জানায়, আবার ভুলে যাই।

ভুলে যাওয়ার আগে কষ্ট হয় না? অনন্য খোঁচায়।

হয়, শঙ্কর বলে, তখনই জন্ম, মৃত্যু আর আত্মার চিন্তা মাথায় আসে। পৃথিবীর চেহারা বদলে যায়।

অনন্য কথা বলতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু আত্মার প্রশ্ন তুলে তুহিন একদিন সংসার ছেড়েছিল। অনন্যর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। সে দেখলো, তার সামনে শঙ্কর নয়, হাসিমুখে তুহিন দাঁড়িয়ে আছে। অভিভূতের মতো অনন্য বসে থাকে। শঙ্কর চলে যায়। অনন্য অনুভব করে, রাস্তা, মানুষ, সৌরলোক, মহাকাল স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে।

মেয়েলি গলার ডাকে অনন্যর ঝিমধরা ভাব কেটে আসে। ধড়মড় করে—উঠে বসলো। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নাকি, অনন্য ভাবে। খাটিয়ার পাশে দাঁড়ানো সেই শ্যামলা তরুণী বললো, বাসবীদি আপনাকে ডাকছে।

মেয়েটির মুখে আবছা হাসি। কথা শুরু করার প্রতিযোগিতায় অনন্যকে হারিয়ে দেওয়ার দেমাক তার মুখে ছড়িয়ে আছে। অনন্য তার সঙ্গে আশ্রমে ঢুকলো। আশ্রমে দুপুরের ভোগ শুরু হয়েছে। সবাই ছাদে ব্যস্ত। অন্য কিছু খেয়াল করার সময় কারো নেই। প্রথম দিনে দেখা সেই ছোটো ঘরটার দিকে আঙুল তুলে মেয়েটি বলে, ওখানে যান।

অনন্য কিছু বলতে গিয়ে চুপ হয়ে যায়।

তরুণীর চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। অনন্যর মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে তক্তপোশে বাসবী বসে ছিল। পশ্চিমদিকের খোলা জানলা দিয়ে একফালি রোদ তক্তপোশের ওপর এসে পড়েছে। অনন্যর মনে হলো, বাসবী কোথাও যাওয়ার জন্যে

তৈরি হচ্ছে। কালো পেড়ে শাদা তাঁতের শাড়ি, কালো ব্লাউজ, মাথার চুল আলগা খোপা বাঁধা, প্রসাধনহীন মুখে ক্লান্তির ছাপ, অথচ দু'চোখে সজীব দৃষ্টি, বাসবীকে অসুস্থ মনে হলে না।

বাসবী এক পলক অনন্যকে দেখলো। রাতারাতি গভীর হয়ে উঠেছে বাসবীর দৃষ্টি।

তার চোখের দিকে তাকাতে না পেরে অনন্য বললো, জনমেজয়বাবুকে দেখতে যাবো হাসপাতালের ওয়ার্ড আর বেড নাম্বারটা দিন।

অনন্যকে আপাদমস্তক দেখে বাসবী বললো, আমি হাসপাতালেই যাচ্ছি। আমার সঙ্গে এস

আশ্রম থেকে বেরোবার মুখে সদর দরজায় একজন প্রবীণ মানুষ বাসবীকে বললে আপনাকে আটচল্লিশ ঘন্টা বিছানা থেকে না ওঠার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন গুরুদেব।

গুরুদেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, বাসবী জানালো। তারপর সাবলীল পা ফেলে রাস্তা নেমে এলো।

রিক্‌শায় বাসবীর পাশে বসে অনন্য কী বলবে ভেবে পায় না। মাথার মধ্যে একটাই প্রশ্ন অবিনাশবাবুর হদিশ কি পাওয়া গেল? প্রশ্নটা সে সরাসরি করতে পারে না। হয়তো অবিনাশের খবর মেলেনি। পুরনো ক্ষতে খোঁচা দিয়ে লাভ কী! জনমেজয় সম্পর্কে দু'চার কথা বলা যায় কিভাবে শুরু করবে?

অনন্য জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন?

অনন্যর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাসবী জিজ্ঞেস করলো, আমি খুব খারাপ, তাই না?

এমন প্রশ্নের জন্যে অনন্য তৈরি ছিল না। সে হকচকিয়ে গেল। কী বলবে, ভেবে না পেয়ে শুকনো ঠোঁটে জিভ বোললো।

অনন্যর জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে বাসবী বললো, তোমার চোখে আমি হয়তো খু স্বার্থপর, কিন্তু এছাড়া আমার কী উপায় ছিল, তুমি বলো।

বাসবীর বুকের ভেতরের শব্দ অনন্য শুনতে পেল। আরও কিছু বলতে গিয়ে বাসবী সামলে নেয়। বাসবীর শরীরের মৃদু তাপ অনন্যকে স্পর্শ করে। অনন্যর মনে হয়, বাসবীকে দু'চা কথা বলা উচিত। অবিনাশ সান্যালের খোঁজে আজ থেকে নেমে পড়তে চায় সে। ইচ্ছেটা বাসবীকে জানানো উচিত। বাসবীর সব দায়িত্ব জনমেজয়ের ওপর ছেড়ে দিতে সে নারাজ অসুস্থ জনমেজয়ের পক্ষে এখন হাঁটাচলা সম্ভব নয়। অনেক ভেবেও অনন্য একটা কথা উচ্চার করতে পারলো না। বোবা হয়ে থাকলো। বাসবীর সঙ্গে আগে একদিন অনন্য রিক্‌শ চেপেছে গায়ে গা লাগিয়ে বাসবীর শরীরের অস্থির কাঁপুনি টের পেয়েছে। আজকের তাপ অন্যরকম বাসবীর শরীরে সেদিনের ঢেউ আজ নেই। মৃদু তাপ ছড়িয়ে পড়ছে।

দোতলার ওয়ার্ডে বাসবীর সঙ্গে অনন্য পৌঁছে গেল। তিনটে থেকে রুগীদের সঙ্গে দেখা করার সময়। সাক্ষাৎকার শেষ পাঁচটায়। মেলার জন্যে আইন কানুন একটু আলগা হয়েছে ওয়ার্ডের ডান দিকে, প্রায় শেষ প্রান্তে ছত্রিশ নম্বর বেডে গলা পর্যন্ত কম্বল ঢেকে জনমেজ ঘুমোচ্ছে। মাথার কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার।

বাসবী বললো, পরশু রাতে অক্সিজেন দিতে হয়েছিল।

জনমেজয়ের মাথার পাশে করুণ মুখে বাসবী দাঁড়িয়ে থাকে। শীতের দুপুর চট করে ফুরিয়ে পৃথিবীতে ছায়া ঘনিয়েছে। শহরের এই দিকটা ফাঁকা। হাসপাতালের মধ্যে অনেক গাছগাছালি

দুনিয়ার তাবৎ পাখি একসঙ্গে কলরব জুড়ে দিয়েছে।

জনমেজয়ের ঘুমন্ত মুখে রোগের চিহ্ন নেই।

অনন্য বলে, মুখ দেখে তো কোনো অসুখের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

আলতো হাসি বাসবীর মুখে ভেসে ওঠে। তখনি জনমেজয় চোখ খুলে প্রথমে অনন্য, পরে বাসবীকে দেখতে পায়।

জনমেজয়ের মুখে খুশি উপচে পড়ে। তার হাতের ওপর অনন্য হাত রাখে। রুগীদের আত্মীয় বন্ধু দু'একজন করে আসতে শুরু করেছে।

কেমন আছেন, অনন্য জিজ্ঞেস করে।

তুমি কেমন, জনমেজয় পাল্টা প্রশ্ন করে।

একদম সুস্থ, অনন্য বলে, আপনার খোঁজ নিতে এসেছিলুম।

একপলক বাসবীকে দেখে জনমেজয় বলে, এতো গম্ভীর কেন আজ?

বাসবী সাড়া দেয় না। জনমেজয় বলে, অনন্যকে পেয়ে গেছি, আর ভাবনা নেই। একটু সুস্থ হয়ে অবিনাশ সান্যালের খোঁজে দু'জনে বেরবো। রাজি তো? জনমেজয় জিজ্ঞেস করে অনন্যকে।

অনন্য জবাব দেবার আগে বাসবী বললো, চুপ করুন। দয়া করে চুপ করুন।

জনমেজয় হতবাক, অনন্য বিস্মিত। দু'হাতে মুখ ঢেকে বাসবী ফোঁপাচ্ছে। ওয়ার্ডের মধ্যে এখনো লোকজন বেশি আসেনি। চারপাশে একবার নজর চালিয়ে অনন্য দেখে নিল। না, কেউ তাকাচ্ছে না। বিপন্ন জনমেজয় বিছানার ওপর উঠে বসতে গেলে দু'হাতে তাকে ধরে শুইয়ে দিয়ে বললো, অবিনাশ সান্যালকে খোঁজার দরকার নেই। শুধু তুমি সেরে ওঠো। তারপর দু'জনে গুরুদেবকে প্রণাম করব। আজ সকালে সব কথা গুরুদেবকে বলেছি।

দিনান্তের আলোয়, অথবা অন্য কারণে বাসবীর দু'গালে লালচে ছোপ ধরেছে। জনমেজয় বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। দু'চোখ তুলে জনমেজয়ের দিকে বাসবী তাকাতে পারে না। অনন্য বুঝতে পারে, এতোক্ষণ রিক্শায় যার পাশে বসেছিল সে মধ্যত্রিশের বাসবী নয়, সদ্য ঘুমভাঙা এক কিশোরী। আজ সারা পথ তাই তাকে একদম আলাদা লাগছিল।

বাইরে এক দঙ্গল পাখি ডাকাডাকি করছে। পাখিদের ধন্যবাদ। ছত্রিশ নম্বর বেডের নীরবতাকে তারা ভেঙে দিচ্ছে। অনন্যর মনে হলো, বাসবী, জনমেজয়কে একটু নিভৃতে থাকতে দেওয়া উচিত। সে চুপচাপ ওয়ার্ডের বাইরে বারান্দার দিকে এগোতে জনমেজয় জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছ?

একটু সিগারেট ফুঁকে আসি, অনন্য বললো।

হাসপাতালের চৌহদ্দির কিছুটা দূরে সিগারেটের দোকান।

তা হোক। অনন্যর তাড়া নেই। খুশিতে তার মাথার মধ্যে এক অথৈ সরোবরে হাজার রক্তকমল ফুটে উঠেছে। সিগারেট ধরিয়ে অনন্য ভাবে, এমন এক সাহসী সিদ্ধান্ত বাসবী কখন নিল? হয়তো কাল বেহুঁশ হওয়ার আগের মুহূর্তে বাসবী মনস্থির করেছিল। তারপর অজ্ঞান হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর আত্মসংবরণ করা কঠিন কাজ। হতেই পারে। আজ দুপুরে বাসবীকে দেখে অন্যরকম লেগেছিল। অথচ সে এমনি বোকা যে বাসবীর মুখ দেখে রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি। বাসবী এতোদিনে সত্যি অবিনাশ সান্যালের সন্ধান পেয়েছে।

বাসবীর খোঁজা এখন শেষ। বাসবী সফল, সার্থক। আসল অবিনাশ সান্যাল যদি বেঁচেও থাকে, বাসবীর জীবনে তার কোনো ভূমিকা নেই। সে অস্তিত্বহীন, ভূত। তখনই অনন্যর মনে পড়ে তুহিনের কথা। তুহিনকে এতো খুঁজেও সে ধরতে পারেনি। পারবে কিনা, সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় কোনো মানুষ কি তুহিনের শূন্যতা ভরাতে পারে? তুহিনের মা কি তাকে মেনে নেবে? অনন্য আবার আনমনা হয়ে যায়। ভাবে, বাসবী যদি তার অনুসন্ধানে সফল হয়, সে হবে না কেন? নিশ্চয় হবে। বাসবী আর জনমেজয়ের ঘটনা, তাকে নতুন উৎসাহ দেয়। অনন্য ঠিক করে, এখনি মেলার দিকে যাওয়া দরকার। রাস্তা ধরে সে হাঁটতে থাকে। পুরনো এক ব্যথা বুকের মধ্যে জেগে ওঠে। কে আলোঠাকুরুন? তার সঙ্গে দু'দিনের সম্পর্ক এক ঝলক হাওয়ার মতো আকাশে উড়ে যাবে। তবু কি আজব মানুষের মন, দু'চারদিনের এই চেনাজানা মান অভিমানের মায়া মানুষকে অবশ করে রাখে। সবটাই অলীক, কল্পবাস। তবু মিথ্যে নয়।

আলোঠাকরুন তার জন্যে উদ্বেগে, একটু কষ্ট পাক, রূঢ় কথা বলার জন্যে একটু অনুশোচনা করুক, অনন্য এটুকুই চায়। প্রত্যাশা খুব সামান্য হলেও তীর্থের এক ফোঁটা অমৃতেও যে পূর্ণকুম্ভের স্বাদ আর তৃপ্তি মেলে সে জানে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ক্রমশ মরে আসছে আকাশের আলো। রাস্তার ধুলোয় রঙের প্রলেপ লেগেছে। জনমেজয় আর বাসবীর মুখ তার মাথার মধ্যে ঝলমল করতে থাকে। রাস্তায় ভিড় বাড়ছে। লক্ষ লক্ষ সাদামাঠা মানুষের মধ্যে কোথাও একটা মিল আছে। সবাই এক গভীর ক্ষত নিয়ে ঘুরছে। নিরাময়ের খোঁজে ঘুরে মরছে। কোথা থেকে তৈরি হয় এই ক্ষত? সকলেই কি চোখের সামনে একজন জলজ্যান্ত, তাজা বন্ধুকে মরে যেতে দেখেছে? আক্ষরিক অর্থে হয়তো তা বন্ধুবিনাশ নয়। বিশ্বাসের মৃত্যু, কামনা বাসনা আকাঙক্ষার মৃত্যু, এবং আরো কত শত বিনাশ পৃথিবীতে আছে। যে কোনো বড়ো আঘাত, কষ্ট, মৃত্যুর সমান। মানুষকে তা মৌলিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। মানুষ তখন জন্ম, মৃত্যু এবং মরণোত্তর নানা জটিল প্রশ্ন নিয়ে হিমশিম খায়।

গভীর সঙ্কল্প নিয়ে অনন্য স্বর্গদ্বীপে ঢুকলো। সমুদ্রের লাগোয়া এক টুকরো জমিকে স্বর্গদ্বীপ নাম দিয়ে সেখানে সাধুদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বীপের নাম দেওয়া হয়েছে সাধুকল্প। তুহিনকে আজ খুঁজে পেতেই হবে। প্রতি আখড়ায় সাধুসন্ত, কল্পবাসী শিষ্য-শিষ্যার ভিড় উপচে পড়ছে। সব পুণ্যার্থী প্রয়াগে পৌঁছে গেছে। ফটক আর মণ্ডপগুলো ফুল, মালা, আলোয় সুসজ্জিত। কোথাও গীতার ব্যাখ্যা, কোথাও বেদপাঠ, নামকীর্তন হচ্ছে। তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাইকের আওয়াজ। স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজের আশ্রমে বেজায় ভিড়। ভিড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকে অনন্য দেখলো বছর পঁচিশের এক পরমাসুন্দরী যুবতী গীতার মায়াবাদ ব্যাখ্যা করছে। এমন রূপবতী মেয়ের মুখে বৈরাগ্যের কথা অনন্যর কানে বেমানান লাগে। অনন্য নিজের মনে বলে, তুমি নিশ্চয় কোনো মৃত্যু দেখেছো। সেটা ব্যক্তির মৃত্যু না হলেও আলাদা কোনো মৃত্যু। ভালবাসার মৃত্যুও হতে পারে। গীতাভারতী ক্যাম্প, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় মহাবিদ্যালয়ের মণ্ডপ ঘুরে অনন্য যে মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, সেখানে সেকুলারিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে এক সাধু। তার মতে সেকুলারিজম ইংরেজি শব্দ, নিছক বুকনি, কোনো মানে নেই। এই সব লম্বা চওড়া কথা পেড়ে বিধর্মী নাস্তিকেরা মানুষকে বোকা বানায়। সেকুলারিজম শব্দের অর্থ হলো, অগম্যাগমন, খাও পিও জিও। এ

জীবন একবার বৈ তো নয়!

অনন্য সেখান থেকে সরে যায়। আখড়ার পেছন দিকগুলো আজ সে ঘুরে দেখছে। অনেক সন্ন্যাসী আছে, যারা লোকচক্ষুর আড়ালে আশ্রমের অন্দরমহলে থাকতে চায়। এরা নির্জনতাপ্রিয় সাধু। সব আশ্রমের গর্ভগৃহে ধূপ ধুনোর ধোঁয়ায় আবছা অন্ধকারে এরকম দু'চারজন সাধু বসে আছে। সামনে থেকে তাদের মুখ দেখার উপায় নেই। তুহিন হয়তো তাদের মধ্যে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

কমবয়সি একজন সাধুকে অনন্য জিজ্ঞেস করে, আপনাদের আখড়ায় কোনো বাঙালি সাধু আছেন কি?

তরুণ সাধু জবাব না দিয়ে অনন্যর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। দশাসই চেহারা মাঝবয়সি এক সাধু ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

কেয়া মাংতা, অনন্যকে জিজ্ঞেস করে।

প্রশ্নটা অনন্য আবার করতে দৈত্যাকৃতি সাধু এমন হুঙ্কার ছাড়ে যে অনন্যর পিলে চমকে যায়। তার পায়ের তলায় মাটি কেঁপে ওঠে। সাধু বলে, আখড়ার ধারে কাছে তোমায় আবার যদি দেখি, মাটির সাত হাত নিচে পুঁতে রাখব।

অনন্য আর দাঁড়ালো না। নতুন একটা মতলব মাথায় খেলে যায়। প্রতিটা আখড়ার সামনে গিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় বলবে, নমস্কার স্বামীজী। আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমটা কোথায় বলতে পারেন?

তাই করতে শুরু করলো সে। তার কথা অধিকাংশ সন্ন্যাসী বুঝতে পারে না। গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী এমন অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিল যে অনন্য কানে আঙুল দিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

দু'পা ব্যথায় টনটন করছে, দুর্বল শরীরে সীমাহীন ক্লান্তি। মাথা ঘোরে। তুহিনের চিহ্ন নেই কোথাও। দাড়ি, গোঁফ, গেরুয়ার আড়ালে সব সন্ন্যাসী একরকম, জাতিপরিচয় হারিয়ে গেছে।

স্বর্গদীপে ঢোকার মুখে বিনি পয়সায় সংবাদপত্র পড়ার জায়গা নিঃশুল্ক বাচনালয়। একটা বড় টেবিল ঘিরে অনেকগুলো বেঞ্চ পাতা। টেবিলে ছড়ানো অনেকগুলো সংবাদপত্র। পড়ার কেউ নেই। ভারতবর্ষের নানা ভাষার একগাদা কাগজ থেকে বিশ্রামের জন্যে বাচনালয়ে বসে অনন্য একটা টেনে নিল।

ক্লান্তি কাটলে অনন্য আবার খোঁজার কাজ শুরু করলো। নিরঞ্জনী সম্প্রদায়ের আখড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নাগা সন্নাসীদের মণ্ডপটা আর একবার খুঁটিয়ে দেখতে দোষ কি! প্রথম দিনের মতো ধুনির ধোঁয়া আর গাঁজা, হাসিসের ধোঁয়াতে ভেতরটা ধূসর হয়ে আছে। আলো কম। মাঝে মাঝে অলৌকিক গলা উচ্চারণ করছে, অলখ।

সাঁইসাঁই শীতের হাওয়া বইছে। কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে।

একটা জিলিপিওলা চেঁচাচ্ছে, ঘি কে মালা, ঘি কে মালা।

অনন্য চারটে জেলেবি আর এক গ্লাস জল খেল। তার মনের গভীরে এতোদিনে হতাশা চারিয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে, তুহিনকে খোঁজা বৃথা। এভাবে তুহিনকে পাওয়া যাবে না। মূল্যবান কিছু এভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। আশাভঙ্গের কষ্টকর অনুভূতি তাকে ভয়ানক দুর্বল করে দেয়। মাথার মধ্যে সহস্র রক্তপদ্মে ভরা থইথই সরোবর অদৃশ্য হয়েছে। তুহিনের সঙ্গে

হয়তো এ জীবনে দেখা হবে না। সত্যি কি হবে না? অস্থির সংশয় বুকে নিয়ে অনন্য যখন রাস্তায় এসে ওঠে, তখন আকাশে বিরাট চাঁদ উঠেছে।

নয়

ওয়েটিংরুমের সামনে হৈহৈ উত্তেজনা। উজ্জ্বল আলোর নিচে অনেক মানুষের ভিড়। সকলে একসঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করায়, কারো কথা বোঝা যাচ্ছে না। ইউনির্ফম পরা জনা দুই রেলপুলিশ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনন্য ভেতরে ঢোকে। কেষ্টনগরের গিন্নির বিছানার পাশে স্ট্রেচার হাতে দু'জন উর্দিপরা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আলো ঠাকরুনের কোলে মুখ গুঁজে গিন্নি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। শুধু গোঙানির শব্দ। গিন্নি বলছে, মা, আমাকে আশ্রয় দিন। আপনার আদেশ শুনলে আজ আমার এই দুর্গতি হতো না। কোথায় সেই খুকিটা, আমি তাকে পোষ্য নেব।

কথার মধ্যে আলোঠাকরুনের কোলে গিন্নি বমি করে দিল। ঠাকরুন নির্বিকার। গিন্নির মাথায় সস্নেহে হাত বোলাচ্ছে। ওয়েটিংরুম খালি হয়ে গেছে। কেষ্টনগরের কর্তা, সদানন্দজী, তড়িৎ ছাড়া কেউ নেই। আলোঠাকরুনের কোলে শোয়া, অসুস্থ গিন্নির মুখ দেখে আতঙ্কে অনন্য হিম হয়ে যায়। মাত্র কয়েকঘন্টার তফাতে একজন মানুষের চেহারা এমন বদলে যেতে পারে, তার কল্পনায় ছিল না। অশুভ কোনো শক্তির কামড়ে গিন্নির শরীরের রক্ত উবে গেছে। কোটরে বসা চোখ, ভাঙা চোয়াল, পাথুরে ঝামার মতো রুক্ষ দুটো ঠোঁট, প্রেতিনীমূর্তি। অস্থিমজ্জা পর্যন্ত যেন গুঁড়িয়ে গেছে। গর্তে বসা দু'চোখের কোণে শুকিয়ে যাওয়া জলের দাগ।

বাহকেরা প্রায় জোর করে গিন্নিকে স্ট্রেচার তুলে নিল।

আলোঠাকরুনের দু'হাত ধরে গিন্নি বললো, মা, আমি আর বাঁচব না।

পরিষ্কার, স্পষ্ট উচ্চারণ। রোগ, জড়তা কেটে গেলে কণ্ঠস্বর এমন গভীর হয়। কথাগুলো যেন কথা নয়, দৈববাণী। অনন্যর অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিউরে উঠলো। আলোঠাকরুন সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেল না।

কর্তা বললো, মরা অত সহজ নয়।

কর্তার কথা গিন্নির কানে গেল না। অচেনা একজন লোক, সম্ভবত স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী হুকুম দিল, জলদি করো।

কর্তা সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি।

আলোঠাকরুন ধীর, অচঞ্চল। গিন্নির কানের কাছে মুখ এনে বললো, হাসপাতালে তোমার কাছে আমি থাকব।

ওয়েটিংরুমের বাসিন্দাদের কেউ কেউ দরজার বাইরে থেকে উঁকি দেয়। স্ট্রেচারের সঙ্গে আলোঠাকুরুন আর কেষ্টনগরের কর্তার পেছনে অনন্য বাইরে আসে। অ্যাম্বুলেন্সে গিন্নিকে তোলা হতে আলোঠাকরুনও উঠে বসলো।

অনন্য বলে, আমি যাব।

ঠাকুরুন বলে, দরকার নেই।

কর্তাকে বলে, আপনিও এখানে থাকুন।

অ্যাম্বুলেন্স চোখের আড়ালে চলে গেলে মাঝবয়সি কর্তা হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। দানন্দজী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। তড়িতের মুখে অনন্য ঘটনাটা শোনে। সন্ধেবেলায় াধুকল্পে অলৌকিক ক্ষমতাবান এক সন্ন্যাসীর কাছে কর্তা-গিন্নি ধর্ণা দিয়েছিল। সন্ন্যাসী রশুদিন থেকে গিন্নির জন্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ধুনি জ্বালিয়ে সন্তান কামনা করছে। আজ ছিল শষ দিন। সকাল থেকে উপোস করে সন্ধেবেলায় স্বামী-স্ত্রী সেই সন্ন্যাসীর কাছে যায়। প্রণাম, াচমন সেরে যজ্ঞের প্রসাদ, পায়েস খায় গিন্নি। তারপর ঘণ্টাখানেক না যেতেই এই বিপত্তি। ঘন্টায় পনেরো বার বমি, পায়খানা হয়েছে। ওয়েটিংরুমের বাসিন্দারা ভয়ে বিছানাপত্র নিয়ে ালিয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের ক্যাম্প অফিসে কেউ খবর দিতে সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স চলে াসে।

আলোঠাকরুন নিজের হাতে এতক্ষণ রুগীর পরিচর্যা করেছে।

বিড়ি ধরিয়ে তড়িৎকে নিজের দুঃখের কথা শোনাচ্ছে কর্তা। মুদির দোকান দিয়ে সংসার ালাই। রোজগারের পয়সায় নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ধার দেনা করে শুধু বংশ রক্ষার আশায় দেশ বিভুঁয়ে এসেছি। এখন ধনেপ্রাণে মরার দাখিল।

তড়িৎ বোঝায়, ভয় পাবেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলে সব বিপদ কেটে যায়।

অনন্যকে ডেকে তড়িৎ বলে, চলুন, চা খেয়ে আসি।

স্টেশনের অল্প দূরে এক ঝুপড়ি দোকান। তোলা উনুনে তৈরি চা, বিক্রি হয় মাটির ভাঁড়ে। স্তার চা, সবসময়ে কসকসে গরম থাকে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় চায়ের স্বাদের চেয়ে তাপ নেক জরুরি। জমাট ক্লান্তিতে অনন্যর শরীরের স্নায়ু, শিরা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আবছা অন্ধকার াস্তায় তড়িতের পাশাপাশি অনন্য চুপচাপ হেঁটে যায়। পাঁচ, ছ'দিন তড়িতের সঙ্গে বিশেষ কথা য়নি। তড়িৎ চাপা স্বভাবের ছেলে। তাছাড়া আলোঠাকরুন তাকে এমন আগলে রেখেছে, কে ামী, কে স্ত্রী, বোঝা দায়। গরম চায়ের ভাঁড় হাতে অনন্য বেশ আরাম পায়। চায়ের উষ্ণতা াতের পাতা বেয়ে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কোথায় ছিলেন সারাদিন, তড়িৎ জিজ্ঞেস করে।

মেলায়, অনন্য বলে।

আলোর ওপর অভিমান করেছেন নাকি, কৌতুক মেশানো গলায় তড়িৎ প্রশ্ন করে।

অনন্য চুপ। কি বলবে ভেবে পায় না।

তড়িৎকে জিজ্ঞেস করে, আপনি সেদিন যে চিঠিটা বাজারে ডাকবাক্সে ফেললেন, সে নিয়ে াকরুন কিছু বলেনি?

তড়িৎ বেশ ঘাবড়ে যায়। বলে, আলোর সামনে চিঠিটা লিখিনি।

নিচু গলায় তড়িৎ অনুরোধ করল, আমার চিঠির কথা দয়া করে আলোকে জানাবেন না।

চারপাশ নিঝুম হয়ে গেছে। অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনন্যর মনে হয়, তড়িৎ আর তার ঙ্গে কথা বলতে চায় না। তাড়াতাড়ি পালাতে চায়। অনন্য নাছোড়, জিজ্ঞেস করে, স্ত্রীকে এত য় পান কেন?

জবাব না দিয়ে তড়িৎ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চাপাস্বরে বলে, আমাদের সম্বন্ধে আপনার ব কৌতূহল, তাই না? আপনার চাউনি দেখে সেটা অনুমান করা যায়।

ওয়েটিংরুমের দিকে দুজনে এগোয়। অশ্বত্থ গাছের নিচে নিবিড় কালো ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে

তড়িৎ বলে, অপেক্ষা করুন। সব জানবেন।

রাত এগারোটা নাগাদ আলোঠাকুরুন ওয়েটিংরুমে ফিরে এসে স্নান করতে চলে যায় কৃষ্ণনগরের কর্তা অনেক কান্নাকাটির পর তখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে। রাতের খাওয়া শেষ করে কম্বলে শুয়ে তড়িৎ হাই তুলছিল। সদানন্দজী তুলসিদাস নিয়ে বসে আছে। গলায় শব্দ নেই। ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ওয়েটিংরুম ভালোভাবে সাফাই হবার পর বাসিন্দারা ফিরে এসেছে।

স্নান সেরে আলোঠাকুরুন দুটো বাতাসা, একঘটি জল খেল। ঠাকরুনের নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে অনন্যর বুক হুহু করে। প্রয়াগে আসার পরে অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এমন আশ্চর্য মানুষ চোখে পড়েনি। ধুলো ধোঁয়া ক্লেদ গ্লানির পৃথিবীতে এমন মহীয়সী চরিত্র কেমন করে উদয় হয়?

উনি আছেন কেমন, অনন্য জিজ্ঞেস করে।

ঘুমন্ত কর্তার দিকে একপলক তাকিয়ে ঠাকরুণ বলে, ভালো নয়।

তড়িৎ ঘুমিয়ে পড়েছে!

কোথায় ছিলে সারাদিন, ঠাকরুণ প্রশ্ন করে।

স্বর্গদ্বীপে, অনন্য জানায়।

ঘুম পেয়েছে? ঠাকরুণ জানতে চায়। উত্তরের অপেক্ষা না করে বলে, চল, একটু ঘুরে আসি

সোনার থালার মতো বিরাট চাঁদ মাঝ আকাশে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীতে নেমে এসেছে অপার্থিব নির্জনতা। ফিকে হলুদ রঙের কুয়াশায় পৃথিবীকে অচেনা লাগে। পীতাভ ছায়ায় চারপাশ বুঁদ হয়ে আছে। স্টেশন ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে ঠাকরুনের পাশাপাশি অনন্য হাঁটে। আগে কয়েকদিন, সকাল সন্ধ্যে, ঠাকরুনের সঙ্গে অনন্য এই মাঠে বেড়িয়েছে। পায়ের নিচে শিশির ভেজা মাটি, মাঝে মাঝে ঘাসের চাংড়া। পায়ের চাপে ঘাসের ডগা থেকে ঠাণ্ডা শিশির বিন্দু শরীরের ওপর লাফিয়ে ওঠে। বেরোবার আগে আলো ঠাকরুনের হুকুমে বিছানার লাল কম্বল তুলে অনন্যকে আপাদমস্তক মুড়তে হয়েছে। এত শীতেও ঠাকরুনের বিকার নেই। গেরুয়া আলখাল্লার ওপর এক টুকরো চাদরই যথেষ্ট।

কম্বল মোড়া অনন্যর কাঁপুনি দেখে মুচকি হেসে ঠাকরুন জিজ্ঞেস করে, শীত করছে

একটু, অনন্য জানায়।

চলো ফিরে যাই, ঠাকরুন বলে, সদ্য জ্বর থেকে উঠে ঠাণ্ডা লাগানো ভালো নয়।

জ্যোৎস্নামাখা রুপোলি কুয়াশা, নিঃশব্দ ফাঁকা মাঠ, এক আকাশ চাঁদ আর নক্ষত্রের পৃথিবী ছেড়ে ওয়েটিংরুমের বদ্ধ গর্তে ফিরে যেতে অনন্যর ইচ্ছে করে না। কুয়াশা ভেজা অন্ধকার মাঠে ঠাকরুনের পাশে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করে। ঠাকরুনের সঙ্গ নেশা ধরায়।

দু'জনে চুপচাপ হাঁটে। শীতের কামড় অনন্য টের পায় না। চটিজোড়া ছাপিয়ে ভিজে ঘাস পায়ের আঙুলে জড়িয়ে যায়।

অনন্যর মাথায় আবার বদখেয়াল চাপে। জিজ্ঞেস করে, তুমি হঠাৎ সন্ন্যাসিনী হতে গেলে কেন?

ঠাকরুন ঠোঁট টিপে হাসে। কী অসাধারণ হাসি! ঠাকরুনের হাসিতে জ্যোৎস্না চমকে ওঠে।

এতো আগ্রহ ভালো নয়, ঠাকরুন বলে।

খানিকটা মজা করার জন্যে অনন্য বলে, আমি সব জানি। তোমার গেরুয়া পরার গোপন খবর আমার নখদর্পণে।

অনন্যর কথা শেষ হওয়ার মুহূর্তে শান্ত পরিবেশ বদলে যায়। আলো ঠাকরুনের দু'চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। অনন্যর দু'টো কাঁধ দু'হাতে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঠাকরুন জিজ্ঞেস করে, কী জানো তুমি? বলো, বলতেই হবে। উত্তেজনায় ঠাকরুন থরথর করে কাঁপছে।

অন্ধকার, নির্জন মাঠে এমন সাংঘাতিক নাটকের জন্যে অনন্য তৈরি ছিল না। ঠাকরুনেরর ভীষণ মূর্তি তাকে পাথর করে দেয়।

অপমানিত অনন্য অশ্বত্থতলায় বাঁধানো বেদিতে গিয়ে বসে। দু'হাতে মাথা রেখে ঘাড় নিচু করে বসে থাকে। কয়েক মুহূর্ত পরে অনন্য বুঝতে পারে ঠাকরুন পাশে এসে বসেছে। অনন্য কথা বলতে পারে না। অভিমানে কণ্ঠনালী আটকে যায়।

পিঠের ওপর আলো ঠাকরুনের হাত নেমে আসে। আন্তরিক, স্নিগ্ধ স্পর্শ।

রাগ করলে? নরম, ভেজা গলায় ঠাকরুন প্রশ্ন করে।

অনন্য কথা বলতে ভরসা পায় না। জলস্রোতের মতো অভিমান, তার অস্তিত্বের মধ্যে ফুলে ওঠে। পূর্ণচন্দ্র মাথায় বেঁধে আদিগন্ত অন্ধকার মহাদেবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশ কী নীরব আর ঠাণ্ডা!

কথা বলবে না?

আলোঠাকরুন দু'হাতে অনন্যর মুখটা ধরে নিজের দিকে টেনে নেয়। ঠাকরুনের চোখে অনন্যর চোখ পড়ে। ঠাকরুনের ভিজে চুল, নাক, মুখ, লালচে ঠোঁটে অনন্যর দৃষ্টি আটকে যায়। চোখ জ্বালা করে। কান্নায় দু'চোখের পাতা ভিজে ওঠে। অনন্যর মুখটা দু'হাতে ধরে ঠাকরুন নিজের বুকে টেনে নেয়। গেরুয়া চাদর, আলখাল্লায় ঢাকা নিভৃত, নরম বুকে ডুবে যায় অনন্যর মুখ। তার মাথাটা চেপে ধরে ঠাকরুন বসে থাকে। অনন্যর চোখের জলে ঠাকরুনের বুক ভেসে যায়। চন্দনের গন্ধ তার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সব স্মৃতি, আকাঙ্ক্ষা ফুলের মতো ফুটে উঠতে থাকে। ঠাকরুনের বুকের নিরাপদ অন্ধকারে মৃত, বিস্মৃত মায়ের মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পায়। আবছা হয়ে যাওয়া তুহিনের মুখ পরিষ্কার মনে পড়ে। মাথার ওপর গাছের ডালে পাখিরা ডানা ঝাপটায়, শুকনো পাতার সঙ্গে টুপটাপ শিশির ঝরে পড়ে।

ঠাকরুনকে অনন্য বলে যায়, তার মৃত মায়ের কথা, তার কাঁধে মাথা রেখে কতো সহজে শিবু মরে কাঠ হয়ে গেল সেই কাহিনী। নিরুদ্দিষ্ট তুহিনের সন্ধানে দু'চোখের মণি ছিঁড়ে গেলেও তার ধরাছোঁয়া পায়নি। বিকারের রুগীর মতো অনন্য একটানা বকে যেতে থাকে। জীবনটা মায়া, না মতিভ্রম, সে জানে না। আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? মানুষের পরিণাম কী? অনন্যর প্রশ্ন শুনতে শুনতে গভীর দরদে তার মাথায় আলো ঠাকরুন হাত বোলাতে থাকে।

চন্দনের গন্ধে অন্ধকার ভরে আছে। মঙ্গলারতির ঘন্টা বাজছে বাতাসে। অনন্যর কপালে ছড়িয়ে আছে আলো ঠাকরুনের চুলের গুচ্ছ। দিব্য স্পর্শে তার জন্মান্তর ঘটে যাচ্ছে।

ওয়েটিংরুমে ফিরতে রাতের দ্বিতীয় প্রহর গড়িয়ে যায়। বন্ধ ঘরে নন্দনকাননের সৌরভ। পরিতৃপ্তিতে অনন্য বিভোর হয়ে থাকে।

ঠাকরুন বলে, এবার ঘুমোও।

তড়িতের দিকে চোখ পড়তে অনন্যর মনে হয়, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে তড়িৎ জেগে আছে। ঘুমোয়নি।

দশ

চব্বিশ ঘন্টা পরে এসে গেল পুণ্য মুহূর্ত। রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মহাযোগের স্নান শুরু হয়ে যায়। গোটা এলাহাবাদ শহর, শাঁখের মুখে ঠোঁট লাগিয়ে যেন বসেছিল। বাতাস কাঁপিয়ে দশ দিগন্তে শাঁখ বাজতে থাকে। হরহর গঙ্গা, গঙ্গা মাইকী জয়, ধ্বনি দিয়ে ওয়েটিংরুমের একদল পুণ্যার্থী স্নানে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তাতে মানুষজনের গলা, পায়ের শব্দ। একশো চুয়াল্লিশ বছর পরে ফিরে আসা পবিত্র দিনের একটা মুহূর্ত কেউ অপচয় করতে রাজি নয়। রাতের এলাহাবাদ শহর কোটি কোটি পায়ের চাপে টলমল করছে। শঙ্খধ্বনি আর মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে মাটির নিচে বাসুকি বুঝি নড়ে উঠলো।

ঘন্টাখানেক আগে কৃষ্ণনগরের গৃহিণীকে দাহ করে অনন্য শ্মশান থেকে ফিরেছে। তড়িৎ, সদানন্দ, কর্তা ছাড়াও তেজেশানন্দের আশ্রম থেকে চক্রবর্তী এবং আরো দুই ভদ্রলোক শ্মশানযাত্রী হয়েছিল। মেলার দক্ষিণ পূর্ব কোণে, মাইল আড়াই ভেতরে শ্মশান। দাহের যোগাড় সেরে, লোকজন ডেকে শ্মশানে পৌঁছোতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। দাহ শেষ করে গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন দিতে রাত দশটা বাজলো। বিশুদ্ধ উচ্চারণে চক্রবর্তী পারলৌকিক মন্ত্র পড়ল। বারবার কর্তাকে সান্ত্বনাবাণী শুনিয়ে বলল, আপনার স্ত্রী ভাগ্যবতী। অনেক সুকৃতি না থাকলে এমন পুণ্যদিনে, এই মহাতীর্থে মানুষ দেহ রাখতে পারে না। আপনার স্ত্রী সরাসরি বৈকুণ্ঠে প্রয়াগরাজের কাছে পৌঁছে যাবেন।

গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে হিমেল হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনন্য ঠকঠক করে কাঁপছিল। আশপাশে আরো দু'তিনটে চিতা জ্বলছে। উত্তুরে হাওয়ায় চিতার আগুন ছত্রখান হয়ে আবার জমাট বেঁধে যাচ্ছে। প্রতিটি চিতা ঘিরে এক ঝাঁক মানুষ। সকলে মৃতের আত্মীয়, বন্ধু নয়। আগুনে হাত পা সেঁকার লোভে জড়ো হয়েছে অনেকে। স্ত্রীর চিতার আগুনের জ্বলন্ত পাটকাঠি নিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে কেষ্টনগরের কর্তা সেই যে একটা গাছতলায় গিয়ে বসলো, অস্থি বিসর্জনের আগে ওঠেনি।

স্ত্রীকে হারিয়ে কর্তাকে খুব কাতর মনে হচ্ছিল না। বরং বিনা নোটিশে স্ত্রীর দায়িত্বজ্ঞানহীন দেহত্যাগে কর্তা বেশ বিরক্ত। অনন্যর কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না।

চিতা নেভার আগে সঙ্গীদের নিয়ে চক্রবর্তীমশাই বিদায় নিয়েছিল। রাত দু'টোয় আশ্রমের সব বাসিন্দাকে তুলে স্নানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব চক্রবর্তীমশাইয়ের।

ওয়েটিংরুমে ফিরে রাত দশটায় ঠাকরুন সকলকে চিড়ে, দই আর কলা দিল। কর্তাও খেতে বসলো।

ঠাকরুন বললো, ভোর চারটের সময় স্নানে বেরবো। পঞ্জিকা মতে সেটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। অনন্যর যাওয়ার দরকার নেই। ও আমাদের মালপত্র আগলাবে।

খাওয়ার পাট শেষ হতে যে যার কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। কর্তাকে সরল গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনার স্ত্রীর মৃতদেহ কি চেরাই হয়েছিল?

কর্তার মুখ, ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলে, রোগ-ব্যাধিতে মরলে ওসব হয় না।

কর্তার মুখের দিকে ঠাকরুন অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। ভস্মলোচন দৃষ্টি।

চাবুকের ঘায়ে কুকুরের মতো গুটিয়ে যাওয়া কর্তার চেহারা দেখে অনন্য অবাক হয়। তড়িৎও আশ্চর্য, তাকিয়ে থাকে।

ঠাকরুন কথা বলে না। অনন্যর চোখ থেকে ঘুম উবে গেছে। মাথার মধ্যে নানা জটিল চিন্তা ভনভন করে।

মৃতদেহ চেরাই অর্থে আলো ঠাকরুন পোস্টমর্টেম বুঝিয়েছে। হঠাৎ এমন প্রসঙ্গ ঠাকুরন তুলল কেন? ঠাকরুনের প্রশ্নে কর্তাই বা ফ্যাকাশে হয়ে যায় কেন? আবছা সন্দেহ অনন্যর মাথায় পাক খায়। কৃষ্ণনগরের গিন্নির মৃত্যুর কারণ কলেরা ছাড়া অন্য কিছু আছে নাকি? তার মানে গিন্নির মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। ভয়ে অনন্যর গা ছমছম করে। পরিচিত পৃথিবী আর সংসারের তলে তলে এক অজ্ঞাত জীবন বয়ে যাচ্ছে। রহস্যময় তার লীলা। হাত কাটা সন্ন্যাসীর কদাকার মুখটা অনন্যর মনে পড়লো। হয়তো সেই লোকটা নাটের গুরু। কিন্তু আলোঠাকরুন নিজের সন্দেহের কথা পরিষ্কার করে বলল না কেন? আলোঠাকরুন কি মৃত্যুর ব্যাপারে আরও কিছু জানে? মুমূর্ষু মহিলা হাসপাতালে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে নিশ্চয় কোনো গোপন খবর ঠাকরুনকে শুনিয়েছিল। যদি তাই হয়, তাহলে ঠাকরুন কেন গিন্নিকে দাহ করার আগে সব কথা পুলিশকে জানাল না? এরকম অপরাধ চুপচাপ হজম করে নেওয়া অন্যায়। ঠাকরুনের মতো তেজি মহিলার কাছ থেকে অনন্য এটা আশা করেনি। ঠাকরুন কি পুলিশের ঝামেলা এড়াবার জন্যে নিঃশব্দ রইল? তাই বা কেন হবে? ঠাকরুনের তো কোনো দোষ নেই। কথাটা মাথায় আসতে অনন্যর চিন্তা থেমে যায়। ভয় পাওয়ার কারণ ঠাকরুনের যদি না থাকে, তাহলে ঠাকরুন ঘটনাটা চেপে গেল কেন? তার মানে, ঠাকরুনেরও ভয়ের কিছু কারণ আছে। নিশ্চয়ই আছে। দু'একটা ঘটনায় অনন্য সে প্রমাণ পেয়েছে। সেদিন রাতে অশত্থতলায় কয়েক পলকের জন্যে দেখা ঠাকরুনের বিপন্ন মুখটা অনন্য ভুলতে পারে না। ঠাকরুনের মতো নির্ভীক মহিলার কেন এত ভয়?

অনন্যর ঘুম পেলেও বারবার প্রবল ঝাঁকুনিতে সে জেগে উঠছিল। কলকাতা থেকে হীরেন টাকাটা পাঠাচ্ছে না কেন? গতকালই টাকা এসে যাওয়ার কথা। হীরেন কি কলকাতার বাইরে চলে গেছে? নানা ভাবনা অনন্যর মাথার মধ্যে বিজবিজ করতে থাকে। মাঝরাতে আবছা ঘুমের মধ্যে অনন্য দেখে, পদ্মাসনে টানটান হয়ে ঠাকরুন বসে আছে। বদ্ধ নিষ্কম্প শিখার মতো দেখাচ্ছে। ঠাকরুনের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে অনন্য বালিশে মুখ গুঁজে চন্দনের সুগন্ধ পেল।

চারটের আগে দলবল নিয়ে আলো ঠাকরুন বেরিয়ে পড়লো। আগেও কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে পুণ্যার্থীরা বেরিয়ে গেছে। যাবার আগে অনন্যকে ঠাকরুন বললো, আমরা বের হচ্ছি, একটু সজাগ থেকো।

আবছা ঘুমের মধ্যে অনন্য সায় দিল।

বেলা করে অনন্যর ঘুম ভাঙলো। ওয়েটিংরুম উজাড় করে সকলে বেরিয়ে গেছে। হল ঘরের ভেতরটা অস্বাভাবিক ফাঁকা। স্নান সেরে আলোঠাকুরন কখন ফিরবে, কে জানে। মুখ হাত ধুয়ে অশত্থতলায় গিয়ে অনন্য চা খায়। কলকাতা থেকে আজ টাকা না এলে, টাকার আশা

ছেড়ে দেবে। টাকাটা খুব দরকার। আলোঠাকরুনের চোখের উগ্র দৃষ্টি অনন্য ভোলেনি। টাকা এলে অনন্য প্রমাণ করতে পারে, সে মিথ্যেবাদী নয়। ঠাকরুনের ঋণও কিছু শোধ করা উচিত। রাত বারোটায় যারা স্নানে গিয়েছিল, হৈহৈ করে ফিরে এলো। সকলের মুখে স্নান ঘাটের গল্প দলের দু'জন হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে তাদের খুঁজে পাওয়া গেছে। কৃষ্ণনগরের কর্তার বিছানা দেখে অনন্য ধরতে পারে, লোকটা স্নানে যায়নি। অথচ স্টেশন চত্বরে তার টিকি দেখা যাচ্ছে না। মৃত গিন্নির একটা লালপাড় শাড়ি দড়িতে ঝুলছে। কর্তা কি গা ঢাকা দিল?

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ আলোঠাকরুন দলবল নিয়ে ফিরে এলো। শীতল পৃথিবীর ওপর তখন ঘন রোদ উপচে পড়ছে। মানুষের চোখ মুখে চরিতার্থতা মাখামাখি। কে বলবে এই পৃথিবী দুঃখ, কষ্ট, জরা, মৃত্যুর আধার! ক্ষতবিক্ষত মানুষের হৃদয়ে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে। হতশ্রী পৃথিবীতে অমৃতের পাত্র কে এভাবে উজাড় করে দেয়! আজই হয়তো মেলাতে অনন্যর শেষ দিন। বিশ্বনাথদা যে কোনো মুহূর্তে এসে যাবে। প্রয়াগ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে সকলের সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত। ক্ষণিকের এই পরিচয়েরও একটা মূল্য আছে। জীবনে এদের কারো সঙ্গে দেখা না হলেও মেলার স্মৃতি মাঝে মাঝে গানের কলির মতো তার মনের মধ্যে বেজে উঠবে। বাসবী, জনমেজয়কে আর একবার না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। শঙ্কর আর চক্রবর্তীমশাইকেও বলে আসা দরকার। ছাদের পাঁচিলে হেলান দিয়ে রাস্তার ওপর চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণীদের কি বলার কিছু নেই?

অনন্যর বুকের মধ্যে অনেক কথা ভিড় করে। কাউকে কিছু বলা হলো না। আয়ত চোখ, শ্যামলা রঙ সেই মেয়েটির কথা অনেকবার ভাবলেও লজ্জায় নিজের কাছেই সেটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। আজ, শেষবার আশ্রমে উঁকি দিয়ে সোজাসুজি সেই কাজলনয়নার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বলবে, আমাকে ভুল বুঝো না। কথা বলার জন্যে প্রাণ আনচান করলেও এ জীবনে আমি টুঁ শব্দ করতে পারলুম না। আমাকে ক্ষমা করো।

অনন্যকে ডেকে আলোঠাকরুন বলে, চল ঘুরে আসি।

কোথায়, অনন্য জানতে চায়।

বেরিয়ে ভাবা যাবে।

চেনা রাস্তা ধরে ঠাকরুনের সঙ্গে অনন্য দুধের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঠাকরুন দাঁড় করালো তাকে।

আজ আর দুধ খাব না, অনন্য বললো, একদম সেরে গেছি।

আলোঠাকরুন ছাড়ে না। দুধের ভাঁড়ে অনন্য চুমুক দেওয়ার একটু পরে ঠাকরুন বলে, কলকাতা থেকে তোমার বন্ধুর মানিঅর্ডার এলে দুধের দামটা না হয় ফেরৎ দিও।

ঠাকরুনের গলার স্বরে অনন্য চমকে ওঠে। সহজ স্বাভাবিক সংলাপ নয়, ঠাকরুনের বচনে ব্যঙ্গ আছে। অনন্য একটু দমে যায়। ঠাকরুনের মুখ, চোখ সরল, স্বাভাবিক। ঠাকরুন বলে, টাকা এলে সদানন্দজীর বাড়ি ফেরার ভাড়া তুমি দেবে।

দুধে শেষ চুমুক দিয়ে অনন্য চুপচাপ ঠাকরুনের কথা শুনে যায়। ঠাকরুনের কথায় আন্তরিকতা থাকলেও বিশ্বাস করতে পারে না। মনে হয়, ঠাকরুন কৌশলে তাকে খেলাচ্ছে।

ফেরার পথে ঠাকরুন জিজ্ঞেস করে তোমার বিশ্বনাথদা কবে আসবেন?

আজ রাতে, না হলে কাল, অনন্য জানায়।

আমার কথা তোমার মনে থাকবে? স্নেহে জমাট বেঁধে যায় ঠাকরুনের গলা। অনন্যকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঠাকরুন বলে, বাউণ্ডুলেপনা ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাও।

অনন্য সাড়া করে না।

ঠাকরুন বলে, তুহিনকে একদিন নিশ্চয় ফিরে পাবে। না পেলে দুঃখ করো না। তুহিনের চেয়ে অনেক বড় কিছু তুমি পাবে।

সেটা কী ঈশ্বর, অনন্য খোঁচায়, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।

তাতে কিছু যায় আসে না, আলো ঠাকরুন সরল বিশ্বাসে বলে, তোমার দু'চোখ দেখে বুঝতে পারছি, মঙ্গলময় শক্তি তোমার মাথায় হাত রাখবে। তোমার শুভ হোক, স্বধর্মে থাকো।

গভীর বিশ্বাসে ঠাকরুনের গলা ভারী হয়ে ওঠে। লঘু ঠাট্টার কথা অনন্য ভাবতে পারে না।

এখান থেকে কোথায় যাবে, অনন্য জানতে চায়।

সন্ন্যাসীদের কোনো পাকা ঠিকানা নেই, ঠাকরুন হেসে জবাব দিল।

ঠিকানা একটা বানালেই হয়, অনন্য বললো।

ঠাকরুন রা কাড়ে না। গম্ভীর দেখায় তাকে।

তোমার কথা কিন্তু কিছুই বললে না, অনন্য অনুযোগ করে।

ঠাকরুন তাকাল অনন্যর দিকে। বিষণ্ণ দু'চোখের দৃষ্টি। ঠাকরুন বলে, আমার কাহিনী শুনে তুমি দুঃখ পাবে।

দুঃখ পাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে, অনন্য জানালো, পৃথিবীতে দুঃখ থাকলে দুঃখ পেতেই হবে। তুমি না দিলে আর একজন দেবে। তাতে কিছু যায় আসে না। দুঃখ থেকে মুক্তির পথও মানুষ খুঁজে বার করে।

কিছু বলতে গিয়ে এক-পলক ভেবে ঠাকরুন কথা গিলে নেয়।

স্টেশনের চত্বরে দুজন এসে গেছে। অশত্থতলায় সদানন্দজী দাঁড়িয়ে আছে। আলো ঠাকরুনকে দেখতে পেয়ে সদানন্দজী দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। ঠাকরুনের হাত ধরে একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কথা বলতে থাকলো।

সদানন্দজীর মুখের অভিব্যক্তি দেখে অনন্যর হৃৎকম্প হয়। লোকটার সব কথা কানে না গেলেও অনন্য ধরতে পারে ওয়েটিংরুমে আবার দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। অশত্থ গাছের তলায় পাথরের মতো আলোঠাকরুন দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর দু'চোখে আগুনের ঝলিক ছড়িয়ে এক লহমা অনন্যকে দেখে। অনন্যর মনে হয়, ঠাকরুনের দৃষ্টির তাপে সে ঝলসে যাচ্ছে। সেদিন ওয়েটিংরুমে চিঠি লেখার সময়ও ঠাকরুনের চোখে এই চাহনি দেখেছিল। অনেক বছর আগে আরো একবার এই দৃষ্টির মুখোমুখি হয়েছিল সে। তার বুকে লেপ্টে থাকা শিবুর মৃত্যুর খবর শুনে তুহিনও এভাবে তাকিয়েছিল। তুহিন যেন বলতে চেয়েছিল, তুমি নিজে নিরাপদে থেকে মৃত্যুর পথে কেন আমাদের যেতে দিলে? কি করে তোমার ওপর বিশ্বাস রাখব?

তীব্র ঘৃণায় ঠাকরুন বলে, ছিঃ।

তারপর দ্রুতপায়ে রাস্তার দিকে চলে যায়।

ওয়েটিংরুমে ঢুকে অনন্য দেখে তুলকালাম কাণ্ড চলেছে।

অচেনা কয়েকজন লোক তড়িতের গেরুয়া আলখাল্লা ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে প্লাটফর্মে দাঁড়ানো একটা ট্রেনের কামরায় তুলে দিয়ে তারা নিজেরাও সেখানে উঠে পড়লো।

স্ত্রীবিয়োগের শোক ভুলে কেষ্টনগরের কর্তা বললো, ছ্যা ছ্যা, নষ্ট মেয়েমানুষ! মামি হয়ে ছেলের বয়সি ভাগ্নেকে নিয়ে কেউ ঘর ছাড়ে? পারলো?

রোদে তেতে ওঠা অনন্যর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকলো।

বছর চল্লিশের একজন লোককে দেখিয়ে অনন্যকে কর্তা বললো. এই ভদ্রলোক তড়িতের মামা। তোমাদের আলোমার স্বামী। সে কুলটা মাগি গেল কোথায়?

ঘটনার গতি দেখে খুশিতে কর্তা ডগমগ করছে।

অনন্য আর দাঁড়ালো না। অদৃশ্য চাবুক নির্মম হাতে তাকে পেটাতে থাকে।

ঘরের কোণে ঠাকরুনের বিছানা, পুঁটলি পড়ে আছে। তড়িতের বাড়ির লোকজন উন্মত্তের মতো ঠাকরুনকে খুঁজছে। অনন্য অনুভব করলো, তাকে ভুল বুঝেছে ঠাকরুন। অলক্ষ্য কিছু কার্যকারণ দশ বছর ধরে যাবতীয় দুর্ঘটনার আসামি হিসেবে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। সেই শক্তির হাত থেকে তার রেহাই নেই। কলকাতায় তার চিঠি লেখা, পরশু রাতে ঠাকরুনের সঙ্গে কথা বলা, সবই নিরীহ, তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু একথা সে বলবে কাকে? বেসামাল পায়ে অনন্য রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। চারপাশ দেখে নিয়ে হনহন করে মেলার দিকে হাঁটতে থাকলো। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে নিজেকে তার একা, নিঃসঙ্গ লাগে। আলোঠাকরুন তাকে ফতুর করে দিয়ে চলে গেছে। ঠাকরুনকে খুঁজে বার করতে হবে। তাকে খুঁজতে, দরকার হলে রসাতল পর্যন্ত যাবে।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের আখড়ায়, পুণ্যার্থীর ভিড়ে, গাঁজার আড্ডায় নিশি পাওয়া মানুষের মতো অনন্য ঘুরে বেড়ালো। শরীর বিধ্বস্ত, মন বিকল। অনন্য বিড়বিড় করে, ঠাকরুন তুমি ফিরে এসো। আমি নির্দোষ। আমাকে ভুল বুঝো না।

কেউ আসে না। পরাজিত মানুষের মতো রাতের অন্ধকারে অনন্য স্টেশনে ফিরে যায়। হতাশায় খাঁখাঁ করে মাথা। একজন মানুষকে খুঁজতে এসে আর একজনকে হারিয়ে ফেলার বিষব্যথায় অন্তরাত্মা পর্যন্ত টাটিয়ে ওঠে।

ওয়েটিংরুমে ঢুকতে সদানন্দজী বলে, আপনার মানিঅর্ডার এসেছে স্টিশনমাস্টার সাবের জিম্মায় আছে।

সদানন্দর মুখের দিকে অনন্য তাকাতে পারে না। স্টেশনমাস্টারের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে সদানন্দের হাতে তার বাড়ি ফেরার ভাড়া দিয়ে অনন্য বলে, তার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, অনন্য কোনো দোষ করেনি।

সদানন্দজীর মুখে কথা নেই। চোখের জলে মুখ ভেসে যাচ্ছে।

ওয়েটিংরুমের মেঝেতে দু'হাতে মুখ ঢেকে অনন্য শুয়ে থাকলো। কেষ্টনগরের কর্তা, বাড়তি বিছানা কম্বল নিয়ে উধাও হয়েছে। সকালের সেই ট্রেনেই হয়তো লোকটা উঠেছে। তড়িতের হেনস্থা দেখে সারাটা পথ কর্তা মজা পাবে। আজ রাতে, অথবা কাল সকালে বিশ্বনাথদা এসে জানতে চাইবে তুহিনের খবর। কোথায় তুহিন? তুহিন ছাড়া আরো কতো মানুষ হারিয়ে যায়, সে খবর কি বিশ্বনাথদা রাখে? উদাসীন পৃথিবীতে চেনা মানুষ যখন রোজ হারিয়ে

যায়, তখন হারানো মানুষের ঠিকানা কে বলে দেবে! দূর মেলাপ্রাঙ্গণ, স্বর্গদ্বীপ আর সাধুকল্পের দুর্বোধ্য গুঞ্জন সীমাহীন নক্ষত্রলোকে ছড়িয়ে পড়ছে। দু'চোখ বুজে অনন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কেউ একজন আসবে। প্রাণপাত করে যাদের খুঁজছে, তারা কেউ হারাবে না। মানুষ হারিয়ে যাওয়ার বস্তু নয়। মানুষ কখনো হারে না। হারিয়ে যায় না।

দূর অন্ধকার থেকে হাওড়াগামী বোম্বে মেল দ্রুতগতিতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে। কলকাতায় ফিরতে হবে অনন্যকে। বিছানায় সে উঠে বসলো।
